প্রথম সংখ্যা] ২৫শে বৈশাখ ১৩২১ [প্রথম বর্ষ

সবুজ পত্র

প্রথম বর্ষ

শ্রীপ্রমথ চৌধুরী সম্পাদিত

প্রকাশক—

কার্ত্তিক প্রেস

২০, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

বার্ষিক মূল্য
[illegible] টাকা ছয় আনা

THE ASIATIC SOCIETY
5.11.66
CALCUTTA-16

এই সংখ্যার মূল্য
চারি আনা মাত্র

[illegible], কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট কলিকাতা কার্ত্তিক প্রেস হইতে শ্রীহরিচরণ মান্না দ্বারা মুদ্রিত ও
২০, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট কলিকাতা কার্ত্তিক প্রেস হইতে শ্রীযুক্ত কালাচাঁদ দালাল
কর্ত্তৃক প্রকাশিত।

Bangla
891.44.05
S118

Sl no. 066385

সবুজ পত্র

মুখপত্র

ওঁ প্রাণায় স্বাহা

৺দ্বিজেন্দ্রলাল রায় বাঙ্গালী জাতিকে পরামর্শ দিয়েছিলেন— "একটা নতুন কিছু করো।" সেই পরামর্শ অনুসারেই যে আমরা একখানি নতুন মাসিক পত্র প্রকাশ কর্‌তে উদ্যত হয়েছি, এ কথা বল্‌লে সম্পূর্ণ সত্য কথা বলা হবে না। এ পৃথিবীটি যথেষ্ট পুরোনো, সুতরাং তাকে নিয়ে নতুন কিছু করা বড়ই কঠিন, বিশেষতঃ এ দেশে। যদি বহু চেষ্টায় নতুন কিছু করে' তোলা যায়, তা হয় জলবায়ুর গুণে দুদিনেই পুরোনো হয়ে যায়, নয় ত পুরাতন এসে তাকে গ্রাস করে' ফেলে। এই সব দেখে শুনে, এদেশে কথায় কিম্বা কাজে নতুন কিছু কর্‌বার জন্য যে পরিমাণ ভরসা ও সাহস চাই—তা যে আমাদের আছে তা বল্‌তে পারিনে।

যদি কেউ জিজ্ঞাসা করেন যে তবে কি উদ্দেশ্য সাধন করবার জন্য, কি অভাব পূরণ কর্‌বার জন্য, এত কাগজ থাক্‌তে আবার একটি নতুন কাগজ বার করছি—তাহলেও আমাদের নিরুত্তর থাক্‌তে হবে; কেন না কথা দিয়ে কথা না রাখতে পারাটা সাহিত্য-সমাজেও ভদ্রতার পরিচায়ক নয়। নিজেকে প্রকাশ করবার পূর্ব্বে নিজের পরিচয় দেওয়াটা,—শুধু পরিচয় দেওয়া নয়, নিজের গুণগ্রাম বর্ণনা করাটা,—যদিও মাসিক পত্রের পক্ষে একটা সর্ব্বলোকমান্য "সাহিত্যিক" নিয়ম হয়ে দাঁড়িয়েছে, তবুও সে নিয়ম ভঙ্গ কর্‌তে আমরা বাধ্য। যে কথা বারো মাসে বারো কিস্তিতে রাখ্‌তে হবে, তার যে মাঝে মাঝে খেলাপ হবার সম্ভাবনা নেই—এ জাঁক করবার মত দুঃসাহস আমাদের নেই। তা ছাড়া স্বদেশের কিম্বা স্বজাতির কোনও একটি অভাব পূরণ করা, কোনও একটি বিশেষ উদ্দেশ্য সাধন করা সাহিত্যের কাজও নয়, ধর্ম্মও নয়; সে হচ্ছে কার্য্যক্ষেত্রের কথা। কোনও বিশেষ উদ্দেশ্যকে অবলম্বন করাতে মনের ভিতর যে সঙ্কীর্ণতা এসে পড়ে, সাহিত্যের স্ফূর্ত্তির পক্ষে তা অনুকূল নয়। কাজ হচ্ছে দশে মিলে কর্‌বার জিনিষ। দলবদ্ধ হয়ে আমরা সাহিত্য গড়্‌তে পারি নে, গড়্‌তে পারি শুধু সাহিত্য-সম্মিলন। কারণ দশের সাহায্যে ও সাহচর্য্যে কোনও কাজ উদ্ধার করতে হলে, নিজের স্বাতন্ত্র্যটি অনেকটা চেপে দিতে হয়। যদি আমাদের দশজনের মধ্যে মনের চৌদ্দ-আনা মিল থাকে, তাহলে প্রতিজনে বাকী দু-আনা বাদ দিয়ে, একত্র হয়ে সকলের পক্ষে সমান বাঞ্ছিত কোনও ফললাভের জন্য চেষ্টা কর্‌তে পারি। এক

দেশের, এক যুগের, এক সমাজের বহু লোকের ভিতর মনের এই চৌদ্দ-আনা মিল থাকলেই সামাজিক কার্য্য সুসম্পন্ন করা সম্ভব হয়, নচেৎ নয়। কিন্তু সাহিত্য হচ্ছে ব্যক্তিত্বের বিকাশ। সুতরাং সাহিত্যের পক্ষে মনের ঐ পড়ে-পাওয়া-চৌদ্দআনার চাইতে, ব্যক্তিবিশেষের নিজস্ব দু-আনার মূল্য ঢের বেশী। কেননা ঐ দু-আনা হতেই তার সৃষ্টি এবং স্থিতি, বাকী চৌদ্দ-আনায় তার লয়। যার সমাজের সঙ্গে ষোল-আনা মনের মিল আছে, তার কিছু বক্তব্য নেই। মন পদার্থটি মিলনের কোলে ঘুমিয়ে পড়ে, আর বিরোধের স্পর্শে জেগে ওঠে। এবং মনের এই জাগ্রত ভাব থেকেই সকল কাব্য, সকল দর্শন, সকল বিজ্ঞানের উৎপত্তি।

এ কথা শুনে অনেকে হয়ত বল্‌বেন যে, যে দেশে এত দিকে এত অভাব, সে দেশে যে লেখা তার একটি অভাবও পূরণ না করতে পারে, সে লেখা সাহিত্য নয়,—সখ। ও ত কল্পনার আকাশে রঙীণ কাগজের ঘুড়ি ওড়ানো, এবং সে ঘুড়ি যত শীঘ্র কাটা পড়ে' নিরুদ্দেশ হয়ে যায় ততই ভাল। অবশ্য ঘুড়ি ওড়াবারও একটা সার্থকতা আছে। ঘুড়ি মানুষকে অন্ততঃ উপরের দিকে চেয়ে দেখ্‌তে শেখায়। তবুও একথা সত্য যে মানব-জীবনের সঙ্গে যার ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ নেই, তা সাহিত্য নয়, তা শুধু বাক্-ছল। জীবন অবলম্বন করে'ই সাহিত্য জন্ম ও পুষ্টিলাভ করে, কিন্তু সে জীবন মানুষের দৈনিক জীবন নয়। সাহিত্য হাতে হাতে মানুষের অন্নবস্ত্রের সংস্থান করে দিতে পারে না। কোনও কথায় চিঁড়ে ভেজে না, কিন্তু কোনও কোনও কথায় মন ভেজে, এবং সেই জাতির কথারই সাধারণ সংজ্ঞা হচ্ছে সাহিত্য। শব্দের

শক্তি অপরিসীম। রাত্রির অন্ধকারের সঙ্গে মশার গুন্‌গুনানি মানুষকে ঘুম পাড়ায়—অবশ্য যদি মশারির ভিতর শোওয়া যায়,—আর দিনের আলোর সঙ্গে কাক কোকিলের ডাক মানুষকে জাগিয়ে তোলে। প্রাণ পদার্থটির গূঢ়তত্ত্ব আমরা না জান্‌লেও, তার প্রধান লক্ষণটি এতই ব্যক্ত এবং এতই স্পষ্ট, যে তা সকলেই জানেন। সে হচ্ছে তার জাগ্রতভাব। অপরদিকে নিদ্রা হচ্ছে মৃত্যুর সহোদরা। কথায় হয় আমাদের জাগিয়ে তোলে, নয় ঘুম পাড়িয়ে দেয়—তাই আমরা কথায় মরি বাঁচি। মন্ত্র সাপকে মুগ্ধ কর্‌তে পারে কি না জানিনে, কিন্তু মানুষকে যে পারে তার প্রত্যক্ষ প্রমাণ গোটা ভারতবর্ষ। সংস্কৃত শব্দ যে সংস্কারকে বাধা দিতে পারে তার প্রমাণ বাঙ্গলা সাহিত্য। মানুষ মাত্রেরই মন কতক সুপ্ত আর কতক জাগ্রত। আমাদের মনের যে অংশটুকু জেগে আছে সেই অংশটুকুকেই আমরা সমগ্র মন বলে ভুল করি,—নিদ্রিত অংশটুকুর অস্তিত্ব আমরা মানিনে, কেন না জানিনে। সাহিত্য মানব-জীবনের প্রধান সহায়, কারণ তার কাজ হচ্ছে মানুষের মনকে ক্রমান্বয় নিদ্রার অধিকার হতে ছিনিয়ে নিয়ে জাগরূক করে' তোলা। আমাদের বাঙ্গলা সাহিত্যের ভোরের পাখীরা যদি আমাদের প্রতিষ্ঠিত সবুজপত্র-মণ্ডিত সাহিত্যের নব শাখার উপর এসে অবতীর্ণ হন, তাহলে আমরা বাঙ্গালীজাতির সব চেয়ে যে বড় অভাব তা কতকটা দূর কর্‌তে পার্‌ব। সে অভাব হচ্ছে আমাদের মনের ও চরিত্রের অভাব যে কতটা, তারি জ্ঞান। আমরা যে আমাদের সে অভাব সম্যক্ উপলব্ধি কর্‌তে পারিনি তার প্রমাণ এই যে, আমরা নিত্য লেখায় ও বক্তৃতায় দৈন্যকে ঐশ্বর্য্য বলে', জড়তাকে

সাত্ত্বিকতা বলে', আলস্যকে ঔদাস্য বলে', শ্মশান-বৈরাগ্যকে ভূমানন্দ বলে', উপবাসকে উৎসব বলে', নিষ্কর্ম্মাকে নিষ্ক্রিয় বলে' প্রমাণ করতে চাই। এর কারণও স্পষ্ট। ছল দুর্ব্বলের বল। যে দুর্ব্বল সে অপরকে প্রতারিত করে আত্মরক্ষার জন্য, আর নিজেকে প্রতারিত করে আত্মপ্রসাদের জন্য। আত্মপ্রবঞ্চণার মত আত্মঘাতী জিনিষ আর নেই। সাহিত্য, জাতির খোরপোষের ব্যবস্থা করে দিতে পারেনা—কিন্তু আত্মহত্যা থেকে রক্ষা করতে পারে।

আমরা যে দেশের মনকে ঈষৎ জাগিয়ে তুলতে পারব, এত বড় স্পর্দ্ধার কথা আমি বলতে পারিনে, কেননা, যে সাহিত্যের দ্বারা তা সিদ্ধ হয়, সে সাহিত্য গড়বার জন্য নিজের সদিচ্ছাই যথেষ্ট নয়,—তার মূলে ভগবানের ইচ্ছা থাকা চাই, অর্থাৎ নৈসর্গিকী প্রতিভা থাকা চাই। অথচ ও ঐশ্বর্য্য ভিক্ষা করে' পাবার জিনিষ নয়। তবে বাঙ্গলার মন যাতে আর বেশি ঘুমিয়ে না পড়ে, তার চেষ্টা আমাদের আয়ত্তাধীন। মানুষকে ঝাঁকিয়ে দেবার ক্ষমতা অল্পবিস্তর সকলের হাতেই আছে—সে ক্ষমতার প্রয়োগটি কেবল আমাদের প্রবৃত্তিসাপেক্ষ। এবং আমাদের প্রবৃত্তির সহজ গতিটি যে ঐ নিজেকে এবং অপরকে সজাগ করে' তোলবার দিকে তাও অস্বীকার করবার যো নেই, কারণ ইউরোপ আমাদের মনকে নিত্য যে ঝাঁকুনি দিচ্ছে তা'তে ঘুমের ব্যাঘাত ঘটে। ইউরোপের সাহিত্য, ইউরোপের দর্শন, মনের গায়ে হাত বুলোয় না, কিন্তু ধাক্কা মারে। ইউরোপের সভ্যতা অমৃতই হোক্, মদিরাই হোক্, আর হলাহলই হোক্, তার ধর্ম্মই হচ্চে মনকে উত্তেজিত করা, স্থির থাক্‌তে দেওয়া নয়। এই ইংরাজি-শিক্ষার প্রসাদে, এই ইংরাজি-সভ্যতার সংস্পর্শে, আমরা দেশশুদ্ধ লোক যে দিকে হোক্

কোনও একটা দিকে চল্‌বার জন্য এবং অন্যকে চালাবার জন্য আঁকুবাঁকু কর্‌ছি। কেউ পশ্চিমের দিকে এগোতে চান, কেউ পূর্ব্বের দিকে পিছু হট্‌তে চান্, কেউ আকাশের উপরে দেবতার আত্মার অনুসন্ধান কর্‌ছেন, কেউ মাটির নীচে দেবতার মূর্ত্তির অনুসন্ধান কর্‌ছেন। এক কথায় আমরা উন্নতিশীলই হই, আর অবনতিশীলই হই, আমরা সকলেই গতিশীল,—কেউ স্থিতিশীল নই। ইউরোপের স্পর্শে আমরা, আর কিছু না হোক্, গতিলাভ করেছি, অর্থাৎ মানসিক ও ব্যবহারিক সকলপ্রকার জড়তার হাত থেকে কথঞ্চিৎ মুক্তিলাভ করেছি। এই মুক্তির ভিতর যে আনন্দ আছে—সেই আনন্দ হতেই আমাদের নব-সাহিত্যের সৃষ্টি। সুন্দরের আগমনে হীরামালিনীর ভাঙ্গা মালঞ্চে যেমন ফুল ফুটে উঠেছিল, ইউরোপের আগমনে আমাদের দেশে তেমনি সাহিত্যের ফুল ফুটে উঠেছে। তার ফল কি হবে সে কথা না বল্‌তে পারলেও, এই ফুলফোটা যে বন্ধ করা উচিত নয় এই হচ্ছে আমাদের দৃঢ় ধারণা। সুতরাং যিনি পারেন তাঁকেই আমরা ফুলের চাষ কর্‌বার জন্য উৎসাহ দেব।

ইউরোপের কাছে আমরা একটি অপূর্ব্ব জ্ঞান লাভ করেছি, সে হচ্ছে এই যে, ভাবের বীজ যে দেশ থেকেই আননা কেন, দেশের মাটিতে তার চাষ কর্‌তে হবে। চিনের টবে তোলা মাটিতে সে বীজ বপন করা পণ্ডশ্রম মাত্র। আমাদের এই নবশিক্ষাই, ভারতবর্ষের অতিবিস্তৃত অতীতের মধ্যে আমাদের এই নবভাবের চর্চ্চার উপযুক্ত ক্ষেত্র চিনে নিতে শিখিয়েছে। ইংরাজী শিক্ষার গুণেই আমরা দেশের লুপ্ত অতীতের পুনরুদ্ধারকল্পে ব্রতী হয়েছি। তাই আমাদের মন একলম্ফে শুধু বঙ্গ বিহার নয়, সেই সঙ্গে

হাজার দেড়েক বৎসর ডিঙ্গিয়ে একেবারে আর্য্যাবর্ত্তে গিয়ে উপস্থিত হয়েছে। এখন আমাদের পূর্ব্ব কবি হচ্ছে কালিদাস, কাশীদাস নয়,—দার্শনিক শঙ্কর, গদাধর নয়,—শাস্ত্রকার মনু, রঘুনন্দন নয়,—আলঙ্কারিক দণ্ডী, বিশ্বনাথ নয়। নব্যন্যায়, নব্যদর্শন, নব্যস্মৃতি আমাদের কাছে এখন অতি পুরাতন, আর যা কালের হিসাবে অতি পুরাতন, তাই আবার বর্ত্তমানে নতুনরূপ ধারণ করে এসেছে। এর কারণ হচ্ছে, ইউরোপের নবীন সাহিত্যের সঙ্গে ভারতবর্ষের প্রাচীন সাহিত্যের আকারগত সাদৃশ্য না থাক্‌লেও অন্তরের মিল আছে। সে হচ্ছে প্রাণের মিল,—উভয়ই প্রাণবন্ত। গাছের গোলাপের সঙ্গে কাগজের গোলাপের সাদৃশ্য থাকলেও, জীবিত ও মৃতের ভিতর যে পার্থক্য—উভয়ের মধ্যে সেই পার্থক্য বিদ্যমান। কিন্তু স্থলের গোলাপ ও জলের পদ্ম উভয়ে এক জাতীয়, কেননা উভয়েই জীবন্ত। সুতরাং আমাদের নবজীবনের নবশিক্ষা, দেশের দিক ও বিদেশের দিক দুই দিক্ থেকেই আমাদের সহায়। এই নবজীবন যে লেখায় প্রতিফলিত হয় সেই লেখাই কেবল সাহিত্য,—বাদবাকী লেখা হয় কাজের, নয় বাজে।

এই সাহিত্যের বহির্ভূত লেখা আমাদের কাগজ থেকে বহির্ভূত করবার একটি সহজ উপায় আবিষ্কার করেছি বলে', আমরা এই নতুন পত্র প্রকাশ কর্‌তে উদ্যত হয়েছি। একটা নতুন কিছু করবার জন্য নয়, বাঙ্গালীর জীবনে যে নূতনত্ব এসে পড়েছে তাই পরিষ্কার করে প্রকাশ কর্‌বার জন্য।

এই নূতন জীবনে অনুপ্রাণিত হয়ে বাঙ্গলা সাহিত্য যে কেন পুষ্পিত না হয়ে পল্লবিত হয়ে উঠছে, তার কারণ নির্ণয় করাও কঠিন নয়।

কিঞ্চিৎ বাহ্যদৃষ্টি এবং কিঞ্চিৎ অন্তর্দৃষ্টি থাকলেই, সে কারণের দুই পিঠই সহজে মানুষের চোখে পড়ে।

সাহিত্য এদেশে অদ্যাবধি ব্যবসা-বাণিজ্যের অঙ্গ হয়ে ওঠেনি; তার জন্য দোষী লেখক কি পাঠক, বলা কঠিন। ফলে আমরা হচ্ছি সব সাহিত্য-সমাজের সখের কবির দল। অব্যবসায়ীর হাতে পৃথিবীর কোন কাজই যে সর্ব্বাঙ্গসুন্দর হয়ে ওঠে না, এ কথা সর্ব্বলোক-স্বীকৃত। লেখা আমাদের অধিকাংশ লেখকের পক্ষে, কাজও নয় খেলাও নয়, শুধু অকাজ; কারণ খেলার ভিতর যে স্বাস্থ্য ও স্বচ্ছন্দতা আছে, সে লেখায় তা নেই,—অপর দিকে কাজের ভিতর যে যত্ন ও মন আছে, তাও তা'তে নেই। আমাদের রচনার মধ্যে অন্যমনস্কতার পরিচয় পদে পদে পাওয়া যায়; কেননা যে অবসর আমাদের নেই, সেই অবসরে আমরা সাহিত্য রচনা করি। আমরা অবলীলাক্রমে সাহিত্য গড়্‌তে চাই বলে', আমাদের নৈসর্গিকী প্রতিভার উপর নির্ভর করা ব্যতীত উপায়ান্তর নেই। অথচ এ কথা লেখকমাত্রেরই স্মরণ রাখা উচিত, যে যিনি সরস্বতীর প্রতি অনুগ্রহ করে লেখেন, সরস্বতী চাই কি তাঁর প্রতি অনুগ্রহ নাও কর্‌তে পারেন। এই একটি কারণ যার জন্যে বঙ্গসাহিত্য পুষ্পিত না হয়ে, পল্লবিত হয়ে উঠ্‌ছে। ফুলের চাষ কর্‌তে হয়, জঙ্গল আপনি হয়। অতিকায় মাসিক পত্রগুলি সংখ্যাপূরণের জন্য এই আগাছার অঙ্গীকার কর্‌তে বাধ্য, এবং সেই কারণে আগাছার বৃদ্ধির প্রশ্রয় দিতেও বাধ্য। এই সব দেখে শুনে, ভয়ে সঙ্কুচিত হয়ে, আমাদের কাগজ ক্ষুদ্র আকার ধারণ করেছে। এই আকারের তারতম্যে, প্রকারেরও কিঞ্চিৎ তারতম্য হওয়া অবশ্যম্ভাবী। আমাদের স্বল্পায়তন পত্রে, অনেক লেখা আমরা

অগ্রাহ্য করতে বাধ্য হব। স্ত্রীপাঠ্য, শিশুপাঠ্য, স্কুলপাঠ্য এবং অপাঠ্য প্রবন্ধসকল, অনাহূত কিম্বা রবাহূত হয়ে আমাদের দ্বারস্থ হলেও আমরা তাদের স্বস্থানে প্রস্থান করতে বলতে পারব; কারণ, আমাদের ঘরে স্থানাভাব। এক কথায় শিক্ষাপ্রদ প্রবন্ধ আমাদের প্রকাশ করতে হবে না। এর লাভ যে কি, তিনিই বুঝতে পারবেন, যিনি জানেন যে, যে কথা একশ' বার বলা হয়েছে তারি পুনরাবৃত্তি করাই শিক্ষকের ধর্ম্ম ও কর্ম্ম। যে লেখায় লেখকের মনের ছাপ নেই, তা ছাপালে সাহিত্য হয় না।

তারপর, যে জীবনীশক্তির আবির্ভাবের কথা আমি পূর্ব্বে উল্লেখ করেছি, সে শক্তি আমাদের নিজের ভিতর থেকে উদ্বুদ্ধ হয় নি;—তা হয় দূরদেশ হতে, নয় দূরকাল হতে, অর্থাৎ বাইরে থেকে এসেছে। সে শক্তি এখনও আমাদের সমাজে ও মনে বিক্ষিপ্ত হয়ে রয়েছে। সে শক্তিকে নিজের আয়ত্তাধীন করতে না পারলে তার সাহায্যে আমরা সাহিত্যে ফুল কিম্বা জীবনে ফল পাবনা। এই নূতন প্রাণকে সাহিত্যে প্রতিফলিত করতে হলে প্রথমে মনে প্রতিবিম্বিত করা দরকার। অথচ ইউরোপের প্রবল ঝাঁকুনিতে আমাদের অধিকাংশ লোকের মন ঘুলিয়ে গেছে। সেই মনকে স্বচ্ছ করতে না পারলে তাতে কিছুই প্রতিবিম্বিত হবে না। বর্ত্তমানের চঞ্চল এবং বিক্ষিপ্ত মনোভাবসকলকে যদি প্রথমে মনদর্পণে সংক্ষিপ্ত ও সংহত করে প্রতিবিম্বিত করে' নিতে পারি, তবেই তা পরে সাহিত্যদর্পণে প্রতিফলিত হবে। আমরা আশা করি আমাদের এই স্বল্পপরিসর পত্রিকা মনোভাব সংক্ষিপ্ত ও সংহত করবার পক্ষে লেখকদের সাহায্য করবে। সাহিত্য গড়তে কোনও বাইরের

নিয়ম চাইনে, চাই শুধু আত্মসংযম। লেখায় সংযত হবার একমাত্র উপায় হচ্চে সীমার ভিতর আবদ্ধ হওয়া। আমাদের কাগজে আমরা তাই সেই সীমা নির্দ্দিস্ট করে' দেবার চেষ্টা কর্‌ব।

আমার শেষ কথা এই যে, যে শিক্ষার গুণে দেশে নূতন প্রাণ এসেছে, মনে সাহিত্য গড়বার প্রবৃত্তি জন্মিয়ে দিয়েছে, সেই শিক্ষার দোষেই সে ইচ্ছা কার্য্যে পরিণত করবার অনুরূপ ক্ষমতা আমরা পাই নি। আমরা বর্ত্তমান ইউরোপ ও অতীত ভারতবর্ষ, এ উভয়ের দোটানায় পড়ে', বাঙ্গলা প্রায় ভুলে গেছি। আমরা শিখি ইংরাজি, লিখি বাঙ্গলা, মধ্যে থাকে সংস্কৃতের ব্যবধান। ইংরাজি শিক্ষার বীজ অতীত ভারতের ক্ষেত্রে প্রথমে বপন করলেও, তার চারা তুলে বাঙ্গলার মাটিতে বসাতে হবে, নইলে স্বদেশী সাহিত্যের ফুল ফুটবে না। পশ্চিমের প্রাণবায়ু যে ভাবের বীজ বহন করে আন্‌ছে, তা দেশের মাটিতে শিকড় গাড়তে পার্‌ছে না বলে', হয় শুকিয়ে যাচ্ছে, নয় পরগাছা হচ্ছে। এই কারণেই "মেঘনাদবধ" কাব্য পরগাছার ফুল। "অর্কিড"এর মত তার আকারের অপূর্ব্বতা এবং বর্ণের গৌরব থাক্‌লেও, তার সৌরভ নেই। খাঁটি স্বদেশী বলে' "অন্নদামঙ্গল" স্বল্পপ্রাণ হলেও কাব্য; এবং কোন দেশেরই নয় বলে' "বৃত্রসংহার" মহাপ্রাণ হলেও মহাকাব্য নয়। ভারতচন্দ্র, ভাষার ও ভাবের একতার গুণে, সংযমের গুণে, তাঁর মনের কথা ফুলের মত সাকার করে' তুলেছেন, এবং সে ফুলে, যতই ক্ষীন হোক্ না কেন, প্রাণও আছে, গন্ধও আছে। দেশের অতীত ও বিদেশের বর্ত্তমান, এই দুটি প্রাণশক্তির বিরোধ নয়, মিলনের উপর আমাদের সাহিত্যের ও সমাজের ভবিষ্যৎ নির্ভর করছে। আশা করি বাঙ্গলার পতিত জমি সেই মিলনক্ষেত্র হবে। সেই পতিত জমি আবাদ

কর্‌লেই তা'তে যে সাহিত্যের ফুল ফুটে উঠ্‌বে, তাই ক্রমে জীবনের ফলে পরিণত হবে। তার জন্য আবশ্যক আর্ট, কারণ প্রাণশক্তি একমাত্র আর্টেরই বাধ্য। আমাদের এই ক্ষুদ্র পত্রিকা আশা করি এ বিষয়ে লেখকদের সহায়তা কর্‌বে। বড়কে ছোটর ভিতর ধরে' রাখাই হচ্ছে আর্টের উদ্দেশ্য। ওস্তাদরা বলে' থাকেন যে "গৌড়-সারঙ্গ" রাগিণী ছোট, কিন্তু গাওয়া মুস্কিল; "ছোটিসে দরওয়াজাকে অন্দর হাতী নিকাল্‌না যৈসা মুস্কিল ঐসা মুস্কিল, দরিয়াকো পাকড়কে কুঁজামে ডাল্‌না যৈসা মুস্কিল ঐসা মুস্কিল।" অবস্থাগুণে যতই মুস্কিল হোক্ না কেন, বাঙ্গালীজাতিকে এই গৌড়-সারঙ্গই গাইতে চেষ্টা করতে হবে। আমাদের বাঙ্গলাঘরের খিড়কি-দরজার ভিতর প্রাচীন ভারতবর্ষের হাতী গলাবার চেষ্টা কর্‌তে হবে, আমাদের গৌড়-ভাষার মৃৎ-কুম্ভের মধ্যে সাত সমুদ্রকে পাত্রস্থ কর্‌তে চেষ্টা কর্‌তে হবে। এ সাধনা অবশ্য কঠিন, কিন্তু স্বজাতির মুক্তির জন্য অপর কোনও সহজ সাধনপদ্ধতি আমাদের জানা নেই।

সম্পাদক।

সবুজ পত্র

বাঙ্গলা দেশ যে সবুজ, এ কথা বোধ হয় বাহ্যজ্ঞানশূন্য লোকেও অস্বীকার কর্‌বেন না। মা'র শস্যশ্যামলরূপ বাঙ্গলার এত গদ্যেপদ্যে এতটা পল্লবিত হয়ে উঠেছে, যে সে বর্ণনার যাথার্থ্য বিশ্বাস করবার জন্য চোখে দেখবারও আবশ্যক নেই। পুনরুক্তির গুণে এটি সেই শ্রেণীর

সত্য হয়ে দাঁড়িয়েছে, যার সম্বন্ধে চক্ষুকর্ণের যে বিবাদ হতে পারে, এরূপ সন্দেহ আমাদের মনে মুহূর্ত্তের জন্যও স্থান পায় না। এ ক্ষেত্রে সৌভাগ্যবশতঃ নাম ও রূপের বাস্তবিকই কোন বিরোধ নেই। একবার চোখ তাকিয়ে দেখলেই দেখা যায় যে, তরাই হতে সুন্দরবন পর্য্যন্ত; এক ঢালা সবুজবর্ণ দেশটিকে আদ্যোপান্ত ছেয়ে রেখেছে। কোথায়ও তার বিচ্ছেদ নেই, কোথায়ও তার বিরাম নেই;—শুধু তাই নয়, সেই রং বাঙ্গলার সীমানা অতিক্রম করে', উত্তরে হিমালয়ের উপরে ছাপিয়ে উঠেছে, ও দক্ষিণে বঙ্গোপসাগরের ভিতর চারিয়ে গেছে।

সবুজ, বাঙ্গলার শুধু দেশযোড়া রং নয়, বারোমেসে রং। আমাদের দেশে প্রকৃতি বহুরূপী নয়, এবং ঋতুর সঙ্গে সঙ্গে বেশ পরিবর্ত্তন করে না। বসন্তে বিয়ের কনের মত ফুলের জহরতে আপাদমস্তক সালঙ্কারা হয়ে দেখা দেয় না; বর্ষার জলে শুচিস্নাতা হয়ে শরতে পূজার তসর ধারণ করে আসে না, শীতে বিধবার মত শাদা সাড়ীও পরে না। মাধব হতে মধু পর্য্যন্ত ঐ সবুজের টানা সুর চলে; ঋতুর প্রভাবে সে সুরের যে রূপান্তর হয় সে শুধু কড়ি কোমলে। আমাদের দেশে অবশ্য বর্ণের বৈচিত্র্যের অভাব নেই। আকাশে ও জলে, ফুলে ও ফলে, আমরা বর্ণ-গ্রামের সকল সুরেরই খেলা দেখতে পাই। কিন্তু মেঘের রং ও ফুলের রং ক্ষণস্থায়ী; প্রকৃতির ও-সকল রাগরঙ্গ তার বিভাব ও অনুভাব মাত্র। তার স্থায়ী ভাবের, তার মূল রসের পরিচয় শুধু সবুজে। পাঁচরঙা ব্যাভিচারীভাবসকলের সার্থকতা হচ্ছে বঙ্গদেশের এই অখণ্ড-হরিৎ স্থায়ীভাবটিকে ফুটিয়ে তোলা।

এরূপ হবার অবশ্য একটা অর্থ আছে। বর্ণ মাত্রেই ব্যঞ্জন বর্ণ,—অর্থাৎ বর্ণের উদ্দেশ্য শুধু বাহ্য-বস্তুকে লক্ষণান্বিত করা নয়, কিন্তু সেই

সুযোগে নিজেকেও ব্যক্ত করা। যা স্বপ্রকাশ নয়, তা অপর কিছুই প্রকাশ করতে পারে না। তাই রং রূপও বটে, রূপকও বটে। যতক্ষণ আমাদের বিভিন্ন বর্ণের বিশেষ ব্যক্তিত্বের জ্ঞান না জন্মায়, ততক্ষণ আমাদের প্রকৃতির বর্ণপরিচয় হয় না, এবং আমরা তার বক্তব্য কথা বুঝতে পারিনে। বাঙ্গলার সবুজ পত্রে যে সুসমাচার লেখা আছে, তা পড়বার জন্য প্রত্নতাত্ত্বিক হবার আবশ্যক নেই—কারণ সে লেখার ভাষা বাঙ্গলার প্রাকৃত। তবে আমরা সকলে যে তার অর্থ বুঝতে পারিনে, তার কারণ হচ্ছে যিনি গুপ্ত জিনিষ আবিষ্কার করতে ব্যস্ত, ব্যক্ত জিনিষ তাঁর চোখে পড়ে না।

যাঁর ইন্দ্রধনুর সঙ্গে চাক্ষুষ পরিচয় আছে আর তার জন্মকথা জানা আছে, তিনিই জানেন যে সূর্য্যকিরণ নানা বর্ণের একটি সমষ্টি মাত্র, এবং শুধু সিধে পথেই সে শাদা ভাবে চলতে পারে। কিন্তু তার সরল গতিতে বাধা পড়লেই সে সমষ্টি ব্যস্ত হয়ে পড়ে, বক্র হয়ে বিচিত্র ভঙ্গী ধারণ করে, এবং তার বর্ণসকল পাঁচ বর্গে বিভক্ত হয়ে যায়। সবুজ হচ্ছে এই বর্ণমালার মধ্যমণি। এবং নিজগুণেই সে বর্ণরাজ্যের কেন্দ্রস্থল অধিকার করে' থাকে। বেগুনী কিশলয়ের রং,—জীবনের পূর্ব্বরাগের রং। লাল রক্তের রং,—জীবনের পূর্ণরাগের রং। নীল আকাশের রং,—অনন্তের রং। পীত শুষ্কপত্রের রং,—মৃত্যুর রং। কিন্তু সবুজ হচ্ছে নবীন পত্রের রং,—রসের ও প্রাণের যুগপৎ লক্ষণ ও ব্যক্তি। তার দক্ষিণে নীল আর বামে পীত, তার পূর্ব্ব সীমায় বেগুনী আর পশ্চিম সীমায় লাল। অনন্ত ও অন্তের মধ্যে, পূর্ব্ব ও পশ্চিমের মধ্যে, স্মৃতি ও আশার মধ্যে মধ্যস্থতা করাই হচ্ছে সবুজের, অর্থাৎ সরস প্রাণের স্বধর্ম্ম।

যে বর্ণ বাঙ্গলার ওষধিতে ও বনস্পতিতে নিত্য বিকশিত হয়ে উঠছে, নিশ্চয় সেই একই বর্ণ আমাদের হৃদয় মনকেও রঙ্গিয়ে রেখেছে। আমাদের বাহিরের প্রকৃতির যে রং, আমাদের অন্তরের পুরুষেরও সেই রং। এ কথা যদি সত্য হয় তাহলে, সজীবতা ও সরসতাই হচ্ছে বাঙ্গালীর মনের নৈসর্গিক ধর্ম্ম। প্রমাণ স্বরূপে দেখান যেতে পারে, যে আমাদের দেবতা হয় শ্যাম নয় শ্যামা। আমাদের হৃদয়মন্দিরে রজতগিরিসন্নিভ কিম্বা জবাকুসুমসঙ্কাশ দেবতার স্থান নেই; আমরা শৈবও নই সৌরও নই।

আমরা হয় বৈষ্ণব নয় শাক্ত। এ উভয়ের মধ্যে বাঁশি ও অসির যা প্রভেদ সেই পার্থক্য বিদ্যমান, তবুও বর্ণসামান্যতার গুণে শ্যাম ও শ্যামা আমাদের মনের ঘরে নির্ব্বিবাদে পাশাপাশি অবস্থিতি করে। তবে বঙ্গ-সরস্বতীর দুর্ব্বাদলশ্যামরূপ আমাদের চোখে যে পড়ে না, তার জন্য দোষী আমরা নই, দোষী আমাদের শিক্ষা। একালের বাণীর মন্দির হচ্ছে বিদ্যালয়। সেখানে আমাদের গুরুরা এবং গুরুজনেরা যে জড় ও কঠিন শ্বেতাঙ্গী ও শ্বেতবসনা পাষাণ মূর্ত্তির প্রতিষ্ঠা করেছেন, আমাদের মন তার কায়িক এবং বাচিক সেবায়, দিন দিন নীরস ও নির্জ্জীব হয়ে পড়ছে। আমরা যে নিজের আত্মার সাক্ষাৎকার লাভ করিনে, তার কারণ আমাদের নিজের সঙ্গে আমাদের কেউ পরিচয় করিয়ে দেয় না। আমাদের সমাজ ও শিক্ষা দুই আমাদের ব্যক্তিত্বের বিরোধী। সমাজ শুধু একজনকে আর-পাঁচজনের মত হতে বলে, ভুলেও কখনও আর-পাঁচজনকে একজনের মত হতে বলে না। সমাজের ধর্ম্ম হচ্ছে প্রত্যেকের স্বধর্ম্ম নষ্ট করা। সমাজের যা মন্ত্র, তারি সাধন-পদ্ধতির নাম শিক্ষা। তাই শিক্ষার বিধি হচ্ছে "অপরের মত হও", আর তার

নিষেধ হচ্ছে "নিজের মত হয়ো না।" এই শিক্ষার কৃপায় আমাদের মনে এই অদ্ভুত সংস্কার বদ্ধমূল হয়ে গেছে যে, আমাদের স্বধর্ম্ম এতই ভয়াবহ যে তার চাইতে পরধর্ম্মে নিধনও শ্রেয়। সুতরাং কাজে ও কথায়, লেখায় ও পড়ায়, আমরা আমাদের মনের সরস সতেজ ভাবটি নষ্ট করতে সদাই উৎসুক। এর কারণও স্পষ্ট,—সবুজ রং, ভালমন্দ দুই অর্থেই কাঁচা। তাই আমাদের কর্ম্মযোগীরা আর জ্ঞানযোগীরা, অর্থাৎ শাস্ত্রীর দল, আমাদের মনটিকে রাতারাতি পাকা করে' তুলতে চান্। তাঁদের বিশ্বাস যে কোনরূপ কর্ম্ম কিম্বা জ্ঞানের চাপে আমাদের হৃদয়ের রসটুকু নিংড়ে ফেলতে পারলেই—আমাদের মনের রং পেকে উঠবে। তাঁদের রাগ এই যে, সবুজ বর্ণমালার অন্তস্থ বর্ণ নয়, এবং ও রং কিছুরই অন্তে আসে না,—জীবনেরও নয়, বেদেরও নয়, কর্ম্মেরও নয়, জ্ঞানেরও নয়। এঁদের চোখে সবুজ-মনের প্রধান দোষ, যে সে মন পূর্ব্বমীমাংসার অধিকার ছাড়িয়ে এসেছে, এবং উত্তর মীমাংসার দেশে গিয়ে পৌঁছয় নি। এঁরা ভুলে যান্ যে, জোর করে পাকাতে গিয়ে আমরা শুধু হরিৎকে পীতের ঘরে টেনে আনি,—প্রাণকে মৃত্যুর দ্বারস্থ করি। অপর দিকে এদেশের ভক্তিযোগীরা, অর্থাৎ কবির দল, কাঁচাকে কচি করতে চান। এঁরা চান যে আমরা শুধু গদগদ ভাবে আধ-আধ কথা কই। এঁদের রাগ সবুজের সজীবতার উপর। এঁদের ইচ্ছা সবুজের তেজটুকু বহিষ্কৃত করে' দিয়ে, ছাঁকা রসটুকু রাখেন। এঁরা ভুলে যান যে, পাতা কখনও আর কিশলয়ে ফিরে যেতে পারে না। প্রাণ পশ্চাৎপদ হতে জানে না, তার ধর্ম্ম হচ্ছে এগোনো, তার লক্ষ্য হচ্ছে হয় অমৃতত্ব নয় মৃত্যু। যে মন একবার কর্ম্মের তেজ ও জ্ঞানের ব্যোমের পরিচয় লাভ করেছে, সে এ উভয়কে অন্তরঙ্গ করবেই,—

কেবলমাত্র ভক্তির শান্তিজলে সে তার সমস্ত হৃদয় পূর্ণ করে' রাখ্‌তে পারে না। আসল কথা হচ্ছে, তারিখ এগিয়ে কিম্বা পিছিয়ে দিয়ে যৌবনকে ফাঁকি দেওয়া যায় না। এ উভয়ের সমবেত চেষ্টার ফল দাঁড়িয়েছে এই যে, বাঙ্গালীর মন এখন অর্দ্ধেক অকাল-পক্ক, এবং অর্দ্ধেক অযথা কচি। আমাদের আশা আছে যে সবুজ ক্রমে পেকে লাল হয়ে উঠবে। কিন্তু আমাদের অন্তরের আজকের সবুজরস কালকের লালরক্তে তবেই পরিণত হবে, যদি আমরা স্বধর্ম্মের পরিচয় পাই এবং প্রাণপণে তার চর্চ্চা করি। আমরা তাই দেশী কি বিলাতী পাথরে-গড়া সরস্বতীর মূর্ত্তির পরিবর্ত্তে, বাঙ্গলার কাব্যমন্দিরে দেশের মাটির ঘটস্থাপনা করে', তার মধ্যে সবুজ পত্রের প্রতিষ্ঠা কর্‌তে চাই। কিন্তু এ মন্দিরের কোনও গর্ভ-মন্দির থাক্‌বে না, কারণ সবুজের পূর্ণ অভিব্যক্তির জন্য আলো চাই, আর বাতাস চাই। অন্ধকারে সবুজ ভয়ে নীল হয়ে যায়। বদ্ধ ঘরে সবুজ দুঃখে পাণ্ডু হয়ে যায়। আমাদের নব-মন্দিরের চারিদিকের অবারিত দ্বার দিয়ে প্রাণবায়ুর সঙ্গে সঙ্গে বিশ্বের যত আলো অবাধে প্রবেশ কর্‌তে পার্‌বে। শুধু তাই নয়, এ মন্দিরে সকল বর্ণের প্রবেশের সমান অধিকার থাক্‌বে। উষার গোলাপী, আকাশের নীল, সন্ধ্যার লাল, মেঘের নীল-লোহিত, বিরোধালঙ্কারস্বরূপে সবুজ পত্রের গাত্রে সংলগ্ন হয়ে তার মরকতদ্যুতি কখনও উজ্জ্বল, কখনও কোমল করে' তুলবে। সে মন্দিরে স্থান হবে না কেবল শুষ্ক পত্রের।

বীরবল।

সবুজের অভিযান

ওরে নবীন, ওরে আমার কাঁচা !
ওরে সবুজ, ওরে অবুঝ,
আধ-মরাদের ঘা মেরে তুই বাঁচা !
রক্ত আলোর মদে মাতাল ভোরে
আজকে যে যা বলে বলুক তোরে !
সকল তর্ক হেলায় তুচ্ছ করে
পুচ্ছটি তোর উচ্চে তুলে নাচা !
আয় দুরন্ত, আয়রে আমার কাঁচা !

খাঁচাখানা দুলচে মৃদু হাওয়ায়।
আর ত কিছুই নড়েনা রে
ওদের ঘরে, ওদের ঘরের দাওয়ায়।
ঐ যে প্রবীণ, ঐ যে পরম পাকা,
চক্ষু কর্ণ দুইটি ডানায় ঢাকা,
ঝিমায় যেন চিত্রপটে আঁকা
অন্ধকারে বন্ধ-করা খাঁচায় !
আয় জীবন্ত, আয়রে আমার কাঁচা !

3961.
THE ASIATIC SOCIETY 5.11.66 CALCUTTA-16

বাহির পানে তাকায় না যে কেউ !
দেখে না যে বান ডেকেছে.
জোয়ার জলে উঠ্‌ছে প্রবল ঢেউ ।
চলতে ওরা চায়না মাটির ছেলে
মাটির পরে চরণ ফেলে ফেলে,
আছে অচল আসনখানা মেলে
যে যার আপন উচ্চ বাঁশের মাচায়,
আয় অশান্ত, আয়রে আমার কাঁচা !

তোরে হেথায় করবে সবাই মানা ।
হঠাৎ আলো দেখ্‌বে যখন
ভাববে একি বিষম কাণ্ডখানা !
সংঘাতে তোর উঠবে ওরা রেগে,
শয়ন ছেড়ে আসবে ছুটে বেগে,
সেই সুযোগে ঘুমের থেকে জেগে
লাগবে লড়াই মিথ্যা এবং সাঁচায় !
আয় প্রচণ্ড, আয়রে আমার কাঁচা !

শিকল দেবীর ঐ যে পূজাবেদী
চিরকাল কি রইবে খাড়া ?
পাগলামি তুই আয়রে দুয়ার ভেদি' !
ঝড়ের মাতন ! বিজয়-কেতন নেড়ে
অট্টহাস্যে আকাশখানা ফেড়ে,

ভোলানাথের ঝোলাঝুলি ঝেড়ে
ভুলগুলো সব আন্‌রে বাছা বাছা !
আয় প্রমত্ত, আয়রে আমার কাঁচা !

আন্‌রে টেনে বাঁধা-পথের শেষে !
বিবাগী কর্‌ অবাধ-পানে,
পথ কেটে যাই অজানাদের দেশে।
আপদ আছে জানি আঘাত আছে,
তাই জেনে ত বক্ষে পরাণ নাচে,
ঘুচিয়ে দে ভাই পুঁথি-পোড়োর কাছে
পথে চলার বিধি-বিধান যাচা' !
আয় প্রমুক্ত, আয়রে আমার কাঁচা !

চিরযুবা তুই যে চিরজীবী !
জীর্ণ জরা ঝরিয়ে দিয়ে
প্রাণ অফুরাণ ছড়িয়ে দেদার্‌ দিবি !
সবুজ নেশায় ভোর করেছিস ধরা,
ঝড়ের মেঘে তোরি তড়িৎ ভরা,
বসন্তেরে পরাস আকুল-করা
আপন গলার বকুল মাল্যগাছা,
আয়রে অমর, আয়রে আমার কাঁচা !

১৫ই বৈশাখ ১৩১৫ শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

বিবেচনা ও অবিবেচনা

বাংলা দেশে একদিন স্বদেশপ্রেমের বান ডাকিল; আমাদের প্রাণের ধারা হঠাৎ অসম্ভব রকম ফুলিয়া উঠিয়া পাড়ি ছাপাইয়া পড়ে আর কি। সেই বেগটা যে সত্য তাহার প্রমাণ এই যে, তাহার চাঞ্চল্যে কেবল আমাদের কাগজের নৌকাগুলাকে দোলা দেয় নাই, কেবল সভাতলেই করতালির তুফান উঠিয়া সমস্ত চুকিয়া গেল না।

সেদিন সমাজটাও যেন আগাগোড়া নড়িয়া উঠিল এমনতর বোধ হইয়াছিল। এক মুহূর্তেই তাঁতের কাজে ব্রাহ্মণের ছেলের বাধা ছুটিয়া গেল; ভদ্রসন্তান কাপড়ের মোট বহিয়া রাস্তায় বাহির হইয়া পড়িল, এমন কি, হিন্দুমুসলমানে একত্রে বসিয়া আহার করার আয়োজনটাও হয়-হয় করিতে লাগিল।

এসব তর্ক করিয়া হয় নাই—কেহ বিধান লইবার জন্য অধ্যাপক-পাড়ায় যাতায়াত করে নাই। প্রাণ জাগিলেই কাহারো পরামর্শ না লইয়া আপনি সে চলিতে প্রবৃত্ত হয়; তখন সে চলার পথের সমস্ত বাধাগুলাকে কোলের কাছে টানিয়া লইয়া তাহাতে গম্ভীরভাবে সিঁদূর চন্দন মাখাইতে বসে না, কিম্বা তাহাকে লইয়া বসিয়া বসিয়া সুনিপুণ তত্ত্ব বা সুচারু কবিত্বের সূক্ষ্ম বুনানি বিস্তার করিতেও তাহার প্রবৃত্তি হয় না। যেমনি চলিতে যায় অমনি সে আপনিই বুঝিতে পারে কোন্‌গুলা লইয়া তাহার চলিবে না; তখন যাহা গায়ে ঠেকে তাহাকেই সমস্ত গা দিয়া সে ঠেলা দিতে সুরু করে। সেই সাবেক পাথরগুলা যখন ঠেলার চোটে টলিতে থাকে তখন বোঝা যায় প্রাণ জাগিয়াছে বটে, ইহা মায়া নহে স্বপ্ন নহে।

সেই বন্যার বেগ কমিয়া আসিয়াছে। সমাজের মধ্যে যে চলার ঝোঁক আসিয়াছিল সেটা কাটিয়া গিয়া আজ আবার বাঁধি বোলের বেড়া বাঁধিবার দিন আসিয়াছে।

আজ আবার সমাজকে বাহবা দিবার পালা আরম্ভ হইল। জগতের মধ্যে কেবলমাত্র ভারতেরই জলবাতাসে এমন একটি অদ্ভুত জাদু আছে যে এখানে রীতি আপনিই নীতিকে বরণ করিয়া লয়, আচারের পক্ষে বিচারের কোনো প্রয়োজনই হয় না। আমাদের কিছুই বানাইবার দরকার নাই কেবল মানিয়া গেলেই চলে, এই বলিয়া নিজেকে অভিনন্দন করিতে বসিয়াছি।

যে লোক কাজের উৎসাহে আছে, স্তবের উৎসাহে তাহার প্রয়োজনই থাকে না। ইহার প্রমাণ দেখ, আমরাও পশ্চিম সমুদ্র-পারে গিয়া সেখানকার মানুষদের মুখের উপর বলিয়া আসিয়াছি, "তোমরা মরিতে বসিয়াছ! আত্মা বলিয়া পদার্থকে কেবলি বস্তু-চাপা দিয়া তাহার দম বন্ধ করিবার জো করিয়াছ,—তোমরা স্থূলের উপাসক।" এসব কঠোর কথা শুনিয়া তাহারা ত মারমূর্ত্তি ধরে নাই। বরঞ্চ ভাল-মানুষের মত মানিয়া লইয়াছে; মনে মনে বলিয়াছে, "হবেও বা! আমাদের বয়স অল্প, আমরা কাজ বুঝি—ইহারা অত্যন্ত প্রাচীন, অতএব কাজ কামাই করা সম্বন্ধে ইহারা যে তত্ত্বকথাগুলা বলে নিশ্চয় সেগুলা ইহারা আমাদের চেয়ে ভালই বোঝে।" এই বলিয়া ইহারা আমাদিগকে দক্ষিণা দিয়া খুসি করিয়া বিদায় করিয়াছে এবং তাহার পরে আস্তিন গুটাইয়া যেমন কাজ করিতেছিল তেমনিই কাজ করিতে লাগিয়াছে।

কেননা, হাজারই ইহাদিগকে নিন্দা করি আর ভয় দেখাই ইহারা

যে চলিতেছে; ইহারা যে প্রাণবান তাহার প্রমাণ যে ইহাদের নিজেরই মধ্যে। মরার বাড়া গালি নাই, একথা ইহাদের পক্ষে খাটে না। কেননা সে গালিকে সম্পূর্ণ বিশ্বাসের সঙ্গে ইহারা গ্রহণ করিতে পারে না। ইহাদের জীবনযাত্রায় সঙ্কটের সীমা নাই, সমস্যার গ্রন্থিও বিস্তর কিন্তু সকলের উপরে ইহাদিগকে ভরসা দিতেছে ইহাদের প্রাণ। এইজন্য ইহারা নিন্দা অনায়াসে সহিতে পারে এবং নৈরাশ্যের কথাটাকে লইয়া ক্ষণকালের জন্য খেলা করে মাত্র, তাহাতে তাহাদের প্রাণের বেগে আর একটু উত্তেজনার সঞ্চার করে।

আমরাও তেমনি নিন্দা সহজে সহিতে পারিতাম যদি পূরাদমে কাজের পথে চলিতাম। কারণ তাহা হইলে আপনিই বুঝিতে পারিতাম প্রাণের গতিতে সমস্ত গ্লানিকে ভাসাইয়া লইয়া যায়। পঙ্ক যখন অচল হইয়া থাকে তখন সেটা নিন্দিত, কিন্তু জোয়ারের গঙ্গাকে পঙ্কিল বলিয়া দোষ দিলেও যাহারা স্নান করে তাহাদের তাহাতে বাধা হয় না।

এই জন্য, নিষ্কর্ম্মণ্য যে তাহারই অহোরাত্র স্তবের দরকার হয়। যে ধনীর কীর্ত্তিও নাই, হাতে কোনো কর্ম্মও নাই, চাটুকারের প্রয়োজন সব চেয়ে তাহারই অধিক, নহিলে সে আপনার জড়ত্বের বোঝা বহিবে কেমন করিয়া? তাহাকে পরামর্শ দেওয়া উচিত যে, তোমার এই বনেদী স্থাবরত্ব গৌরব করিবার জিনিষ নয়, যেমন করিয়া পার একটা কর্ম্মে লাগিয়া যাও। কিন্তু এস্থলে পরামর্শদাতার কাজটা নিরাপদ নহে, বাবুর পারিষদবর্গ তখনি হাঁ হাঁ করিয়া আসিবে। সুতরাং বক্‌শিসের প্রত্যাশা থাকিলে বলিতে হয় "হুজুর, আপনি যে সনাতন তাকিয়া ঠেসান দিয়া বসিয়াছেন উহার তুলার স্তূপ জগতে অতুল, অতএব বংশের গৌরব যদি রাখিতে চান ত নড়িবেন না।"

আমাদের সমাজে যে পরিমাণে কর্ম্ম বন্ধ হইয়া আসিয়াছে সেই পরিমাণে বাহবার ঘটা বাড়িয়া উঠিয়াছে। চলিতে গেলেই দেখি সকল বিষয়েই পদে পদে কেবলি বাধে। এমন স্থলে হয় বলিতে হয় খাঁচাটাকে ভাঙ, কারণ ওটা আমাদের ঈশ্বরদত্ত পাখাদুটাকে অসাড় করিয়া দিল; নয় বলিতে হয় ঈশ্বরদত্ত পাখার চেয়ে খাঁচার লোহার শলাগুলো পবিত্র, কারণ, পাখা ত আজ উঠিতেছে আবার কাল পড়িতেছে কিন্তু লোহার শলাগুলো চিরকাল স্থির আছে। বিধাতার সৃষ্টি পাখা নূতন, আর কামারের সৃষ্টি খাঁচা সনাতন; অতএব ঐ খাঁচার সীমাটুকুর মধ্যে যতটুকু পাখাঝাপট সম্ভব সেইটুকুই বিধি, তাহাই ধর্ম্ম, আর তাহার বাহিরে অনন্ত আকাশভরা নিষেধ। খাঁচার মধ্যে যদি নিতান্তই থাকিতে হয় তবে খাঁচার স্তব করিলে নিশ্চয়ই মন ঠাণ্ডা থাকে।

আমাদের সামাজিক কামারে যে শলাটি যেমন করিয়া বানাইয়াছে শিশুকাল হইতে তাহারই স্তবের বুলি পড়িয়া পড়িয়া আমারা অন্য সকল গান ভুলিয়াছি, কেননা অন্যথা করিলে বিপদের অন্ত নাই। আমাদের এখানে সকল দিকেই ঐ কামারেরই হইল জয়, আর সব চেয়ে বিড়ম্বিত হইলেন বিধাতা, যিনি আমাদিগকে কর্ম্মশক্তি দিয়াছেন, যিনি মানুষ বলিয়া আমাদিগকে বুদ্ধি দিয়া গৌরবান্বিত করিয়াছেন।

যাঁহারা বলিতেছেন যেখানে যাহা আছে সমস্তই বজায় থাক্, তাঁহারা সকলেই আমাদের প্রণম্য,—কারণ, তাঁহাদের বয়স অল্পই হউক্ আর বেশিই হউক্ তাঁহারা সকলেই প্রবীণ। সংসারে তাঁহাদের প্রয়োজন আমরা অস্বীকার করি না। পৃথিবীতে এমন সমাজ নাই

যেখানে তাঁহারা দণ্ড ধরিয়া বসিয়া নাই। কিন্তু বিধাতার বরে যে সমাজ বাঁচিয়া থাকিবে সে সমাজে তাঁহাদের দণ্ডই চরম বলিয়া মান পায় না।

সেদিন একটি কুকুরছানাকে দেখা গেল, মাটির উপর দিয়া একটি কীট চলিতেছে দেখিয়া তাহার ভারি কৌতূহল। সে তাহাকে শুঁকিতে শুঁকিতে তাহার অনুসরণ করিয়া চলিল। যেমনি পোকাটা একটু ধড়ফড় করিয়া উঠিতেছে অমনি কুকুরশাবক চমকিয়া পিছাইয়া আসিতেছে।

দেখা গেল তাহার মধ্যে নিষেধ এবং তাগিদ দুটা জিনিষই আছে। প্রাণের স্বাভাবিক প্রবৃত্তি এই যে, সমস্তকেই সে পরখ করিয়া দেখে। নূতন নূতন অভিজ্ঞতার পথ ধরিয়া সে আপনার অধিকার বিস্তার করিয়া চলিতে চায়। প্রাণ দুঃসাহসিক—বিপদের ঠোকর খাইলেও সে আপনার জয়যাত্রার পথ হইতে সম্পূর্ণ নিরস্ত হইতে চায় না। কিন্তু তাহার মধ্যে একটি প্রবীণও আছে, বাধার বিকট চেহারা দেখিবামাত্রই সে বলে, কাজ কি! বহু পুরাতন যুগ হইতে পুরুষানুক্রমে যত কিছু বিপদের তাড়না আপনার ভয়ের সংবাদ রাখিয়া গিয়াছে তাহাকে পুঁথির আকারে বাঁধাইয়া রাখিয়া একটি বৃদ্ধ তাহারি খবরদারী করিতেছে। নবীন প্রাণ এবং প্রবীণ ভয়, জীবের মধ্যে উভয়েই কাজ করিতেছে। ভয় বলিতেছে, "রোস রোস," প্রাণ বলিতেছে, "দেখাই যাক্ না!"

অতএব এই প্রবীণতার বিরুদ্ধে আমরা আপত্তি করিবার কে? আপত্তি করিও না। তাঁহার বৈঠকে তিনি গদীয়ান হইয়া থাকিবেন, সেখান হইতে তাঁহাকে আমরা নড়িয়া বসিতে বলি এমন বেআদব

আমরা নই। কিন্তু প্রাণের রাজ্যে তাঁহাকেই একেশ্বর করিবার যখন ষড়যন্ত্র হয় তখনই বিদ্রোহের ধ্বজা তুলিয়া বাহির হইবার দিন আসে। দুর্ভাবনা এবং নির্ভাবনা উভয়কেই আমরা খাতির করিয়া চলিতে রাজি আছি।

প্রাণের রাজ্যাধিকারে এই উভয়েই সরিক বটে কিন্তু উভয়ের অংশ যে সমান তাহাও আমরা মানিতে পারি না। নির্ভাবনার অংশটাই বেশি হওয়া চাই নহিলে স্রোত এতই মন্দ বহে যে শেওলা জমিয়া জলটা চাপা পড়ে। মৃত্যুসংখ্যার চেয়ে জন্মসংখ্যা বেশি হওয়াই কল্যাণের লক্ষণ।

পৃথিবীতে বারো আনা জল চার আনা স্থল। এরূপ বিভাগ না হইলে বিপদ ঘটিত। কারণ জলই পৃথিবীতে গতি সঞ্চার করিতেছে, প্রাণকে বিস্তারিত করিয়া দিতেছে। জলই খাদ্যকে সচল করিয়া গাছপালা পশুপক্ষীকে স্তন্য দান করিতেছে। জলই সমুদ্র হইতে আকাশে উঠিতেছে, আকাশ হইতে পৃথিবীতে নামিতেছে, মলিনকে ধৌত করিতেছে, পুরাতনকে নূতন ও শুষ্ককে সরস করিয়া তুলিতেছে। পৃথিবীর উপর দিয়া যে জীবের প্রবাহ নব নব ধারায় চলিয়াছে তাহার মূলে এই জলেরই ধারা। স্থলের একাধিপত্য যে কি ভয়ঙ্কর তাহা মধ্য-এসিয়ার মরুপ্রান্তরের দিকে তাকাইলেই বুঝা যাইবে। তাহার অচলতার তলে কত বড় বড় সহর লুপ্ত হইয়া গিয়াছে। যে পুরাতন পথ বাহিয়া ভারতবর্ষ হইতে চীনে জাপানে পণ্য ও চিত্ত বিনিময় চলিত, এই রুদ্র মরু সে পথের চিহ্ন মুছিয়া দিল; কত যুগের প্রাণচঞ্চল ইতিহাসকে বালুচাপা দিয়া সে কঙ্কালসার করিয়া দিয়াছে। উলঙ্গ ধূর্জ্জটী সেখানে একা স্থাণু হইয়া ঊর্দ্ধনেত্রে বসিয়া আছেন; উমা নাই। দেবতারা তাই প্রমাদ

গণিতেছেন,—কুমারের জন্ম হইবে কেমন করিয়া ? নূতন প্রাণের বিকাশ হইবে কি উপায়ে ?

জোর করিয়া চোখ বুজিয়া যদি না থাকি তবে নিজের সমাজের দিকে তাকাইলেও এই চেহারাই দেখিতে পাইব। এখানে স্থূলের স্থাবরতা ভয়ঙ্কর হইয়া বসিয়া আছে—এ যে পক্ককেশের শুভ্র মরুভূমি। এখানে এককালে যখন প্রাণের রস বহিত তখন ইতিহাস সজীব হইয়া সচল হইয়া কেবল যে এক প্রদেশ হইতে আর এক প্রদেশে ব্যাপ্ত হইত তাহা নহে,—মহতী স্রোতস্বিনীর মত দেশ হইতে দেশান্তরে চলিয়া যাইত। বিশ্বের সঙ্গে সেই প্রাণ বিনিময়ের সেই পণ্য বিনিময়ের ধারা ও তাহার বিপুল রাজপথ কবে কোন্‌কালে বালু-চাপা পড়িয়া গেছে। এখানে সেখানে মাটি খুঁড়িয়া বাহনদের কঙ্কাল খুঁজিয়া পাওয়া যায়, পুরাতত্ত্ববিদের খনিত্রের মুখে পণ্যসামগ্রীর দুটো একটা ভাঙাটুক্‌রা উঠিয়া পড়ে। গুহাগহ্বরে গহনে সেকালের শিল্প-প্রবাহিনীর কিছু কিছু অংশ আটকা পড়িয়া গেছে, কিন্তু আজ তাহা স্থির, তাহার ধারা নাই। সমস্ত স্বপ্নের মত মনে হয়। আমাদের সঙ্গে ইহাদের সম্বন্ধ কি ? সমস্ত সৃষ্টির স্রোত বন্ধ। যাহা আছে তাহা আছে, যাহা ছিল তাহা কেবলি তলাইয়া যাইতেছে।

চারিদিক এমনি নিস্তব্ধ নিশ্চল যে মনে ভ্রম হয় ইহাই সনাতন। কখনই নহে, ইহাই নূতন। এই মরুভূমি সনাতন নহে, ইহার বহু-পূর্ব্বে এখানে প্রাণের নব নব লীলা চলিত—সেই লীলায় কত বিজ্ঞান দর্শন, শিল্প সাহিত্য, রাজ্য সাম্রাজ্য, কত ধর্ম্ম ও সমাজবিপ্লব তরঙ্গিত হইয়া উঠিয়াছে। কিছু না করিয়া একবার মহাভারতটা পড়িয়া দেখিলেই দেখা যাইবে, সমাজটা কোনো সংহিতার কারখানাঘরের

ঢালাই-পেটাইকরা ও কারিগরের ছাপমারা সামগ্রী ছিল না—তাহাতে বিধাতার নিজের সৃষ্টির সমস্ত লক্ষণ ছিল, কেননা তাহাতে প্রাণ ছিল। তাহা নিখুঁৎ নয়, নিটোল নয়; তাহা সজীব, তাহা প্রবল, তাহা কৌতূহলী, তাহা দুঃসাহসিক।

ইজিপ্টের প্রকাণ্ড কবরগুলার তলায় যে সমস্ত "মমি" মৃত্যুকে অমর করিয়া দাঁত মেলিয়া জীবনকে ব্যঙ্গ করিতেছে তাহাদিগকেই কি বলিবে সনাতন? তাহাদের সিন্ধুকের গায়ে যত প্রাচীন তারিখের চিহ্নই খোদা থাক্ না কেন, সেই ইজিপ্টের নীল-নদীর পলিপড়া মাঠে আজ যে "ফেলাহীন্" চাষা চাষ করিতেছে তাহারই প্রাণ যথার্থ সনাতন। মৃত্যু যে প্রাণের ছোট ভাই; আগে প্রাণ তাহার পরে মৃত্যু। যাহা কিছু চলিতেছে তাহারই সঙ্গে জগতের চিরন্তন চলার যোগ আছে —যাহা থামিয়া বসিয়াছে তাহার সঙ্গে সনাতন প্রাণের বিচ্ছেদ ঘটিয়াছে। আজ ক্ষুদ্র ভারতের প্রাণ একেবারে ঠাণ্ডা হইয়া স্থির হইয়া গেছে, তাহার মধ্যে সাহস নাই, সৃষ্টির কোনো উদ্যম নাই, এই জন্যই মহাভারতের সনাতন প্রাণের সঙ্গে তাহার যোগই নাই। যে যুগ দর্শন চিন্তা করিয়াছিল, যে যুগ শিল্প সৃষ্টি করিয়াছিল, যে যুগ রাজ্য বিস্তার করিয়াছিল তাহার সঙ্গে ইহার সম্বন্ধ বিচ্ছিন্ন। অথচ আমরা তারিখের হিসাব করিয়া বলিতেছি জগতে আমাদের মত সনাতন আর কিছুই নাই;—কিন্তু তারিখ ত কেবল অঙ্কের হিসাব, তাহা ত প্রাণের হিসাব নয়। তাহা হইলে ত ভস্মও অঙ্ক গণনা করিয়া বলিতে পারে সেই সকলের চেয়ে প্রাচীন অগ্নি।

পৃথিবীর সমস্ত বড় বড় সভ্যতাই দুঃসাহসের সৃষ্টি। শক্তির দুঃসাহস, বুদ্ধির দুঃসাহস, আকাঙ্ক্ষার দুঃসাহস। শক্তি কোথাও বাধা

মানিতে চায় নাই বলিয়া মানুষ সমুদ্র পর্ব্বত লঙ্ঘন করিয়া চলিয়া গিয়াছে, বুদ্ধি আপাতপ্রতীয়মানকে ছাড়াইয়া অন্ধসংস্কারের মোহজালকে ছিন্ন বিচ্ছিন্ন করিয়া মহৎ হইতে মহীয়ানে, অণু হইতে অণীয়ানে, দূর হইতে দূরান্তরে, নিকট হইতে নিকটতমে সগৌরবে বিহার করিতেছে; ব্যাধি দৈন্য অভাব অজ্ঞতা কিছুকেই মানুষের আকাঙ্ক্ষা অপ্রতিহার্য্য মনে করিয়া হাল ছাড়িয়া বসিয়া নাই, কেবলি পরীক্ষার পর পরীক্ষা করিয়া চলিতেছে। যাহাদের সে দুঃসাহস নাই তাহারা আজও মধ্য আফ্রিকার অরণ্যতলে মূঢ়তার স্বকপোলকল্পিত বিভীষিকার কাঁটার বেড়াটুকুর মধ্যে যুগযুগান্তর গুঁড়িমারিয়া বসিয়া আছে।

এই দুঃসাহসের মধ্যে একটা প্রবল অবিবেচনা আছে। আজ যাহারা আকাশযানে উড়িতে উড়িতে আকাশ হইতে পড়িয়া চুরমার হইয়া মরিতেছে তাহাদের মধ্যে সেই দুরন্ত অবিবেচনা কাজ করিতেছে। এমনি করিয়াই একদিন যাহারা সমুদ্র পার হইবার সাধনা করিতে করিতে হাজার হাজার জলে ডুবিয়া মরিয়াছে সেই অবিবেচনাই তাহাদিগকে তাড়া করিয়াছিল। সেই দুর্দ্ধর্ষ অবিবেচনার উত্তেজনাতেই আজও মানুষ তুষারদৈত্যের পাহারা এড়াইয়া কখনো উত্তর মেরু কখনো দক্ষিণ মেরুতে কেবলমাত্র দিগ্বিজয় করিবার জন্য ছুটিয়া চলিয়াছে। এমনি করিয়া যাহারা নিতান্ত লক্ষ্মীছাড়া তাহারাই লক্ষ্মীকে দুর্গম অন্তঃপুর হইতে হরণ করিয়া আনিয়াছে।

এই দুঃসাহসিকের দল নিজের সমাজের মধ্যেও যে লক্ষ্মীছে হইয়া ঠাণ্ডা হইয়া বসিয়া আছে তাহা নহে। যাহা আছে তাহাই যে চূড়া একথা কোনো মতেই তাহাদের মন মানিতে চায় না। বিজ্ঞ মানুষদে নিয়ত ধমকানি খাইয়াও এই অশান্তের দল জীর্ণ বেড়া ভাঙিয়া পুরাত

বেড়া সরাইয়া কত উৎপাত করিতেছে তাহার ঠিকানা নাই। প্রাণের চাঞ্চল্য তাহাদের স্বভাবতই প্রবল বলিয়াই, তাহাদের সাহসের অন্ত নাই বলিয়াই, সেই বিপুল বেগেতেই তাহারা সমস্ত সীমাকে কেবলি ধাক্কা মারিয়া বেড়ায়। ইহা তাহাদের স্বভাব। এমনি করিয়াই আবিষ্কৃত হইয়া পড়ে যেখানে সীমা দেখা যাইতেছিল বস্তুতই সেখানে সীমা নাই। ইহারা দুঃখ পায়, দুঃখ দেয়, মানুষকে অস্থির করিয়া তোলে এবং মরিবার বেলায় ইহারাই মরে। কিন্তু বাঁচিবার পথ ইহারাই বাহির করিয়া দেয়।

আমাদের দেশে সেই জন্ম-লক্ষ্মীছাড়া কি নাই? নিশ্চয়ই আছে। কারণ তাঁহারাই যে প্রাণের স্বাভাবিক সৃষ্টি, প্রাণ যে আপনার গরজেই তাহাদিগকে জন্ম দেয়। কিন্তু পৃথিবীতে যে-কোন শক্তিই মানুষকে সম্পূর্ণ আপনার তাঁবেদার করিতে চায় সে প্রাণের লীলাকেই সব চেয়ে ভয় করে—সেই কারণেই আমাদের সমাজ ঐ সকল প্রাণবহুল দুরন্ত ছেলেকে শিশুকাল হইতে নানাপ্রকার শাসনে এমনই ঠাণ্ডা করিতে চায় যাহাতে তাহাদের ভালমানুষি দেখিলে একেবারে চোখ জুড়াইয়া যায়। মানা, মানা, মানা; শুইতে বসিতে কেবলি তাহাদিগকে মানা মানিয়া চলিতে হইবে। যাহার কোনো কারণ নাই যুক্তি নাই তাহাকে মানাই যাহাদের নিয়ত অভ্যাস, মানিয়া চলা তাহাদের এমনি আশ্চর্য্য দুরন্ত হইয়া উঠে, যে, যেখানে কাহাকেও মানিবার নাই সেখানে তাহারা চলিতেই পারে না। এইপ্রকার হতবুদ্ধি হতোদ্যম মানুষকে আপন তর্জ্জনি সঙ্কেতে ওঠ্ বোস্ করানো সহজ। আমাদের সমাজ সমাজের মানুষ-গুলাকে লইয়া এই প্রকারের একটা প্রকাণ্ড পুতুলবাজির কারখানা খুলিয়াছে! তারে তারে আপাদমস্তক কেমন করিয়া বাঁধিয়াছে, কি

আশ্চর্য্য তাহার কৌশল! ইহাকে বাহবা দিতে হয় বটে। বিধাতাকে এমন সম্পূর্ণরূপে হার মানানো, প্রাণীকে এমন কলের পুতুল করিয়া তোলা জগতে আর কোথায় ঘটিয়াছে!

তবু হাজার হইলেও যাহাদের মধ্যে প্রাণের প্রাচুর্য্য আছে তাহা-দিগকে সকল দিক হইতে চাপিয়া পিষিয়াও তাহাদের তেজ একেবারে নষ্ট করা যায় না। এইজন্য আর কোনো কাজ না পাইয়া সেই উদ্যম সেই তেজ তাহারা সমাজের বেড়ি গড়িবার জন্যই প্রবলবেগে খাটাইতে থাকে। স্বভাবের বিকৃতি না ঘটিলে যাহারা সর্ব্বাগ্রে চলার পথে ছুটিত তাহারাই পথের মধ্যে প্রাচীর তুলিবার জন্য সব চেয়ে উৎসাহের সঙ্গে লাগিয়া থাকে। কাজ করিবার জন্যই তাহাদের জন্ম, কিন্তু কাজের ক্ষেত্র বন্ধ বলিয়া কাজ বন্ধ করিবার কাজেই তাহারা কোমর বাঁধিয়া উঠিয়া পড়িয়া লাগে।

ইহারা কুন্তীসুত কর্ণের মত। পাণ্ডবের দলে কর্ণের যথার্থ স্থান ছিল কিন্তু সেখানে অদৃষ্টক্রমে কোনো অধিকার না পাওয়াতে পাণ্ডব-দিগকে উচ্ছেদ করাই তাঁহার জীবনের ব্রত হইয়া উঠিয়াছিল। আমরা যাঁহাদের কথা বলিতেছি তাঁহারা স্বভাবতই চলিষ্ণু, কিন্তু এদেশে জন্মিয়া সে কথাটা তাঁহারা একেবারেই ভুলিয়া বসিয়াছেন—এই জন্য যাঁহারা ঠিক তাঁহাদের একদলের লোক, তাঁহাদের সঙ্গেই অহরহ হাতাহাতি করিতে পারিলে ইঁহারা আর কিছু চান না।

এই শ্রেণীর লোক আজকাল অনেক দেখা যায়। ইঁহারা তাল ঠুকিয়া বলেন, "স্বাধীনতা-হীনতায় কে বাঁচিতে চায় রে," আক্ষেপ করিয়া বলেন, আমাদের প্রভুদের মানা আছে বলিয়াই আমরা পৌরুষ দেখাইতে পারি না। অথচ সমাজের চোখে ঠুলি দিয়া তাহাকে সরু মোটা হাজার

বাঁধনে বাঁধিয়া মানার প্রকাণ্ড ঘানিতে জুড়িয়া একই চক্রপথে ঘুরাইবার সব চেয়ে বড় ওস্তাদ ইঁহারাই। বলেন, এ ঘানি সনাতন, ইহার পবিত্র স্নিগ্ধ তৈলে প্রকুপিত বায়ু একেবারে শান্ত হইয়া যায়। ইঁহারা প্রচণ্ড তেজের সঙ্গেই দেশের তেজ নিবৃত্তির জন্য লাগিয়াছেন; সমাজের মধ্যে কোথাও কিছু ব্যস্ততার লক্ষণ না দেখা দেয় সেজন্য ইঁহারা ভয়ঙ্কর ব্যস্ত।

কিন্তু পারিয়া উঠিবেন না। অস্থিরতার বিরুদ্ধে যে চাঞ্চল্য ইঁহাদিগকে এমন অস্থির করিয়া তুলিয়াছে সেটা দেশের নাড়ীতে প্রবেশ করিয়াছে তাহার প্রমাণ তাঁহারা নিজেই। সকাল বেলায় জাগিয়া উঠিয়া যদি কেহ কেহ ঘরে আলো আসিতেছে বলিয়া বিরক্ত হইয়া দুড়্‌দাড়্‌ শব্দে ঘরের দরজা জানলাগুলো বন্ধ করিয়া দিতে চায় তবে নিশ্চয় আরো অনেক লোক জাগিবে যাহারা দরজা খুলিয়া দিবার জন্য উৎসুক হইয়া উঠিবে। জাগরণের দিনে দুই দলই জাগে এইটেই আমাদের সকলের চেয়ে আশার কথা।

যাঁহারা দেশকে ঠাণ্ডা করিয়া রাখিয়াছিলেন তাঁহারা অনেকদিন একাধিপত্য করিয়াছেন। তাঁহাদের সেই একেশ্বর রাজত্বের কীর্ত্তিগুলি চারিদিকেই দেখা যাইতেছে; তাহা লইয়া আলোচনা করিতে গেলেই রাগারাগি হইবার সম্ভাবনা আছে। কিন্তু দেশের নবযৌবনকে তাঁহারা আর নির্ব্বাসিত করিয়া রাখিতে পারিবেন না। তাঁহারা চণ্ডীমণ্ডপে বসিয়া থাকুন, আর বাকি সবাই পথে ঘাটে বাহির হইয়া পড়ুক। সেখানে তারুণ্যের জয় হউক্! তাহার পায়ের তলায় জঙ্গল মরিয়া যাক্, জঞ্জাল সরিয়া যাক্, কাঁটা দলিয়া যাক্, পথ খোলসা হৌক, তাহার অবিবেচনার উদ্ধত বেগে অসাধ্যসাধন হইতে থাক্।

চলার পদ্ধতির মধ্যে অবিবেচনার বেগও দরকার, বিবেচনার সংযমও

আবশ্যক; কিন্তু অবিবেচনার বেগও বন্ধ করিব আবার বিবেচনা করিতেও অধিকার দিব না,—মানুষকে বলিব, তুমি শক্তিও চালাইয়ো না, বুদ্ধিও চালাইয়ো না, তুমি কেবলমাত্র ঘানি চালাও, এ বিধান কখনই চিরদিন চলিবে না। যে পথে চলাফেরা বন্ধ, সে পথে ঘাস জন্মায় এবং ঘাসের মধ্যে নানা রঙের ফুলও ফোটে। সে ঘাস সে ফুল সুন্দর একথা কেহই অস্বীকার করিবে না কিন্তু পথের সৌন্দর্য্য ঘাসেও নহে ফুলেও নহে, তাহা বাধাহীন বিচ্ছেদহীন বিস্তারে; তাহা ভ্রমরগুঞ্জনে নহে কিন্তু পথিকদলের অক্লান্ত পদধ্বনিতেই রমণীয়।

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

হালদার-গোষ্ঠী

এই পরিবারটির মধ্যে কোন রকমের গোল বাধিবার কোন সঙ্গত কারণ ছিল না। অবস্থাও সচ্ছল, মানুষগুলিও কেহই মন্দ নহে কিন্তু তবুও গোল বাধিল।

কেননা সঙ্গত কারণেই যদি মানুষের সব কিছু ঘটিত তবে ত লোকালয়টা একটা অঙ্কের খাতার মত হইত, একটু সাবধানে চলিলেই হিসাবে কোথাও কোনো ভুল ঘটিত না; যদি বা ঘটিত সেটাকে রবার দিয়া মুছিয়া সংশোধন করিলেই চলিয়া যাইত।

কিন্তু মানুষের ভাগ্যদেবতার রসবোধ আছে;—গণিত শাস্ত্রে তাঁহার পাণ্ডিত্য আছে কি না জানিনা কিন্তু অনুরাগ নাই; মানবজীবনের যোগবিয়োগের বিশুদ্ধ অঙ্কফলটি উদ্ধার করিতে তিনি মনোযোগ করেন না। এই জন্য তাঁহার ব্যবস্থার মধ্যে একটা পদার্থ তিনি সংযোগ করিয়াছেন সেটা অসঙ্গতি। যাহা হইতে পারিত সেটাকে সে হঠাৎ আসিয়া লণ্ডভণ্ড করিয়া দেয়। ইহাতেই নাট্যলীলা জমিয়া উঠে, সংসারের দুইকূল ছাপাইয়া হাসিকান্নার তুফান চলিতে থাকে।

এ ক্ষেত্রেও তাহাই ঘটিল,—যেখানে পদ্মবন সেখানে মত্তহস্তী আসিয়া উপস্থিত। পঙ্কের সঙ্গে পঙ্কজের একটা বিপরীত রকমের মাখামাখি হইয়া গেল। তা না হইলে এ গল্পটির সৃষ্টি হইতে পারিত না।

যে পরিবারের কথা উপস্থিত করিয়াছি তাহার মধ্যে সব চেয়ে যোগ্য মানুষ যে বনোয়ারিলাল, তাহাতে সন্দেহ নাই। সে নিজেও তাহা বিলক্ষণ জানে, এবং সেইটেতেই তাহাকে অস্থির করিয়া

তুলিয়াছে। যোগ্যড়া এঞ্জিনের ষ্টীমের মত তাহাকে ভিতর হইতে ঠেলে। সামনে যদি সে রাস্তা পায় ত ভালই, যদি না পায় তবে যাহা পায় তাহাকে ধাক্কা মারে।

তাহার বাপ মনোহরলালের ছিল সাবেককেলে বড়মানুষি চাল। যে সমাজ তাঁহার, সেই সমাজের মাথাটিকেই আশ্রয় করিয়া তিনি তাহার শিরোভূষণ হইয়া থাকিবেন এই তাঁহার ইচ্ছা। সুতরাং সমাজের হাত পায়ের সঙ্গে তিনি কোনো সংস্রব রাখেন না। সাধারণ লোকে কাজকর্ম্ম করে, চলে ফেরে; তিনি কাজ না-করিবার ও না-চলিবার বিপুল আয়োজনটির কেন্দ্রস্থলে ধ্রুব হইয়া বিরাজ করেন।

প্রায় দেখা যায় এই প্রকার লোকেরা বিনাচেষ্টায় আপনার কাছে অন্ততঃ দুটি একটি শক্ত এবং খাঁটি লোককে যেন চুম্বকের মত টানিয়া আনেন। তাহার কারণ আর কিছু নয়, পৃথিবীতে একদল লোক জন্মায় সেবা করাই তাহাদের ধর্ম্ম। তাহারা আপন প্রকৃতির চরিতার্থতার জন্যই এমন অক্ষম মানুষকে চায়, যে লোক নিজের ভার ষোলো আনাই তাহাদের উপর ছাড়িয়া দিতে পারে। এই সহজ সেবকেরা নিজের কাজে কোনো সুখ পায় না, কিন্তু আর একজনকে নিশ্চিন্ত করা, তাহাকে সম্পূর্ণ আরামে রাখা, তাহাকে সকল প্রকার সঙ্কট হইতে বাঁচাইয়া চলা, লোকসমাজে তাহার সম্মান বৃদ্ধি করা ইহাতেই তাহাদের পরম উৎসাহ। ইহারা যেন এক প্রকারের পুরুষ মা, তাহাও নিজের ছেলের নহে, পরের ছেলের।

মনোহরলালের যে চাকরটি আছে রামচরণ, তাহার শরীররক্ষা ও শরীরপাতের একমাত্র লক্ষ্য বাবুর দেহরক্ষা করা। যদি সে নিশ্বাস লইলে বাবুর নিশ্বাস লইবার প্রয়োজনটুকু বাঁচিয়া যায় তাহা হইলে সে

অহোরাত্র কামারের হাপরের মত হাঁপাইতে রাজি আছে। বাহিরের লোকে অনেক সময় ভাবে মনোহরলাল বুঝি তাঁহার সেবককে অনাবশ্যক খাটাইয়া অন্যায় পীড়ন করিতেছেন। কেননা, হাত হইতে গুড়গুড়ির নলটা হয় ত মাটিতে পড়িয়াছে, সেটাকে তোলা কঠিন কাজ নহে, অথচ সেজন্য ডাক দিয়া অন্য ঘর হইতে রামচরণকে দৌড় করানো নিতান্ত বিসদৃশ বলিয়াই বোধ হয়; কিন্তু এই সকল ভূরি ভূরি অনাবশ্যক ব্যাপারে নিজেকে অত্যাবশ্যক করিয়া তোলাতেই রামচরণের প্রভূত আনন্দ।

যেমন তাঁহার রামচরণ, তেমনি তাঁহার আর একটি অনুচর নীলকণ্ঠ। বিষয়রক্ষার ভার এই নীলকণ্ঠের উপর। বাবুর প্রসাদ-পরিপুষ্ট রামচরণটি দিব্য সুচিক্কণ কিন্তু নীলকণ্ঠের দেহে তাহার অস্থি-কঙ্কালের উপর কোনো প্রকার আব্রু নাই বলিলেই হয়। বাবুর ঐশ্বর্য্য ভাণ্ডারের দ্বারে সে মূর্ত্তিমান দুর্ভিক্ষের মত পাহারা দেয়। বিষয়টা মনোহরলালের কিন্তু তাহার মমতাটা সম্পূর্ণ নীলকণ্ঠের।

নীলকণ্ঠের সঙ্গে বনোয়ারিলালের খিটিমিটি অনেক দিন হইতে বাধিয়াছে। মনে কর, বাপের কাছে দরবার করিয়া বনোয়ারি বড় বৌয়ের জন্য একটা নূতন গহনা গড়াইবার হুকুম আদায় করিয়াছে। তাহার ইচ্ছা টাকাটা বাহির করিয়া লইয়া নিজের মনোমত করিয়া জিনিষটা ফরমাস করে। কিন্তু সে হইবার জো নাই। খরচপত্রের সমস্ত কাজই নীলকণ্ঠের হাত দিয়াই হওয়া চাই। তাহার ফল হইল এই, গহনা হইল বটে কিন্তু কাহারও মনের মত হইল না। বনোয়ারির নিশ্চয় বিশ্বাস হইল স্যাকরার সঙ্গে নীলকণ্ঠের ভাগবাটোয়ারা চলে। কড়া লোকের শত্রুর অভাব নাই। ঢের লোকের কাছে বনোয়ারি ঐ কথাই

শুনিয়া আসিয়াছে যে নীলকণ্ঠ অন্যকে যে পরিমাণে বঞ্চিত করিতেছে নিজের ঘরে তাহার ততোধিক পরিমাণে সঞ্চিত হইয়া উঠিতেছে।

অথচ দুই পক্ষে এই যে সব বিরোধ জমা হইয়া উঠিয়াছে তাহা সামান্য পাঁচ দশটাকা লইয়া। নীলকণ্ঠের বিষয়বুদ্ধির অভাব নাই—একথা তাহার পক্ষে বুঝা কঠিন নহে যে বনোয়ারির সঙ্গে বনাইয়া চলিতে না পারিলে কোনো না কোনো দিন তাহার বিপদ ঘটিবার সম্ভাবনা। কিন্তু মনিবের ধন সম্বন্ধে নীলকণ্ঠের একটা কৃপণতার বায়ু আছে। সে যেটাকে অন্যায্য মনে করে মনিবের হুকুম পাইলেও কিছুতেই তাহা সে খরচ করিতে পারে না।

এদিকে বনোয়ারির প্রায়ই অন্যায্য খরচের প্রয়োজন ঘটিতেছে। পুরুষের অনেক অন্যায্য ব্যাপারের মূলে যে কারণ থাকে সেই কারণটি এখানেও খুব প্রবলভাবে বর্ত্তমান। বনোয়ারির স্ত্রী কিরণলেখার সৌন্দর্য্যসম্বন্ধে নানা মত থাকিতে পারে, তাহা লইয়া আলোচনা করা নিষ্প্রয়োজন। তাহার মধ্যে যে মতটি বনোয়ারির, বর্ত্তমান প্রসঙ্গে একমাত্র সেইটেই কাজের। বস্তুত স্ত্রীর প্রতি বনোয়ারির মনের যে পরিমাণ টান সেটাকে বাড়ির অন্যান্য মেয়েরা বাড়াবাড়ি বলিয়াই মনে করে। অর্থাৎ তাহারা নিজের স্বামীর কাছ হইতে যতটা আদর চায় অথচ পায় না, ইহা ততটা।

কিরণলেখার বয়স যতই হোক্ চেহারা দেখিলে মনে হয় ছেলে-মানুষটি। বাড়ির বড় বৌয়ের যেমনতর গিন্নিবান্নিধরণের আকৃতি-প্রকৃতি হওয়া উচিত সে তাহার একেবারেই নহে। সবসুদ্ধ জড়াইয়া সে যেন বড় স্বল্প।

বনোয়ারি তাহাকে আদর করিয়া অণু বলিয়া ডাকিত। যখন

তাহাতেও কুলাইত না তখন বলিত পরমাণু। রসায়ন শাস্ত্রে যাঁহাদের বিচক্ষণতা আছে তাঁহারা জানেন বিশ্বঘটনায় অণুপরমাণুগুলির শক্তি বড় কম নয়।

কিরণ কোনোদিন স্বামীর কাছে কিছুর জন্য আবদার করে নাই। তাহার এমন একটি উদাসীন ভাব যেন তাহার বিশেষ কিছুতে প্রয়োজন নাই। বাড়িতে তাহার অনেক ঠাকুরঝি অনেক ননদ; তাহাদিগকে লইয়া সর্ব্বদাই তাহার সমস্ত মন ব্যাপৃত;—নবযৌবনের নবজাগ্রত প্রেমের মধ্যে যে একটা নির্জ্জন তপস্যা আছে তাহাতে তাহার তেমন প্রয়োজনবোধ নাই। এই জন্য বনোয়ারির সঙ্গে ব্যবহারে তাহার বিশেষ একটা আগ্রহের লক্ষণ দেখা যায় না। যাহা সে বনোয়ারির কাছ হইতে পায় তাহা সে শান্তভাবে গ্রহণ করে, অগ্রসর হইয়া কিছু চায় না। তাহার ফল হইয়াছে এই যে, স্ত্রীটি কেমন করিয়া খুসি হইবে সেই কথা বনোয়ারিকে নিজে ভাবিয়া বাহির করিতে হয়। স্ত্রী যেখানে নিজের মুখে ফরমাস করে সেখানে সেটাকে তর্ক করিয়া কিছুনা-কিছু খর্ব্ব করা সম্ভব হয় কিন্তু নিজের সঙ্গে ত দরকষাকষি চলে না। এমন স্থলে অযাচিত দানে যাচিত দানের চেয়ে খরচ বেশি পড়িয়া যায়।

তাহার পরে স্বামীর সোহাগের উপহার পাইয়া কিরণ যে কতখানি খুসি হইল তাহা ভাল করিয়া বুঝিবার জো নাই। এ সম্বন্ধে প্রশ্ন করিলে সে বলে, বেশ, ভাল;—কিন্তু বনোয়ারির মনের খট্‌কা কিছুতেই মেটে না; ক্ষণে ক্ষণে তাহার মনে হয়, হয় ত পছন্দ হয় নাই। কিরণ স্বামীকে ঈষৎ ভর্ৎসনা করিয়া বলে—"তোমার ঐ স্বভাব! কেন এমন খুঁৎখুঁৎ করচ? কেন, এ ত বেশ হয়েছে!"

বনোয়ারি পাঠ্যপুস্তকে পড়িয়াছে সন্তোষগুণটি মানুষের মহৎ গুণ। কিন্তু স্ত্রীর স্বভাবে এই মহৎ গুণটি তাহাকে পীড়া দেয়। তাহার স্ত্রী ত তাহাকে কেবলমাত্র সন্তুষ্ট করে নাই, অভিভূত করিয়াছে, সেও স্ত্রীকে অভিভূত করিতে চায়। তাহার স্ত্রীকে ত বিশেষ কোনো চেষ্টা করিতে হয় না—যৌবনের লাবণ্য আপনি উছলিয়া পড়ে, সেবার নৈপুণ্য আপনি প্রকাশ হইতে থাকে; কিন্তু পুরুষের ত এমন সহজ সুযোগ নয়; পৌরুষের পরিচয় দিতে হইলে তাহাকে কিছু একটা করিয়া তুলিতে হয়। তাহার যে বিশেষ একটা শক্তি আছে ইহা প্রমাণ করিতে না পারিলে পুরুষের ভালবাসা ম্লান হইয়া থাকে। আর কিছু নাও যদি থাকে ধন যে একটা শক্তির নিদর্শন—ময়ূরের পুচ্ছের মত স্ত্রীর কাছে সেই ধনের সমস্ত বর্ণচ্ছটা বিস্তার করিতে পারিলে তাহাতে মন সান্ত্বনা পায়। নীলকণ্ঠ বনোয়ারির প্রেমনাট্যলীলার এই আয়োজনটাতে বারম্বার ব্যাঘাত ঘটাইয়াছে। বনোয়ারি বাড়ির বড়বাবু তবু কিছুতে তাহার কর্ত্তৃত্ব নাই, কর্ত্তার প্রশ্রয় পাইয়া ভৃত্য হইয়া নীলকণ্ঠ তাহার উপরে আধিপত্য করে ইহাতে বনোয়ারির যে অসুবিধা ও অপমান সেটা আর কিছুর জন্য তত নহে, যতটা পঞ্চশরের তূণে মনের মত শর যোগাইবার অক্ষমতাবশত।

একদিন এই ধনসম্পদে তাহারই অবাধ অধিকার ত জন্মিবে। কিন্তু যৌবন কি চিরদিন থাকিবে? বসন্তের রঙীন পেয়ালায় তখন এ সুধারস এমন করিয়া আপনা আপনি ভরিয়া ভরিয়া উঠিবে না; টাকা তখন বিষয়ীর টাকা হইয়া খুব শক্ত হইয়া জমিবে, গিরিশিখরের তুষার-সঙ্ঘাতের মত;—তাহাতে কথায় কথায় অসাবধানের অপব্যয়ের ঢেউ

খেলিতে থাকিবে না। টাকার দরকার ত এখনি, যখন আনন্দে তাহা নয়-ছয় করিবার শক্তি নষ্ট হয় নাই।

বনোয়ারির প্রধান সখ তিনটি,—কুস্তি, শিকার এবং সংস্কৃত চর্চ্চা। তাহার খাতার মধ্যে সংস্কৃত উদ্ভট কবিতা একেবারে বোঝাই করা। বাদলার দিনে, জ্যোৎস্নারাত্রে, দক্ষিণা হাওয়ায় সেগুলি বড় কাজে লাগে। সুবিধা এই, নীলকণ্ঠ এই কবিতাগুলির অলঙ্কারবাহুল্যকে খর্ব্ব করিতে পারে না। অতিশয়োক্তি যতই অতিশয় হউক্ কোনো খাতাঞ্চি-সেরেস্তায় তাহার জন্য জবাবদিহি নাই। কিরণের কানের সোনায় কার্পণ্য ঘটে কিন্তু তাহার কানের কাছে যে মন্দাক্রান্তা গুঞ্জরিত হয় তাহার ছন্দে একটি মাত্রাও কম পড়ে না এবং তাহার ভাবে কোনো মাত্রা থাকেনা বলিলেই হয়।

লম্বাচওড়া পালোয়ানের চেহারা বনোয়ারির। যখন সে রাগ করে তখন তাহার ভয়ে লোকে অস্থির। কিন্তু এই জোয়ান লোকটির মনের ভিতরটা ভারি কোমল। তাহার ছোট ভাই বংশীলাল যখন ছোট ছিল তখন সে তাহাকে মাতৃস্নেহে লালন করিয়াছে। তাহার হৃদয়ে যেন একটি লালন করিবার ক্ষুধা আছে।

তাহার স্ত্রীকে সে যে ভালবাসে তাহার সঙ্গে এই জিনিষটিও জড়িত,—এই লালন করিবার ইচ্ছা। কিরণলেখা তরুচ্ছায়ার মধ্যে পথহারা রশ্মিরেখাটুকুর মতই ছোট—ছোট বলিয়াই সে তাহার স্বামীর মনে ভারী একটা দরদ জাগাইয়া রাখিয়াছে; এই স্ত্রীকে বসনেভূষণে নানারকম করিয়া সাজাইয়া দেখিতে তাহার বড় আগ্রহ। তাহা ভোগ করিবার আনন্দ নহে, তাহা রচনা করিবার আনন্দ; তাহা এককে বহু

করিবার আনন্দ, কিরণলেখাকে নানা বর্ণে নানা আবরণে নানা রকম করিয়া দেখিবার আনন্দ।

কিন্তু কেবলমাত্র সংস্কৃত শ্লোক আবৃত্তি করিয়া বনোয়ারির এই সখ কোনোমতেই মিটিতেছে না। তাহার নিজের মধ্যে একটি পুরুষোচিত প্রভুশক্তি আছে তাহাও প্রকাশ করিতে পারিল না, আর প্রেমের সামগ্রীকে নানা উপকরণে ঐশ্বর্য্যবান করিয়া তুলিবার যে ইচ্ছা তাহাও তার পূর্ণ হইতেছে না।

এমনি করিয়াই এই ধনীর সন্তান তাহার মানমর্য্যাদা, তাহার সুন্দরী স্ত্রী, তাহার ভরা যৌবন,—সাধারণত লোকে যাহা কামনা করে তাহা সমস্ত লইয়াও সংসারে একদিন একটা উৎপাতের মত হইয়া উঠিল।

সুখদা মধুকৈবর্ত্তের স্ত্রী, মনোহরলালের প্রজা। সে একদিন অন্তঃপুরে আসিয়া কিরণলেখার পা জড়াইয়া ধরিয়া কান্না জুড়িয়া দিল। ব্যাপারটা এই, বছর কয়েক পূর্ব্বে নদীতে বেড়জাল ফেলিবার আয়োজন উপলক্ষে অন্যান্য বারের মত জেলেরা মিলিয়া একযোগে খৎ লিখিয়া মনোহরলালের কাছারিতে হাজার টাকা ধার লইয়াছিল। ভাল মত মাছ পড়িলে সুদে আসলে টাকা শোধ করিয়া দিবার কোনো অসুবিধা ঘটে না; এইজন্য উচ্চ সুদের হারে টাকা লইতে ইহারা চিন্তামাত্র করে না। সে বৎসর তেমন মাছ পড়িল না, এবং ঘটনাক্রমে উপরি উপরি তিন বৎসর নদীর বাঁকে মাছ এত কম আসিল যে, জেলেদের খরচ পোষাইল না, অধিকন্তু তাহারা ঋণের জালে বিপরীত রকম জড়াইয়া পড়িল। যে সকল জেলে ভিন্ন এলেকার তাহাদের আর দেখা পাওয়া যায় না; কিন্তু মধুকৈবর্ত্ত

ভিটাবাড়ির প্রজা, তাহার পলাইবার জো নাই বলিয়া সমস্ত দেনার দায় তাহার উপরেই চাপিয়াছে। সর্ব্বনাশ হইতে রক্ষা পাইবার অনুরোধ লইয়া সে কিরণের শরণাপন্ন হইয়াছে। কিরণের শাশুড়ির কাছে গিয়া কোনো ফল নাই তাহা সকলেই জানে; কেননা, নীলকণ্ঠের ব্যবস্থায় কেহ যে আঁচড়টুকু কাটিতে পারে একথা তিনি কল্পনা করিতেও পারেন না। নীলকণ্ঠের প্রতি বনোয়ারির খুব একটা আক্রোশ আছে জানিয়াই মধুকৈবর্ত্ত তাহার স্ত্রীকে কিরণের কাছে পাঠাইয়াছে।

বনোয়ারি যতই রাগ এবং যতই আস্ফালন করুক্, কিরণ নিশ্চয় জানে যে নীলকণ্ঠের কাজের উপর হস্তক্ষেপ করিবার কোনো অধিকার তাহার নাই। এই জন্য কিরণ সুখদাকে বারবার করিয়া বুঝাইবার চেষ্টা করিয়া বলিল, "বাছা, কি করব বল! জানই ত এতে আমাদের কোনো হাত নেই। কর্ত্তা আছেন, মধুকে বল তাঁকে গিয়ে ধরুক্।"

সে চেষ্টা ত পূর্ব্বেই হইয়াছে। মনোহরলালের কাছে কোনো বিষয়ে নালিশ উঠিলেই তিনি তাহার বিচারের ভার নীলকণ্ঠের পরেই অর্পণ করেন, কখনই তাহার অন্যথা হয় না। ইহাতে বিচারপ্রার্থীর বিপদ আরো বাড়িয়া উঠে। দ্বিতীয়বার কেহ যদি তাঁহার কাছে আপিল করিতে চায় তাহা হইলে কর্ত্তা রাগিয়া আগুন হইয়া উঠেন,—বিষয়-কর্ম্মের বিরক্তিই যদি তাঁহাকে পোহাইতে হইল তবে বিষয় ভোগ করিয়া তাঁহার সুখ কি!

সুখদা যখন কিরণের কাছে কান্নাকাটি করিতেছে তখন পাশের ঘরে বসিয়া বনোয়ারি তাহার বন্দুকের চোঙে তেল মাখাইতেছিল। বনোয়ারি সব কথাই শুনিল। কিরণ করুণকণ্ঠে যে বারবার করিয়া

বলিতেছিল যে তাহারা ইহার কোনো প্রতিকার করিতে অক্ষম সেটা বনোয়ারির বুকে শেলের মত বিঁধিল।

সেদিন মাঘী পূর্ণিমা ফাল্গুনের আরম্ভে আসিয়া পড়িয়াছে। দিনের বেলাকার গুমট ভাঙিয়া সন্ধ্যাবেলায় হঠাৎ একটা পাগ্‌লা হাওয়া মাতিয়া উঠিল। কোকিল ত ডাকিয়া ডাকিয়া অস্থির;—বারবার এক সুরের আঘাতে সে কোথাকার কোন্ ঔদাসীন্যকে বিচলিত করিবার চেষ্টা করিতেছে! আর আকাশে ফুলগন্ধের মেলা বসিয়াছে— যেন ঠেলাঠেলি ভিড়। জানলার ঠিক পাশেই অন্তঃপুরের বাগান হইতে মুচুকুন্দফুলের গন্ধ বসন্তের আকাশে নিবিড় নেশা ধরাইয়া দিল। কিরণ সেদিন লট্‌কানের রংকরা একখানি সাড়ি এবং খোঁপায় বেল ফুলের মালা পরিয়াছে। এই দম্পতির চিরনিয়ম অনুসারে সেদিন বনোয়ারির জন্যও ফাল্গুনঋতুযাপনের উপযোগী একখানি লট্‌কানে রঙীন চাদর ও বেলফুলের গড়ে' মালা প্রস্তুত। রাত্রির প্রথম প্রহর কাটিয়া গেল তবু বনোয়ারির দেখা নাই। যৌবনের ভরা পেয়ালাটি আজ তাহার কাছে কিছুতেই রুচিল না। প্রেমের বৈকুণ্ঠলোকে এত বড় কুণ্ঠা লইয়া সে প্রবেশ করিবে কেমন করিয়া? মধুকৈবর্ত্তের দুঃখ দূর করিবার ক্ষমতা তাহার নাই, সে ক্ষমতা আছে নীলকণ্ঠের! এমন কাপুরুষের কণ্ঠে পরাইবার জন্য মালা কে গাঁথিয়াছে?

প্রথমেই সে তাহার বাহিরের ঘরে নীলকণ্ঠকে ডাকাইয়া আনিল এবং দেনার দায়ে মধুকৈবর্ত্তকে নষ্ট করিতে নিষেধ করিল। নীলকণ্ঠ কহিল মধুকে যদি প্রশ্রয় দেওয়া হয় তাহা হইলে এই তামাদির মুখে বিস্তর টাকা বাকি পড়িবে; সকলেই ওজর করিতে আরম্ভ করিবে। বনোয়ারি তর্কে যখন পারিল না তখন যাহা মুখে আসিল গাল দিতে

লাগিল। বলিল, ছোটলোক,—নীলকণ্ঠ কহিল, ছোটলোক না হইলে বড় লোকের শরণাপন্ন হইব কেন। বলিল, চোর,—নীলকণ্ঠ বলিল, সে ত বটেই, ভগবান যাহাকে নিজের কিছুই দেন নাই, পরের ধনেই ত সে প্রাণ বাঁচায়। সকল গালিই সে মাথায় করিয়া লইল—শেষকালে বলিল, উকিল-বাবু বসিয়া আছেন, তাঁহার সঙ্গে কাজের কথাটা সারিয়া লই। যদি দরকার বোধ করেন ত আবার আসিব।

বনোয়ারি ছোট ভাই বংশীকে নিজের দলে টানিয়া তখনি বাপের কাছে যাওয়া স্থির করিল। সে জানিত একলা গেলে কোনো ফল হইবে না—কেননা এই নীলকণ্ঠকে লইয়াই তাহার বাপের সঙ্গে পূর্ব্বেই তাহার খিটিমিটি হইয়াছে। বাপ তাহার উপর বিরক্ত হইয়াই আছেন। একদিন ছিল যখন সকলেই মনে করিত মনোহরলাল তাঁহার বড় ছেলেকেই সব চেয়ে ভালবাসেন। কিন্তু এখন মনে হয় বংশীর উপরেই তাঁহার পক্ষপাত। এই জন্যই বনোয়ারি বংশীকেও তাহার নালিশের পক্ষভুক্ত করিতে চাহিল।

বংশী, যাহাকে বলে, অত্যন্ত ভাল ছেলে। এই পরিবারের মধ্যে সেই কেবল দুটো একজামিন পাস করিয়াছে। এবার সে আইনের পরীক্ষা দিবার জন্য প্রস্তুত হইতেছে। দিন রাত জাগিয়া পড়া করিয়া করিয়া তাহার অন্তরের দিকে কিছু জমা হইতেছে কি না অন্তর্যামী জানেন কিন্তু শরীরের দিকে খরচ ছাড়া আর কিছুই নাই।

এই ফাল্গুনের সন্ধ্যায় তাহার ঘরে জানলা বন্ধ। ঋতু পরিবর্ত্তনের সময়টাকে তাহার ভারি ভয়। হাওয়ার প্রতি তাহার শ্রদ্ধামাত্র নাই। টেবিলের উপর একটা কেরোসিনের ল্যাম্প জ্বলিতেছে। কতক

বই মেজের উপরে চৌকির পাশে রাশীকৃত, কতক টেবিলের উপরে;—দেয়ালে কুলুঙ্গিতে কতকগুলি ঔষধের শিশি।

বনোয়ারির প্রস্তাবে সে কোনোমতেই সম্মত হইল না। বনোয়ারি রাগ করিয়া গর্জ্জিয়া উঠিল, "তুই নীলকণ্ঠকে ভয় করিস্!" বংশী তাহার কোনো উত্তর না দিয়া চুপ করিয়া রহিল। বস্তুতই নীলকণ্ঠকে অনুকূল রাখিবার জন্য তাহার সর্ব্বদাই চেষ্টা। সে প্রায় সমস্ত বৎসর কলিকাতার বাসাতেই কাটায়—সেখানে বরাদ্দ টাকার চেয়ে তাহার বেশি দরকার হইয়াই পড়ে। এই সূত্রে নীলকণ্ঠকে প্রসন্ন রাখাটা তাহার অভ্যস্ত।

বংশীকে ভীরু, কাপুরুষ, নীলকণ্ঠের চরণ-চারণ-চক্রবর্ত্তী বলিয়া খুব এক চোট গালি দিয়া বনোয়ারি একলাই বাপের কাছে গিয়া উপস্থিত। মনোহরলাল তাঁহাদের বাগানে দীঘির ঘাটে তাঁহার নধর শরীরটি উদ্‌ঘাটন করিয়া আরামে হাওয়া খাইতেছেন। পারিষদগণ কাছে বসিয়া কলিকাতার বারিষ্টারের জেরায় জেলাকোর্টে অপর পল্লীর জমিদার অখিল মজুমদার যে কিরূপ নাকাল হইয়াছিল তাহারই কাহিনী কর্ত্তাবাবুর শ্রুতিমধুর করিয়া রচনা করিতেছিল। সেদিন বসন্তসন্ধ্যার সুগন্ধ বায়ুসহযোগে সেই বৃত্তান্তটি তাঁহার কাছে অত্যন্ত রমণীয় হইয়া উঠিয়াছিল।

হঠাৎ বনোয়ারি তাহার মাঝখানে পড়িয়া রসভঙ্গ করিয়া দিল। ভূমিকা করিয়া নিজের বক্তব্য কথাটা ধীরে ধীরে পাড়িবার মত অবস্থা তাহার ছিল না। সে একেবারে গলা চড়াইয়া সুরু করিয়া দিল নীলকণ্ঠের দ্বারা তাহাদের ক্ষতি হইতেছে। সে চোর, সে মনিবের টাকা ভাঙিয়া নিজের পেট ভরিতেছে। কথাটার কোনো প্রমাণ নাই

এবং তাহা সত্যও নহে। নীলকণ্ঠের দ্বারা বিষয়ের উন্নতি হইয়াছে, এবং সে চুরিও করে না। বনোয়ারি মনে করিয়াছিল নীলকণ্ঠের সৎস্বভাবের প্রতি অটল বিশ্বাস আছে বলিয়াই কর্ত্তা সকল বিষয়েই তাহার পরে এমন চোখ বুজিয়া নির্ভর করেন। এটা তাহার ভ্রম। মনোহরলালের মনে নিশ্চয় ধারণা যে নীলকণ্ঠ সুযোগ পাইলে চুরি করিয়া থাকে। কিন্তু সে জন্য তাহার প্রতি তাঁহার কোন অশ্রদ্ধা নাই। কারণ আবহমানকাল এমনি ভাবেই সংসার চলিয়া আসিতেছে। অনুচরগণের চুরির উচ্ছিষ্টেই ত চিরকাল বড়-ঘর পালিত। চুরি করিবার চাতুরী যাহার নাই মনিবের বিষয় রক্ষা করিবার বুদ্ধিই বা তাহার জোগাইবে কোথা হইতে? ধর্ম্মপুত্র যুধিষ্ঠিরকে দিয়া ত জমিদারীর কাজ চলে না। মনোহর অত্যন্ত বিরক্ত হইয়া উঠিয়া কহিলেন, আচ্ছা, আচ্ছা, নীলকণ্ঠ কি করে, না করে সে কথা তোমাকে ভাবিতে হইবে না। সেই সঙ্গে ইহাও বলিলেন, দেখ দেখি বংশীর ত কোনো বালাই নাই। সে কেমন পড়াশুনা করিতেছে, ঐ ছেলেটা তবু একটু মানুষের মত।

ইহার পরে অখিল মজুমদারের দুর্গতিকাহিনীতে আর রস জমিল না। সুতরাং মনোহরলালের পক্ষে সেদিন বসন্তের বাতাস বৃথা বহিল এবং দীঘির কালো জলের উপর চাঁদের আলোর ঝক্‌ঝক্ করিয়া উঠিবার কোনো উপযোগিতা রহিল না। সেদিন সন্ধ্যাটা কেবল বৃথা হয় নাই বংশী এবং নীলকণ্ঠের কাছে। জানলা বন্ধ করিয়া বংশী অনেক রাত পর্য্যন্ত পড়িল এবং উকিলের সঙ্গে পরামর্শ করিয়া নীলকণ্ঠ অর্দ্ধেক রাত কাটাইয়া দিল।

কিরণ ঘরের প্রদীপ নিবাইয়া দিয়া জানলার কাছে বসিয়া। কাজকর্ম্ম আজ সে সকাল সকাল সারিয়া লইয়াছে। রাত্রের আহার বাকি কিন্তু এখনো বনোয়ারি খায় নাই তাই সে অপেক্ষা করিতেছে। মধুকৈবর্ত্তের কথা তাহার মনেও নাই। বনোয়ারি যে মধুর দুঃখের কোনো প্রতিকার করিতে পারে না এ সম্বন্ধে কিরণের মনে ক্ষোভের লেশমাত্র ছিল না। তাহার স্বামীর কাছ হইতে কোনো দিন সে কোনো বিশেষ ক্ষমতার পরিচয় পাইবার জন্য উৎসুক নহে। পরিবারের গৌরবেই তাহার স্বামীর গৌরব। তাহার স্বামী তাহার শ্বশুরের বড় ছেলে, ইহার চেয়ে তাহাকে যে আরো বড় হইতে হইবে এমন কথা কোনো দিন তাহার মনেও হয় নাই। ইঁহারা যে গোঁসাইগঞ্জের সুবিখ্যাত হালদার বংশ!

বনোয়ারি অনেক রাত্রি পর্য্যন্ত বাহিরের বারাণ্ডায় পায়চারি সমাধা করিয়া ঘরে আসিল। সে ভুলিয়া গিয়াছে যে তাহার খাওয়া হয় নাই। কিরণ যে তাহার অপেক্ষায় না খাইয়া বসিয়া আছে এই ঘটনাটা সেদিন যেন তাহাকে বিশেষ করিয়া আঘাত করিল। কিরণের এই কষ্টস্বীকারের সঙ্গে তাহার নিজের অকর্ম্মণ্যতা যেন খাপ খাইল না। অন্নের গ্রাস তাহার গলায় বাধিয়া যাইবার জো হইল। বনোয়ারি অত্যন্ত উত্তেজনার সহিত স্ত্রীকে বলিল, যেমন করিয়া পারি মধু কৈবর্ত্তকে আমি রক্ষা করিব!—কিরণ তাহার এই অনাবশ্যক উগ্রতায় বিস্মিত হইয়া কহিল, শোন একবার! তুমি তাহাকে বাঁচাইবে কেমন করিয়া?

মধুর দেনা বনোয়ারি নিজে শোধ করিয়া দিবে এই তাহার পণ, কিন্তু বনোয়ারির হাতে কোন দিন ত টাকা জমে না। স্থির করিল

তাহার তিনটে ভাল বন্দুকের মধ্যে একটা বন্দুক এবং একটা দামী হীরার আংটি বিক্রয় করিয়া সে অর্থ সংগ্রহ করিবে। কিন্তু গ্রামে এসব জিনিষের উপযুক্ত মূল্য জুটিবে না এবং বিক্রয়ের চেষ্টা করিলে চারিদিকে লোকে কানাকানি করিবে। এই জন্য কোনো একটা ছুতা করিয়া বনোয়ারি কলিকাতায় চলিয়া গেল। যাইবার সময় মধুকে ডাকিয়া আশ্বাস দিয়া গেল তাহার কোনো ভয় নাই।

এদিকে বনোয়ারির শরণাপন্ন হইয়াছে বুঝিয়া নীলকণ্ঠ মধুর উপরে রাগিয়া আগুন হইয়া উঠিয়াছে। পেয়াদার উৎপীড়নে কৈবর্ত্তপাড়ার আর মানসম্ভ্রম থাকে না।

কলিকাতা হইতে বনোয়ারি যেদিন ফিরিয়া আসিল সেই দিনই মধুর ছেলে স্বরূপ হাঁপাইতে হাঁপাইতে ছুটিয়া আসিয়া একেবারে বনোয়ারির পা জড়াইয়া ধরিয়া হাউ হাউ করিয়া কান্না জুড়িয়া দিল। "কি রে কি, ব্যাপারখানা কি!" স্বরূপ বলিল, তাহার বাপকে নীলকণ্ঠ কাল রাত্রি হইতে কাছারিতে বন্ধ করিয়া রাখিয়াছে। বনোয়ারির সর্ব্বশরীর রাগে কাঁপিতে লাগিল। কহিল, এখনি গিয়া থানায় খবর দিয়া আয় গে।

কি সর্ব্বনাশ! থানায় খবর! নীলকণ্ঠের বিরুদ্ধে! তাহার পা উঠিতে চায় না। শেষকালে বনোয়ারির তাড়নায় থানায় গিয়া সে খবর দিল। পুলিস হঠাৎ কাছারিতে আসিয়া বন্ধনদশা হইতে মধুকে খালাস করিল এবং নীলকণ্ঠ ও কাছারির কয়েকজন পেয়াদাকে আসামী করিয়া ম্যাজিষ্ট্রেটের কাছে চালান করিয়া দিল।

মনোহর বিষম ব্যতিব্যস্ত হইয়া পড়িলেন। তাঁহার মকদ্দমার মন্ত্রীরা ঘুষের উপলক্ষ্য করিয়া পুলিসের সঙ্গে ভাগ করিয়া টাকা লুটিতে

লাগিল। কলিকাতা হইতে এক বারিষ্টার আসিল; সে একেবারে কাঁচা, নূতন পাসকরা। সুবিধা এই, যত ফি তাহার নামে খাতায় খরচ পড়ে তত ফি তাহার পকেটে উঠে না। ওদিকে মধুকৈবর্তের পক্ষে জেলা-আদালতের একজন মাতব্বর উকিল নিযুক্ত হইল। কে যে তাহার খরচ জোগাইতেছে বোঝা গেল না। নীলকণ্ঠের ছয়মাস মেয়াদ হইল। হাইকোর্টের আপিলেও তাহাই বহাল রহিল।

ঘড়ি এবং বন্দুকটা যে উপযুক্ত মূল্যে বিক্রয় হইয়াছে তাহা ব্যর্থ হইল না।—আপাতত মধু বাঁচিয়া গেল এবং নীলকণ্ঠের জেল হইল। কিন্তু এই ঘটনার পরে মধু তাহার ভিটায় টিঁকিবে কি করিয়া? বনোয়ারি তাহাকে আশ্বাস দিয়া কহিল, তুই থাক্ তোর কোনো ভয় নাই। কিসের জোরে যে আশ্বাস দিল তাহা সেই জানে—বোধ করি নিছক্ নিজের পৌরুষের স্পর্দ্ধায়।

বনোয়ারি যে এই ব্যাপারের মূলে আছে তাহা সে লুকাইয়া রাখিতে বিশেষ চেষ্টা করে নাই। কথাটা প্রকাশ হইল; এমন কি, কর্ত্তার কানেও গেল। তিনি চাকরকে দিয়া বলিয়া পাঠাইলেন, বনোয়ারি যেন কদাচ আমার সম্মুখে না আসে। বনোয়ারি পিতার আদেশ অমান্য করিল না।

কিরণ তাহার স্বামীর ব্যবহার দেখিয়া অবাক্। একি কাণ্ড! বাড়ির বড়বাবু—বাপের সঙ্গে কথাবার্ত্তা বন্ধ! তার উপরে নিজেদের আমলাকে জেলে পাঠাইয়া বিশ্বের লোকের কাছে নিজের পরিবারের মাথা হেঁট করিয়া দেওয়া! তাও এই এক সামান্য মধুকৈবর্ত্তকে লইয়া!

অদ্ভুত বটে। এ বংশে কতকাল ধরিয়া কত বড়বাবু জন্মিয়াছে

এবং কোনো দিন নীলকণ্ঠেরও অভাব নাই। নীলকণ্ঠেরা বিষয়-ব্যবস্থার সমস্ত দায় নিজেরা লইয়াছে আর বড়বাবুরা সম্পূর্ণ নিশ্চেষ্ট-ভাবে বংশগৌরব রক্ষা করিয়াছে। এমন বিপরীত ব্যাপার ত কোনো দিন ঘটে নাই।

আজ এই পরিবারের বড়বাবুর পদের অবনতি ঘটাতে বড় বৌয়ের সম্মানে আঘাত লাগিল। ইহাতে এতদিন পরে আজ স্বামীর প্রতি কিরণের যথার্থ অশ্রদ্ধার কারণ ঘটিল। এতদিন পরে তাহার বসন্তকালের লটকানে রংয়ের সাড়ি এবং খোঁপার বেলফুলের মালা লজ্জায় ম্লান হইয়া গেল।

কিরণের বয়স হইয়াছে অথচ সন্তান হয় নাই। এই নীলকণ্ঠই একদিন কর্ত্তার মত করাইয়া পাত্রী দেখিয়া বনোয়ারির আর একটি বিবাহ প্রায় পাকাপাকি স্থির করিয়াছিল। বনোয়ারি হালদার-বংশের বড় ছেলে, সকল কথার আগে একথা ত মনে রাখিতে হইবে। সে অপুত্রক থাকিবে ইহা ত হইতেই পারে না। এই ব্যাপারে কিরণের বুক দুরদুর করিয়া কাঁপিয়া উঠিয়াছিল। কিন্তু ইহা সে মনে মনে না স্বীকার করিয়া থাকিতে পারে নাই যে, কথাটা সঙ্গত। তখনো সে নীলকণ্ঠের উপরে কিছুমাত্র রাগ করে নাই, সে নিজের ভাগ্যকেই দোষ দিয়াছে। তাহার স্বামী যদি নীলকণ্ঠকে রাগিয়া মারিতে না যাইত এবং বিবাহসম্বন্ধ ভাঙিয়া দিয়া পিতামাতার সঙ্গে রাগারাগি না করিত তবে কিরণ সেটাকে অন্যায় মনে করিত না। এমন কি, বনোয়ারি যে তাহার বংশের কথা ভাবিল না ইহাতে অতি গোপনে কিরণের মনে বনোয়ারির পৌরুষের প্রতি একটু অশ্রদ্ধাই হইয়াছিল। বড়ঘরের দাবী কি সামান্য দাবী! তাহার যে

নিষ্ঠুর হইবার অধিকার আছে। তাহার কাছে কোনো তরুণী স্ত্রীর কিম্বা কোনো দুঃখী কৈবর্ত্তের সুখদুঃখের কতটুকুই বা মূল্য!

সাধারণত যাহা ঘটিয়া থাকে এক-একবার তাহা না ঘটিলে কেহই তাহা ক্ষমা করিতে পারে না একথা বনোয়ারি কিছুতেই বুঝিতে পারিল না। সম্পূর্ণরূপে এ বাড়ির বড়বাবু হওয়াই তাহার উচিত ছিল—অন্য কোনো প্রকারের উচিত অনুচিত চিন্তা করিয়া এখানকার ধারাবাহিকতা নষ্ট করা যে তাহার অকর্ত্তব্য তাহা সে ছাড়া সকলেরই কাছে অত্যন্ত সুস্পষ্ট।

এ লইয়া কিরণ তাহার দেবরের কাছে কত দুঃখই করিয়াছে। বংশী বুদ্ধিমান; তাহার খাওয়া হজম হয় না এবং একটু হাওয়া লাগিলেই সে হাঁচিয়া কাশিয়া অস্থির হইয়া উঠে, কিন্তু সে স্থির ধীর বিচক্ষণ। সে তাহার আইনের বইয়ের যে অধ্যায়টি পড়িতেছিল সেইটেকে টেবিলের উপর খোলা অবস্থায় উপুড় করিয়া রাখিয়া কিরণকে বলিল, এ পাগলামি ছাড়া আর কিছুই নহে। কিরণ অত্যন্ত উদ্বেগের সহিত মাথা নাড়িয়া কহিল, জান ত ঠাকুরপো, তোমার দাদা যখন ভাল আছেন তখন বেশ আছেন কিন্তু একবার যদি ক্ষ্যাপেন তবে তাঁহাকে কেহ সামলাইতে পারে না। আমি কি করি বল ত?

পরিবারের সকল প্রকৃতিস্থ লোকের সঙ্গেই যখন কিরণের মতের সম্পূর্ণ মিল হইল তখন সেইটেই বনোয়ারির বুকে সকলের চেয়ে বাজিল। এই একটুখানি স্ত্রীলোক, অনতিস্ফুট চাঁপা ফুলটির মত পেলব, ইহার হৃদয়টিকে আপন বেদনার কাছে টানিয়া আনিতে পুরুষের সমস্ত শক্তি পরাস্ত হইল। আজকের দিনে কিরণ যদি বনোয়ারির

সহিত সম্পূর্ণ মিলিতে পারিত তবে তাহার হৃদয়ক্ষত দেখিতে দেখিতে এমন করিয়া বাড়িয়া উঠিত না।

মধুকে রক্ষা করিতে হইবে এই অতি সহজ কর্ত্তব্যের কথাটা, চারি দিক হইতে তাড়নার চোটে, বনোয়ারির পক্ষে সত্য সত্যই একট ক্ষ্যাপামির ব্যাপার হইয়া উঠিল। ইহার তুলনায় অন্য সমস্ত কথাই তাহার কাছে তুচ্ছ হইয়া গেল। এদিকে জেল হইতে নীলকণ্ঠ এমন সুস্থভাবে ফিরিয়া আসিল যেন সে জামাইষষ্ঠীর নিমন্ত্রণ রক্ষা করিতে গিয়াছিল। আবার সে যথারীতি অম্লানবদনে আপনার কাজে লাগিয়া গেল।

মধুকে ভিটাছাড়া করিতে না পারিলে প্রজাদের কাছে নীলকণ্ঠের মান রক্ষা হয় না। মানের জন্য সে বেশি কিছু ভাবে না, কিন্তু প্রজারা তাহাকে না মানিলে তাহার কাজ চলিবে না এই জন্যই তাহাকে সাবধান হইতে হয়। তাই মধুকে তৃণের মত উৎপাটিত করিবার জন্য তাহার নিড়ানিতে সান দেওয়া সুরু হইল।

এবার বনোয়ারি আর গোপনে রহিল না। এবার সে নীলকণ্ঠকে স্পষ্টই জানাইয়া দিল যে, যেমন করিয়া হউক্ মধুকে উচ্ছেদ হইতে সে দিবে না। প্রথমত মধুর দেনা সে নিজে হইতে সমস্ত শোধ করিয়া দিল—তাহার পরে আর কোনো উপায় না দেখিয়া সে নিজে গিয়া ম্যাজিষ্ট্রেটকে জানাইয়া আসিল যে নীলকণ্ঠ অন্যায় করিয়া মধুকে বিপদে ফেলিবার উদ্যোগ করিতেছে।

হিতৈষীরা বনোয়ারিকে সকলেই বুঝাইল যেরূপ কাণ্ড ঘটিতেছে তাহাতে কোন্‌দিন মনোহর তাহাকে ত্যাগ করিবে। ত্যাগ করিলে গেলে যে সব উৎপাত পোহাইতে হয় তাহা যদি না থাকিত তা

এতদিনে মনোহর তাহাকে বিদায় করিয়া দিত। কিন্তু বনোয়ারির মা আছেন, এবং আত্মীয় স্বজনের নানা লোকের নানা প্রকার মত, এই লইয়া একটা গোলমাল বাধাইয়া তুলিতে তিনি অত্যন্ত অনিচ্ছুক বলিয়াই এখনো মনোহর চুপ করিয়া আছেন।

এমনি হইতে হইতে একদিন সকালে হঠাৎ দেখা গেল মধুর ঘরে তালা বন্ধ। রাতারাতি সে যে কোথায় গিয়াছে তাহার খবর নাই। ব্যাপারটা নিতান্ত অশোভন হইতেছে দেখিয়া নীলকণ্ঠ জমিদার-সরকার হইতে টাকা দিয়া তাহাকে সপরিবারে কাশী পাঠাইয়া দিয়াছে। পুলিস তাহা জানে এজন্য কোনো গোলমাল হইল না। অথচ নীলকণ্ঠ কৌশলে গুজব রটাইয়া দিল যে মধুকে তাহার স্ত্রীপুত্রকন্যাসমেত অমাবস্যা রাত্রে কালীর কাছে বলি দিয়া মৃতদেহগুলি ছালায় পুরিয়া মাঝগঙ্গায় ডুবাইয়া দেওয়া হইয়াছে। ভয়ে সকলের শরীর শিহরিয়া উঠিল এবং নীলকণ্ঠের প্রতি জনসাধারণের শ্রদ্ধা পূর্ব্বের চেয়ে অনেক পরিমাণে বাড়িয়া গেল।

বনোয়ারি যাহা লইয়া মাতিয়া ছিল উপস্থিতমত তাহার শাস্তি হইল। কিন্তু সংসারটি তাহার কাছে আর পূর্ব্বের মত রহিল না।

বংশীকে একদিন বনোয়ারি অত্যন্ত ভালবাসিত আজ দেখিল বংশী তাহার কেহ নহে; সে হালদার-গোষ্ঠীর! আর তাহার কিরণ, যাহার ধ্যানরূপটি যৌবনারম্ভের পূর্ব্ব হইতেই ক্রমে ক্রমে তাহার হৃদয়ের লতাবিতানটিকে জড়াইয়া জড়াইয়া আচ্ছন্ন করিয়া রহিয়াছে, সেও সম্পূর্ণ তাহার নহে, সেও হালদার-গোষ্ঠীর। একদিন ছিল, যখন নীলকণ্ঠের ফরমাসে গড়া গহনা তাহার এই হৃদয়-বিহারিণী কিরণের গায়ে ঠিকমত মানাইত না বলিয়া বনোয়ারি খুঁৎ খুঁৎ করিত। আজ দেখিল

কালিদাস হইতে আরম্ভ করিয়া অমরু ও চৌর কবির যে সমস্ত কবিতার সোহাগে সে প্রেয়সীকে মণ্ডিত করিয়া আসিয়াছে আজ তাহা এই হালদার-গোষ্ঠীর বড় বউকে কিছুতেই মানাইতেছে না।

হায়রে, বসন্তের হাওয়া তবু বহে, রাত্রে শ্রাবণের বর্ষণ তবু মুখরিত হইয়া উঠে এবং অতৃপ্ত প্রেমের বেদনা শূন্য হৃদয়ের পথে পথে কাঁদিয়া কাঁদিয়া বেড়ায়!

প্রেমের নিবিড়তায় সকলের ত প্রয়োজন নাই; সংসারের ছোট কুন্‌কের মাপের বাঁধাবরাদ্দে অধিকাংশ লোকের বেশ চলিয়া যায়। সেই পরিমিত ব্যবস্থায় বৃহৎ সংসারে কোনো উৎপাত ঘটে না। কিন্তু এক-একজনের ইহাতে কুলায় না। তাহারা অজাত পক্ষিশাবকের মত কেবল মাত্র ডিমের ভিতরকার সঙ্কীর্ণ খাদ্যরসটুকু লইয়া বাঁচেনা, তাহারা ডিম ভাঙিয়া বাহির হইয়াছে, নিজের শক্তিতে খাদ্য আহরণের বৃহৎক্ষেত্র তাহাদের চাই। বনোয়ারি সেই ক্ষুধা লইয়া জন্মিয়াছে—নিজের প্রেমকে নিজের পৌরুষের দ্বারা সার্থক করিবার জন্য তাহার চিত্ত উৎসুক—কিন্তু যেদিকেই সে ছুটিতে চায় সেই দিকেই হালদার-গোষ্ঠীর পাকা ভিত; নড়িতে গেলেই তাহার মাথা ঠুকিয়া যায়।

দিন আবার পূর্ব্বের মত কাটিতে লাগিল। আগের চেয়ে বনোয়ারি শিকারে বেশি মন দিয়াছে ইহা ছাড়া বাহিরের দিক হইতে তাহার জীবনে আর বিশেষ কিছু পরিবর্ত্তন দেখা গেল না। অন্তঃপুরে সে আহার করিতে যায়,—আহারের পর স্ত্রীর সঙ্গে যথাপরিমাণে বাক্যালাপও হয়। মধু কৈবর্ত্তকে কিরণ আজও ক্ষমা করে নাই, কেননা, এই পরিবারে তাহার স্বামী যে আপন প্রতিষ্ঠা হারাইয়াছে, তাহার মূল কারণ মধু। এই জন্য ক্ষণে ক্ষণে কেমন করিয়া সেই মধুর কথা

অত্যন্ত তীব্র হইয়া কিরণের মুখে আসিয়া পড়ে। মধুর যে হাড়ে হাড়ে বজ্জাতি, সে যে সয়তানের অগ্রগণ্য, এবং মধুকে দয়া করাটা যে নিতান্তই একটা ঠকা, এ কথা বারবার বিস্তারিত করিয়াও কিছুতে তাহার শ্রান্তি হয় না। বনোয়ারি প্রথম দুই এক দিন প্রতিবাদের চেষ্টা করিয়া কিরণের উত্তেজনা প্রবল করিয়া তুলিয়াছিল, তাহার পর হইতে সে কিছুমাত্র প্রতিবাদ করে না। এমনি করিয়া বনোয়ারি তাহার নিয়মিত গৃহধর্ম্ম রক্ষা করিতেছে; কিরণ ইহাতে কোনো অভাব অসম্পূর্ণতা অনুভব করে না কিন্তু ভিতরে ভিতরে বনোয়ারির জীবনটা বিবর্ণ, বিরস এবং চির অভুক্ত।

এমন সময় জানা গেল, বাড়ির ছোট বৌ, বংশীর স্ত্রী গর্ভিণী। সমস্ত পরিবার আশায় উৎফুল্ল হইয়া উঠিল। কিরণের দ্বারা এই মহদ্বংশের প্রতি যে কর্ত্তব্যের ত্রুটি হইয়াছিল এতদিন পরে তাহা পূরণের সম্ভাবনা দেখা যাইতেছে—এখন ষষ্ঠীর কৃপায় কন্যা না হইয়া পুত্র হইলে রক্ষা।

পুত্রই জন্মিল। ছোটবাবু কলেজের পরীক্ষাতে উত্তীর্ণ, বংশের পরীক্ষাতেও প্রথম মার্ক পাইল। তাহার আদর উত্তরোত্তর বাড়িয়া উঠিতেছিল, এখন তাহার আদরের সীমা রহিল না।

সকলে মিলিয়া এই ছেলেটিকে লইয়া পড়িল। কিরণ ত তাহাকে এক মুহূর্ত্ত কোল হইতে নামাইতে চায় না। তাহার এমন অবস্থা যে, মধু কৈবর্ত্তের স্বভাবের কুটিলতার কথাও সে প্রায় বিস্মৃত হইবার জো হইল।

বনোয়ারির ছেলে-ভালবাসা অত্যন্ত প্রবল। যাহা কিছু ছোট, অক্ষম, সুকুমার, তাহার প্রতি তাহার গভীর স্নেহ এবং করুণা। সকল

মানুষেরই প্রকৃতির মধ্যে বিধাতা এমন একটা কিছু দেন যাহা তাহার প্রকৃতিবিরুদ্ধ ; নহিলে বনোয়ারি যে কেমন করিয়া পাখী শিকার করিতে পারে বোঝা যায় না।

কিরণের কোলে একটি শিশুর উদয় দেখিবে এই ইচ্ছা বনোয়ারির মনে বহুকাল হইতে অতৃপ্ত হইয়া আছে। এই জন্য বংশীর ছেলে হইলে প্রথমটা তাহার মনে একটু ঈর্ষ্যার বেদনা জন্মিয়াছিল কিন্তু সেটাকে দূর করিয়া দিতে তাহার বিলম্ব হয় নাই। এই শিশুটিকে বনোয়ারি খুবই ভালবাসিতে পারিত কিন্তু ব্যাঘাতের কারণ হইল এই যে যত দিন যাইতে লাগিল কিরণ তাহাকে লইয়া অত্যন্ত বেশি ব্যাপৃত হইয়া পড়িল। স্ত্রীর সঙ্গে বনোয়ারির মিলনে বিস্তর ফাঁক পড়িতে লাগিল। বনোয়ারি স্পষ্টই বুঝিতে পারিল, এতদিন পরে কিরণ এমন একটা কিছু পাইয়াছে যাহা তাহার হৃদয়কে সত্যসত্যই পূর্ণ করিতে পারে। বনোয়ারি যেন তাহার স্ত্রীর হৃদয়হর্ম্ম্যের একজন ভাড়াটে—যতদিন বাড়ির কর্ত্তা অনুপস্থিত ছিল ততদিন সমস্ত বাড়িটা সে ভোগ করিত, কেহ বাধা দিত না—এখন গৃহস্বামী আসিয়াছে তাই ভাড়াটে সব ছাড়িয়া তাহার কোণের ঘরটি মাত্র দখল করিতে অধিকারী। কিরণ স্নেহে যে কতদূর তন্ময় হইতে পারে, তাহার আত্মবিসর্জ্জনের শক্তি যে কত প্রবল তাহা বনোয়ারি যখন দেখিল তখন তাহার মন মাথা নাড়িয়া বলিল,—এই হৃদয়কে আমি ত জাগাইতে পারি নাই, অথচ আমার যাহা সাধ্য তাহা ত করিয়াছি।

শুধু তাই নয়, এই ছেলেটির সূত্রে বংশীর ঘরই যেন কিরণের কাছে বেশি আপন হইয়া উঠিয়াছে। তাহার সমস্ত মন্ত্রণা আলোচনা বংশীর সঙ্গেই ভাল করিয়া জমে। সেই সূক্ষ্মবুদ্ধি সূক্ষ্মশরীর রসরক্তহীন

ক্ষীণজীবী ভীরু মানুষটার প্রতি বনোয়ারির অবজ্ঞা ক্রমেই গভীরতর হইতেছিল। সংসারের সকল লোকে তাহাকেই বনোয়ারির চেয়ে সকল বিষয়ে যোগ্য বলিয়া মনে করে তাহা বনোয়ারি সহিয়াছে কিন্তু আজ সে যখন বারবার দেখিল মানুষহিসাবে তাহার স্ত্রীর কাছে বংশীর মূল্য বেশী তখন নিজের ভাগ্য এবং বিশ্বসংসারের প্রতি তাহার মন প্রসন্ন হইল না।

এমন সময়ে পরীক্ষার কাছাকাছি কলিকাতার বাসা হইতে খবর আসিল বংশী জ্বরে পড়িয়াছে, এবং ডাক্তার আরোগ্য অসাধ্য বলিয়া আশঙ্কা করিতেছে। বনোয়ারি কলিকাতায় গিয়া দিনরাত জাগিয়া বংশীর সেবা করিল কিন্তু তাহাকে বাঁচাইতে পারিল না।

মৃত্যু বনোয়ারির স্মৃতি হইতে সমস্ত কাঁটা উৎপাটিত করিয়া লইল। বংশী যে তাহার ছোট ভাই, এবং শিশুবয়সে দাদার কোলে যে তাহার স্নেহের আশ্রয় ছিল এই কথাই তাহার মনে অশ্রুধৌত হইয়া উজ্জ্বল হইয়া উঠিল।

এবার ফিরিয়া আসিয়া তাহার সমস্ত প্রাণের যত্ন দিয়া শিশুটিকে মানুষ করিতে সে কৃতসঙ্কল্প হইল। কিন্তু এই শিশু সম্বন্ধে কিরণ তাহার প্রতি বিশ্বাস হারাইয়াছে। ইহার প্রতি তাহার স্বামীর বিরাগ সে প্রথম হইতেই লক্ষ্য করিয়াছে। স্বামীর সম্বন্ধে কিরণের মনে কেমন একটা ধারণা হইয়া গেছে যে, অপর সাধারণের পক্ষে যাহা স্বাভাবিক তাহার স্বামীর পক্ষে ঠিক তাহার উল্টা। তাহাদের বংশের এই ত একমাত্র কুলপ্রদীপ, ইহার মূল্য যে কি তাহা আর সকলেই বোঝে, নিশ্চয় সেই জন্যই তাহার স্বামী তাহা বোঝে না। কিরণের মনে সর্ব্বদাই ভয় পাছে বনোয়ারির বিদ্বেষদৃষ্টি ছেলেটির অমঙ্গল ঘটায়।

তাহার দেবর বাঁচিয়া নাই, কিরণের সন্তানসম্ভাবনা আছে বলিয়া কেহই আশা করে না, অতএব এই শিশুটিকে কোনোমতে সকল প্রকার অকল্যাণ হইতে বাঁচাইয়া রাখিতে পারিলে তবে রক্ষা। এইরূপে বংশীর ছেলেটিকে যত্ন করিবার পথ বনোয়ারির পক্ষে বেশ স্বাভাবিক হইল না।

বাড়ীর সকলের আদরে ক্রমে ছেলেটি বড় হইয়া উঠিতে লাগিল। তাহার নাম হইল হরিদাস। এত বেশি আদরের আওতায় সে যেন কেমন ক্ষীণ এবং ক্ষণভঙ্গুর আকার ধারণ করিল। তাগা তাবিজ মাদুলিতে তাহার সর্ব্বাঙ্গ আচ্ছন্ন, রক্ষকের দল সর্ব্বদাই তাহাকে ঘিরিয়া।

ইহার ফাঁকে ফাঁকে মাঝে মাঝে বনোয়ারির সঙ্গে তাহার দেখা হয়। জ্যাঠামশায়ের ঘোড়ায় চড়িবার চাবুক লইয়া আস্ফালন করিতে সে বড় ভালবাসে। দেখা হইলেই বলে 'চাবু'। বনোয়ারি ঘর হইতে চাবুক বাহির করিয়া আনিয়া বাতাসে সাঁই সাঁই শব্দ করিতে থাকে, তাহার ভারী আনন্দ হয়। বনোয়ারি এক একদিন তাহাকে আপনার ঘোড়ার উপর বসাইয়া দেয় তাহাতে বাড়িসুদ্ধ লোক একেবারে হাঁ হাঁ করিয়া ছুটিয়া আসে। বনোয়ারি কখনো কখনো আপনার বন্দুক লইয়া তাহার সঙ্গে খেলা করে, দেখিতে পাইলে কিরণ ছুটিয়া আসিয়া বালককে সরাইয়া লইয়া যায়। কিন্তু এই সকল নিষিদ্ধ আমোদেই হরিদাসের সকলের চেয়ে অনুরাগ। এই জন্য সকল প্রকার বিঘ্ন-সত্ত্বে জ্যাঠামশায়ের সঙ্গে তাহার খুব ভাব হইল।

বহুকাল অব্যাহতির পর এক সময়ে হঠাৎ এই পরিবারে মৃত্যুর আনাগোনা ঘটিল;—প্রথমে মনোহরের স্ত্রীর মৃত্যু হইল। তাহার পরে

নীলকণ্ঠ যখন কর্ত্তার জন্য বিবাহের পরামর্শ ও পাত্রীর সন্ধান করিতেছে এমন সময় বিবাহের লগ্নের পূর্ব্বেই মনোহরের মৃত্যু হইল। তখন হরিদাসের বয়স আট। মৃত্যুর পূর্ব্বে মনোহর বিশেষ করিয়া তাঁহার ক্ষুদ্র এই বংশধরকে কিরণ এবং নীলকণ্ঠের হাতে সমর্পণ করিয়া গেলেন—বনোয়ারিকে কোনো কথাই বলিলেন না।

বাক্স হইতে উইল যখন বাহির হইল তখন দেখা গেল মনোহর তাঁহার সমস্ত সম্পত্তি হরিদাসকে দিয়া গিয়াছেন। বনোয়ারি যাবজ্জীবন দুইশত টাকা করিয়া মাসহারা পাইবেন। নীলকণ্ঠ উইলের একজিকুটর, তাহার উপরে ভার রহিল সে যতদিন বাঁচে হালদার পরিবারের বিষয় এবং সংসারের ব্যবস্থা সেই করিবে।

বনোয়ারি বুঝিলেন, এ পরিবারে কেহ তাঁহাকে ছেলে দিয়াও ভরসা পায় না, বিষয় দিয়াও না। তিনি কিছুই পারেন না, সমস্তই নষ্ট করিয়া দেন এ সম্বন্ধে এ বাড়িতে কাহারো দুই মত নাই। অতএব তিনি বরাদ্দমত আহার করিয়া কোণের ঘরে নিদ্রা দিবেন তাঁহার পক্ষে এইরূপ বিধান। তিনি কিরণকে বলিলেন, আমি নীলকণ্ঠের পেন্সন খাইয়া বাঁচিব না—এবাড়ি ছাড়িয়া চল আমার সঙ্গে কলিকাতায়।

"ওমা! সে কি কথা! এ ত তোমারি বাপের বিষয়—আর হরিদাস ত তোমারি আপন ছেলের তুল্য। ওকে বিষয় লিখিয়া দেওয়া হইয়াছে বলিয়া তুমি রাগ কর কেন?"

হায় হায়, তাহার স্বামীর হৃদয় কি কঠিন! এই কচি ছেলের উপরেও ঈর্ষ্যা করিতে তাহার মন ওঠে? তাহার শ্বশুর যে উইলটি লিখিয়াছে কিরণ মনে মনে তাহার সম্পূর্ণ সমর্থন করে। তাহার নিশ্চয় বিশ্বাস বনোয়ারির হাতে যদি বিষয় পড়িত তবে রাজ্যের যত ছোটলোক,

যত যদু, মধু, যত কৈবর্ত্ত এবং আগুরির দল তাহাকে ঠকাইয়া কিছু আর বাকি রাখিত না এবং হালদার-বংশের এই ভাবী আশা একদিন অকূলে ভাসিত। শ্বশুরের কুলে বাতি জ্বালিবার দীপটি ত ঘরে আসিয়াছে এখন তাহার তৈলসঞ্চয় যাহাতে নষ্ট না হয় নীলকণ্ঠই ত তাহার উপযুক্ত প্রহরী।

বনোয়ারি দেখিল নীলকণ্ঠ অন্তঃপুরে আসিয়া ঘরে ঘরে সমস্ত জিনিষপত্রের লিষ্ট করিতেছে এবং যেখানে যত সিন্দুক বাক্স আছে তাহাতে তালা চাবি লাগাইতেছে। অবশেষে কিরণের শোবার ঘরে আসিয়া সে বনোয়ারির নিত্যব্যবহার্য্য সমস্ত দ্রব্য ফর্দ্দভুক্ত করিতে লাগিল। নীলকণ্ঠের অন্তঃপুরে গতিবিধি আছে সুতরাং কিরণ তাহাকে লজ্জা করে না। কিরণ শ্বশুরের শোকে ক্ষণে ক্ষণে অশ্রু মুছিবার অবকাশে বাষ্পরুদ্ধ কণ্ঠে বিশেষ করিয়া সমস্ত জিনিষ বুঝাইয়া দিতে লাগিল। বনোয়ারি সিংহগর্জ্জনে গর্জ্জিয়া উঠিয়া নীলকণ্ঠকে বলিল, তুমি এখনি আমার ঘর হইতে বাহির হইয়া যাও!

নীলকণ্ঠ নম্র হইয়া কহিল, বড়বাবু, আমার ত কোনো দোষ নাই! কর্ত্তার উইল অনুসারে আমাকে ত সমস্ত বুঝিয়া লইতে হইবে। আসবাবপত্র সমস্তই ত হরিদাসের।

কিরণ মনে মনে কহিল, দেখ একবার, ব্যাপারখানা দেখ! হরিদাস কি আমাদের পর? নিজের ছেলের সামগ্রী ভোগ করিতে আবার লজ্জা কিসের? আর, জিনিষপত্র মানুষের সঙ্গে যাইবে না কি? আজ না হয় কাল ছেলেপুলেরাই ত ভোগ করিবে!

এ বাড়ির মেঝে বনোয়ারির পায়ের তলায় কাঁটার মত বিঁধিতে লাগিল, এ বাড়ির দেয়াল তাহার দুই চক্ষুকে যেন দগ্ধ করিল। তাহার

বেদনা যে কিসের তাহা বলিবার লোকও এই বৃহৎ পরিবারে কেহ নাই।

এই মুহূর্ত্তেই বাড়িঘর সমস্ত ফেলিয়া বাহির হইয়া যাইবার জন্য বনোয়ারির মন ব্যাকুল হইয়া উঠিল। কিন্তু তাহার রাগের জ্বালা যে থামিতে চায় না। সে চলিয়া যাইবে আর নীলকণ্ঠ আরামে একাধিপত্য করিবে এ কল্পনা সে সহ্য করিতে পারিল না। এখনি কোনো একটা গুরুতর অনিষ্ট করিতে না পারিলে তাহার মন শান্ত হইতে পারিতেছে না। সে বলিল, নীলকণ্ঠ কেমন বিষয় রক্ষা করিতে পারে আমি তাহা দেখিব!

বাহিরে তাহার পিতার ঘরে গিয়া দেখিল সে ঘরে কেহই নাই। সকলেই অন্তঃপুরের তৈজসপত্র ও গহনা প্রভৃতির খবরদারি করিতে গিয়াছে। অত্যন্ত সাবধান লোকেরও সাবধানতায় ত্রুটি থাকিয়া যায়। নীলকণ্ঠের হুঁস ছিলনা যে কর্ত্তার বাক্স খুলিয়া উইল বাহির করিবার পরে বাক্সয় চাবি লাগানো হয় নাই। সেই বাক্সয় তাড়াবাঁধা মূল্যবান সমস্ত দলিল ছিল। সেই দলিলগুলির উপরেই এই হালদার-বংশের সম্পত্তির ভিত্তি প্রতিষ্ঠিত।

বনোয়ারি এই দলিলগুলির বিবরণ কিছুই জানেনা কিন্তু এগুলি যে অত্যন্ত কাজের, এবং ইহাদের অভাবে মামলা মকদ্দমায় পদে পদে ঠকিতে হইবে তাহা সে বোঝে। কাগজগুলি লইয়া সে নিজের একটা রুমালে জড়াইয়া তাহাদের বাহিরের বাগানে চাঁপাতলার বাঁধানো চাতালে বসিয়া অনেকক্ষণ ধরিয়া ভাবিতে লাগিল।

পরদিন শ্রাদ্ধসম্বন্ধে আলোচনা করিবার জন্য নীলকণ্ঠ বনোয়ারির কাছে উপস্থিত হইল। নালকণ্ঠের দেহের ভঙ্গী অত্যন্ত বিনম্র, কিন্তু

তাহার মুখের মধ্যে এমন একটা কিছু ছিল, অথবা ছিল না, যাহা দেখিয়া অথবা কল্পনা করিয়া বনোয়ারির পিত্ত জ্বলিয়া গেল। তাহার মনে হইল নম্রতার দ্বারা নীলকণ্ঠ তাহাকে ব্যঙ্গ করিতেছে। নীলকণ্ঠ বলিল, কর্ত্তার শ্রাদ্ধসম্বন্ধে—

বনোয়ারি তাহাকে কথা শেষ করিতে না দিয়াই বলিয়া উঠিল—আমি তাহার কি জানি ?

নীলকণ্ঠ কহিল, সে কি কথা ? আপনিই ত শ্রাদ্ধাধিকারী।

মস্ত অধিকার ! শ্রাদ্ধের অধিকার ! সংসারে কেবল ঐটুকুতে আমার প্রয়োজন আছে—আমি আর কোনো কাজেরই না। বনোয়ারি গর্জ্জিয়া উঠিল, যাও, যাও, আমাকে বিরক্ত করিয়ো না।

নীলকণ্ঠ গেল কিন্তু তাহার পিছন হইতে বনোয়ারির মনে হইল সে হাসিতে হাসিতে গেল। বনোয়ারির মনে হইল বাড়ির সমস্ত চাকরবাকর এই অশ্রদ্ধিত এই পরিত্যক্তকে লইয়া আপনাদের মধ্যে হাসিতামাসা করিতেছে। যে মানুষ বাড়ির অথচ বাড়ির নহে তাহার মত ভাগ্যকর্ত্তৃক পরিহসিত আর কে আছে ! পথের ভিক্ষুকও নহে।

বনোয়ারি সেই দলিলের তাড়া লইয়া বাহির হইল। হালদার পরিবারের প্রতিবেশী ও প্রতিযোগী জমিদার ছিল প্রতাপপুরের বাঁড়ুয্যে জমিদারেরা। বনোয়ারি স্থির করিল এই দলিল দস্তাবেজ তাহাদের হাতে দিব, বিষয় সম্পত্তি সমস্ত ছারখার হইয়া যাক্।

বাহির হইবার সময় হরিদাস উপরের তলা হইতে তাহার সুমধুর বালককণ্ঠে চীৎকার করিয়া উঠিয়া কহিল, জ্যাঠামশায় তুমি বাহিরে যাইতেছ আমিও তোমার সঙ্গে বাহিরে যাইব !

বনোয়ারির মনে হইল বালকের অশুভগ্রহ এই কথা তাহাকে

দিয়া বলাইয়া লইল। আমি ত পথে বাহির হইয়াছি, উহাকেও আমার সঙ্গে বাহির করিব। যাবে যাবে, সব ছারখার হইবে!

বাহিরের বাগান পর্য্যন্ত যাইতেই বনোয়ারি একটা বিষম গোলমাল শুনিতে পাইল। অদূরে হাটের সংলগ্ন একটি বিধবার কুটীরে আগুন লাগিয়াছে। বনোয়ারির চিরাভ্যাসক্রমে এ দৃশ্য দেখিয়া সে আর স্থির থাকিতে পারিল না। তাহার দলিলের তাড়া সে চাঁপাতলায় রাখিয়া আগুনের কাছে ছুটিল।

যখন ফিরিয়া আসিল দেখিল তাহার সেই কাগজের তাড়া নাই। মুহূর্ত্তের মধ্যে হৃদয়ে শেল বিঁধাইয়া এই কথাটা মনে হইল, নীলকণ্ঠের কাছে আবার আমার হার হইল। বিধবার ঘর জ্বলিয়া ছাই হইয়া গেলে তাহাতে ক্ষতি কি ছিল! তাহার মনে হইল, চতুর নীলকণ্ঠই ওটা পুনর্ব্বার সংগ্রহ করিয়াছে।

একেবারে ঝড়ের মত সে কাছারিঘরে আসিয়া উপস্থিত। নীলকণ্ঠ তাড়াতাড়ি বাক্স বন্ধ করিয়া সসম্ভ্রমে দাঁড়াইয়া উঠিয়া বনোয়ারিকে প্রণাম করিল। বনোয়ারির মনে হইল ঐ বাক্সের মধ্যেই সে কাগজ লুকাইল। কোনো কিছু না বলিয়া একেবারে সেই বাক্সটা খুলিয়া তাহার মধ্যে কাগজ ঘাঁটিতে লাগিল। তাহার মধ্যে হিসাবের খাতা এবং তাহারই জোগাড়ের সমস্ত নথী। বাক্স উপুড় করিয়া ঝাড়িয়া কিছুই মিলিল না। রুদ্ধপ্রায় কণ্ঠে বনোয়ারি কহিল, তুমি চাঁপাতলায় গিয়েছিলে?

নীলকণ্ঠ বলিল, আজ্ঞা হাঁ, গিয়াছিলাম বইকি। দেখিলাম আপনি ব্যস্ত হইয়া ছুটিতেছেন, কি হইল তাহাই জানিবার জন্য বাহির হইয়াছিলাম।

বনোয়ারি। আমার রুমালে বাঁধা কাগজগুলা তুমিই লইয়াছ।

নীলকণ্ঠ নিতান্ত ভালমানুষের মত কহিল, আজ্ঞা না।

বনোয়ারি। মিথ্যা কথা বলিতেছ! তোমার ভাল হইবে না এখনি ফিরাইয়া দাও!

বনোয়ারি মিথ্যা তর্জ্জন গর্জ্জন করিল। কি জিনিষ তাহার হারাইয়াছে তাহাও সে বলিতে পারিল না এবং সেই চোরাই মাল সম্বন্ধে তাহার কোন জোর নাই জানিয়া সে মনে মনে অসাবধান মূঢ় আপনাকেই যেন ছিন্ন ছিন্ন করিতে লাগিল।

কাছারিতে এইরূপ পাগলামি করিয়া সে চাঁপাতলায় আবার খোঁজাখুঁজি করিতে লাগিল। মনে মনে মাতৃদিব্য করিয়া সে প্রতিজ্ঞা করিল যে-করিয়া হউক্ এ কাগজগুলা পুনরায় উদ্ধার করিব তবে আমি ছাড়িব। কেমন করিয়া উদ্ধার করিবে তাহা চিন্তা করিবার সামর্থ্য তাহার ছিলনা, কেবল ক্রুদ্ধ বালকের মত বারবার মাটিতে পদাঘাত করিতে করিতে বলিল, উদ্ধার করিবই, করিবই, করিবই!

শ্রান্ত দেহে সে গাছতলায় বসিল। কেহ নাই, তাহার কেহ নাই, এবং তাহার কিছুই নাই। এখন হইতে নিঃসম্বলে আপন ভাগ্যের সঙ্গে এবং সংসারের সঙ্গে তাহাকে লড়াই করিতে হইবে। তাহার পক্ষে মানসম্ভ্রম নাই, ভদ্রতা নাই, প্রেম নাই, স্নেহ নাই, কিছুই নাই। আছে কেবল মরিবার এবং মারিবার অধ্যবসায়।

এইরূপ মনে মনে ছট্‌ফট্ করিতে করিতে নিরতিশয় ক্লান্তিতে চাতালের উপর পড়িয়া কখন সে ঘুমাইয়া পড়িয়াছে। যখন জাগিয়া উঠিল তখন হঠাৎ বুঝিতে পারিল না কোথায় সে আছে! ভাল করিয়া সজাগ হইয়া উঠিয়া বসিয়া দেখে তাহার শিয়রের কাছে হরিদাস বসিয়া।

বনোয়ারিকে জাগিতে দেখিয়া হরিদাস বলিয়া উঠিল, জ্যাঠামহাশয়, তোমার কি হারাইয়াছে বল দেখি ?

বনোয়ারি স্তব্ধ হইয়া গেল—হরিদাসের এ প্রশ্নের উত্তর করিতে পারিল না। হরিদাস কহিল, আমি যদি দিতে পারি আমাকে কি দিবে ?

বনোয়ারির মনে হইল, হয়ত আর কিছু। সে বলিল, আমার যাহা আছে সব তোকে দিব।—এ কথা সে পরিহাস করিয়াই বলিল, সে জানে তাহার কিছুই নাই।

তখন হরিদাস আপন কাপড়ের ভিতর হইতে বনোয়ারির রুমালে-মোড়া সেই কাগজের তাড়া বাহির করিল। এই রঙীন রুমালটাতে বাঘের ছবি আঁকা ছিল—সেই ছবি তাহার জ্যাঠা তাহাকে অনেকবার দেখাইয়াছে। এই রুমালটার প্রতি হরিদাসের বিশেষ লোভ। সেইজন্যই অগ্নিদাহের গোলমালে ভৃত্যেরা যখন বাহিরে ছুটিয়াছিল সেই অবকাশে বাগানে আসিয়া হরিদাস চাঁপাতলায় দূর হইতে এই রুমালটা দেখিয়াই চিনিতে পারিয়াছিল।

হরিদাসকে বনোয়ারি বুকের কাছে টানিয়া লইয়া চুপ করিয়া বসিয়া রহিল—কিছুক্ষণ পরে তাহার চোখ দিয়া ঝর ঝর করিয়া জল পড়িতে লাগিল। তাহার মনে পড়িল অনেকদিন পূর্ব্বে সে তাহার এক নূতন-কেনা কুকুরকে শায়েস্তা করিবার জন্য তাহাকে বারম্বার চাবুক মারিতে বাধ্য হইয়াছিল। একবার তাহার চাবুক হারাইয়া গিয়াছিল, কোথাও সে খুঁজিয়া পাইতেছিল না। যখন চাবুকের আশা পরিত্যাগ করিয়া সে বসিয়া আছে এমন সময় দেখিল সেই কুকুরটা কোথা হইতে চাবুকটা মুখে করিয়া মনিবের সম্মুখে আনিয়া পরমানন্দে ল্যাজ নাড়িতেছে। আর কোনোদিন কুকুরকে সে চাবুক মারিতে পারে নাই।

বনোয়ারি তাড়াতাড়ি চোখের জল মুছিয়া ফেলিয়া কহিল, হরিদাস তুই কি চাস আমাকে বল্।

হরিদাস কহিল, আমি তোমার ঐ রুমালটা চাই জ্যাঠামশায়।

বনোয়ারি কহিল, আয় হরিদাস, তোকে কাঁধে চড়াই।

হরিদাসকে কাঁধে তুলিয়া লইয়া বনোয়ারি তৎক্ষণাৎ অন্তঃপুরে চলিয়া গেল। শয়নঘরে গিয়া দেখিল, কিরণ সারাদিন রৌদ্রে-দেওয়া কম্বলখানি বারান্দা হইতে তুলিয়া আনিয়া ঘরের মেজের উপর পাতিতেছে। বনোয়ারির কাঁধের উপর হরিদাসকে দেখিয়া সে উদ্বিগ্ন হইয়া বলিয়া উঠিল—নামাইয়া দাও, নামাইয়া দাও—উহাকে তুমি ফেলিয়া দিবে।

বনোয়ারি কিরণের মুখের দিকে স্থির দৃষ্টি রাখিয়া কহিল, আমাকে আর ভয় করিয়োনা, আমি ফেলিয়া দিবনা!

এই বলিয়া সে কাঁধ হইতে নামাইয়া হরিদাসকে কিরণের কোলের কাছে অগ্রসর করিয়া দিল। তাহার পরে সেই কাগজগুলি লইয়া কিরণের হাতে দিয়া কহিল, এগুলি হরিদাসের। বিষয় সম্পত্তির দলিল। যত্ন করিয়া রাখিয়ো।

কিরণ আশ্চর্য্য হইয়া কহিল, তুমি কোথা হইতে পাইলে?

বনোয়ারি কহিল, আমি চুরি করিয়াছিলাম।

তাহার পর হরিদাসকে বুকে টানিয়া কহিল, এই নে বাবা, তোর জ্যাঠামশায়ের যে মূল্যবান সম্পত্তিটির প্রতি তোর লোভ পড়িয়াছে এই নে!—বলিয়া রুমালটি তাহার হাতে দিল।

তাহার পর আর একবার ভাল করিয়া কিরণের দিকে তাকাইয়া দেখিল। দেখিল সেই তন্বী এখন ত তন্বী নাই—কখন মোটা

হইয়াছে সে তাহা লক্ষ্য করে নাই। এতদিনে হালদার-গোষ্ঠীর বড় বৌয়ের উপযুক্ত চেহারা তাহার ভরিয়া উঠিয়াছে। আর কেন, এখন অমরু শতকের কবিতাগুলাও বনোয়ারির অন্য সমস্ত সম্পত্তির সঙ্গে বিসর্জ্জন দেওয়াই ভাল।

সেই রাত্রেই বনোয়ারির আর দেখা নাই। কেবল সে একছত্র চিঠি লিখিয়া গেছে যে, সে চাকরি খুঁজিতে বাহির হইল।

বাপের শ্রাদ্ধ পর্য্যন্ত সে অপেক্ষা করিল না—দেশসুদ্ধ লোক তাই লইয়া তাহাকে ধিক্ ধিক্ করিতে লাগিল।

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

সবুজ পাতার গান

মুক্ত হাওয়া মুক্ত আলোর যুক্ত-বেণী-সঙ্গমে
রঙীন্ হয়ে উঠ্‌ছি মোরা সবুজ-শোভা-বিভ্রমে।
সত্যিকালের বৃক্ষ ওগো! বনের বনস্পতি গো!
আমরা তোমার প্রাণের আলো স্নেহ-সরস জ্যোতি গো।

সুখ নাহিক স্বস্তি নাহি আনন্দ নাই আওতাতে,
সোনার রোদে সবুজ মোরা আলোক-মদের মৌতাতে।
মেতেছে মন—প্রাণ মেতেছে না জানি কোন সন্ধানে,
পল্লবিত বনের হিয়া যৌবনেরি জয়-গানে।

রবির আলোর গোপন কথা—আমরা চির-তারুণ্য,
গুপ্ত আশার ব্যক্ত নিশান, কঠিন কাঠের কারুণ্য!
সুর পড়েছে পঞ্জরে যার থর পড়েছে বল্কলে
মোদের তরে পথ সে করে কোন্ রভসের কোন্ ছলে!

আদিম রসের আমরা রসিক আমরা নব-ঘন-শ্যাম,
ফাগুন হাওয়ার দাদ্‌রা তালে নৃত্য মোদের অবিশ্রাম।
হিমের রাতে আমরা জাগি, আমরা কভু ঝিমাই-নে,
সবুজ দীপের দীপান্বিতা একেবারে নিবাই নে।

আমরা সবুজ অসঙ্কোচে, আমরা তাজা,—গৌরবে,
আমোদ করি সবুজ মোহে উশীর-ঘন-সৌরভে ;
আমরা কাঁচা আমরা সাঁচা মরাবাঁচার নাই খেয়াল,
আমরা তরুণ ভয় করিনে ঝোড়ো হাওয়ার রুদ্রতাল।

বুক পেতে নিই হাস্যমুখে রৌদ্র খর বৈশাখী,
স্নিগ্ধ-মধুর শ্যামল সরস মদির ছায়ার হই সাকী,
ভাঙা মেঘ আর ঝরা পাতায় সাজায় রবি গৈরিকে,
আমরা তপে পেলাম সবুজ—গৈরিকেরি বৈরীকে।

মুক্ত হাওয়া দীপ্ত আলো ছায় গো কানে মন্ত্রণা,
শুন্‌ছ কথা ?—বল্‌ছে "জগৎ মোক্ষ লাভের যন্ত্র না।
নয় সে শুধুই তত্ত্বকথা, নয় সে মাত্র মন্তৃতা,
তরুণ যাহা তাহাই তথ্য,—বল্‌ছে সবুজ পত্র তা।"

আমরা সবুজ, আমরা সবুজ—আলো-ছায়ার আলিঙ্গন,
ক্লান্ত আঁখির সঞ্জীবনী, নিরঞ্জনের প্রেমাঞ্জন।
রসের রঙের ধাত্রী ধরা ! গানের প্রাণের মাতৃকা !
এই সবুজের ছত্রতলে যৌবনে দাও রাজটীকা।

শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ দত্ত।

দ্বিতীয় সংখ্যা] জ্যৈষ্ঠ ১৩২১ [প্রথম বর্ষ

সবুজ পত্র

সম্পাদক ঃ—শ্রীপ্রমথ চৌধুরী

সবুজ পত্র

সাহিত্য-সম্মিলন

গত সাহিত্য-সম্মিলনে একটি নূতন সুরের পরিচয় পাওয়া গেছে,—সে হচ্ছে সত্যের সুর। এ সুর যে বঙ্গ-সাহিত্যে পূর্ব্বে কখনও শোনা যায়নি তা নয়; তবে নূতনত্বের মধ্যে এইটুকু যে, আর পাঁচটি বিবাদী সম্বাদী ও অনুবাদী সুরের মধ্যে এবারকার পালায় এইটিই ছিল স্থায়ী সুর। এবং সে সুর যে অতি সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছিল, তার কারণ তা কোমল নয়—তীব্র।

এবারকার ব্যাপারের কর্ম্মকর্ত্তারা নিমন্ত্রিত অভ্যাগত সাহিত্যিকদের, প্রচলিত প্রথা মত—"আসুন বসুন" বলে' সম্ভাষণ করেননি; "উঠুন চলুন" বলে' অভিভাষণ করেছেন! এঁরা সকলেই গলার আওয়াজ আধসুর চড়িয়ে মুক্তকণ্ঠে একবাক্যে বলেছেন যে—"এ দেশের সেকাল সত্যযুগ হতে পারে, কিন্তু একাল হচ্ছে মিথ্যার যুগ।" এই দেশব্যাপী

মিথ্যার হাত হতে কি করে উদ্ধার পাওয়া যায়, তারি সন্ধান বলে' দেওয়াটাই ছিল সাহিত্যাচার্য্যদের মুখ্য উদ্দেশ্য।

মিথ্যার চর্চ্চা লোকে দু'ভাবে করে,—এক জেনে, আর এক না জেনে। সত্য যে কি, তা জেনেও কেউ কেউ কথায় ও কাজে তা নিত্য উপেক্ষা করেন। এ রোগের ঔষধ কি, বলা কঠিন,—অন্ততঃ ওর কোন টোট্‌কা আমার জানা নেই। অপর পক্ষে অনেকে কেবল মাত্র মানসিক জড়তাবশতঃ, ও-বস্তু যে কি, তার সন্ধান জানেনও না, নেনও না। তাই সম্মিলনের মুখপাত্রেরা, যাদের মনের সর্ব্বাঙ্গে আলস্য ধরেছে, সেই শ্রেণীর লোকদের উপদেশ দিয়েছেন—"উত্তিষ্ঠত, জাগ্রত।"

এঁরা আমাদের জাগিয়ে তুলতে চান,—সত্যের জ্ঞানে; আমাদের উঠে চল্‌তে বলেন, সত্যের অনুসন্ধানে। কারণ, যে সত্য চোখের সুমুখে রয়েছে সেটিকে দেখাও আমাদের পক্ষে যেমন কর্ত্তব্য, যে সত্য লুকিয়ে আছে তাকে খুঁজে বার করাও আমাদের পক্ষে তেমনি কর্ত্তব্য। কোনও জিনিষ দেখ্‌তে হলে, জাগা অর্থাৎ চোখ-খোলা দরকার, আর কোন জিনিষ খুঁজতে হলে, ওঠা এবং চলা দরকার। তাই এঁরা আমাদের "উত্তিষ্ঠত, জাগ্রত" এই মন্ত্রে দীক্ষিত কর্‌তে চান্‌। তবে আমরা এ মন্ত্রে দীক্ষিত হতে রাজি হব কিনা জানিনে; কেননা এ মন্ত্রের সাধনায় আমরা অভ্যস্ত নই।

লোকপ্রবাদ যে, পুরুতে যখন মন্তর পড়ে পাঁঠা তাতে কর্ণপাত করে না। পাঁঠা যে ওসব কথা কানে তোলে না, তার কারণ, উৎসর্গের মন্ত্র পড়া হয় ছাগকে বলি দেবার জন্য। কিন্তু এই সাহিত্য-যজ্ঞের পুরোহিতেরা যে মন্ত্র পড়েছেন তা বলির মন্ত্র নয়, বোধনের

মন্ত্র,—সুতরাং তাতে কর্ণপাত করায় আমাদের বিশেষ আপত্তি হওয়া উচিত নয়। আমরা মানি আর না মানি, এঁরা যে-কথা বলেছেন তা যে মন দিয়ে শোনবার মত কথা, এই বিশ্বাসে আমি সাহিত্য-সম্মিলনের অভিভাষণ-চতুষ্টয়ের আলোচনা কর্‌তে প্রবৃত্ত হচ্ছি।

(১)

পূজ্যপাদ শ্রীযুক্ত দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় তাঁর অভিভাষণের উপসংহারে বলেছেন যে—

"বিজ্ঞান যদি বৃদ্ধ ভারত-মন্ত্রীর কথা শোনেন, তবে ভারতে ফিরিয়া আসুন।"

এ কথা বলবার উদ্দেশ্য এই যে, তাঁর মতে ভারতবর্ষই হচ্ছে বিজ্ঞানের জন্মভূমি, কিন্তু পুরাকালে বালক অবস্থাতেই বিজ্ঞান সমাজের প্রতি অভিমান করে', দেশত্যাগী হয়ে ইউরোপে চলে যান। এবং সেখানে তদ্দেশবাসীর যত্নে লালিত পালিত হয়ে, এখন যথেষ্টর চাইতেও বেশি হৃষ্টপুষ্ট হয়ে উঠেছেন। এমন কি, ইউরোপবাসীরা এখন আর তাঁকে সাম্‌লে উঠতে পার্‌ছে না। এই কারণেই, যিনি স্থলপথে বিলেত চলে গেছ্‌লেন, তাঁকে আবার জলপথে দেশে ফিরে আস্‌তে অনুরোধ করা হয়েছে। ঘরের ছেলে আবার ঘরে ফিরে এলে দেশের যে কোনও অকল্যাণ হবে, এ আশঙ্কা ঠাকুরমহাশয় করেন না। বরং তিনি এতে মঙ্গলেরই আশা করেন। কেন? তা তিনি স্পষ্ট করে' ব্যাখ্যা করেন নি। তবে তিনি বিজ্ঞানের রূপগুণের যে শাস্ত্রসঙ্গত বর্ণনা করেছেন, তার থেকেই আমরা অনুমান কর্‌তে পারি যে, কি কারণে বিজ্ঞানের আবার দেশে ফেরাটা দরকার।

ঠাকুরমহাশয় বলেছেন যে,—

বৈদান্তিক আচার্য্যেরা বলেন সত্য তিন প্রকার :—

(১) পারমার্থিক সত্য = তত্ত্বজ্ঞান = পরাবিদ্যা।

(২) ব্যাবহারিক সত্য = বিজ্ঞান = অপরাবিদ্যা।

(৩) প্রাতিভাসিক সত্য = ভ্রমজ্ঞান = অবিদ্যা।

বিজ্ঞান বল্‌তে একালে আমরা যা বুঝি, সে বিষয়ে বেদান্তের পরিভাষায় সম্যক আলোচনা করা কঠিন; কারণ জ্ঞানের এই ত্রিবিধ জাতিভেদ আধুনিক দার্শনিকেরা স্বীকার করেন না। নব্যমতে জ্ঞান এক,—শুধু ভ্রমই বহুবিধ। তবুও আমার বিশ্বাস যে বেদান্তের পরিভাষা অবলম্বন করে'ও, জ্ঞানের রাজ্যে বিজ্ঞানের স্থান কোথায় এবং কতখানি তা দেখান যেতে পারে। সুতরাং আমি এ প্রবন্ধে উক্ত পরিভাষাই ব্যবহার করব।

ঠাকুরমহাশয় পূর্ব্বোক্ত তিন সত্যের নিম্নলিখিত রূপে ব্যাখ্যা করেছেন :—

"বিজ্ঞান ব্যষ্টিজ্ঞান বা শাখাজ্ঞান; তত্ত্বজ্ঞান সমষ্টিজ্ঞান বা মোট জ্ঞান। পারমার্থিক সত্য মোট জ্ঞানের মোট সত্য; ব্যাবহারিক সত্য বিভিন্ন জ্ঞানের বিভিন্ন সত্য।"

অর্থাৎ যে জ্ঞানের দ্বারা এক অখণ্ড-সত্য লাভ করা যায়, সেই হচ্ছে তত্ত্বজ্ঞান,—আর যার দ্বারা বহু খণ্ড-সত্যের জ্ঞান লাভ করা যায়, সেই হচ্ছে বিজ্ঞান। এক কথায়, তত্ত্বজ্ঞানের উদ্দেশ্য হচ্ছে পুরুষকে জানা; বিজ্ঞানের উদ্দেশ্য হচ্ছে প্রকৃতিকে চেনা। বিজ্ঞানের নামে অনেকে ভয় পান, এই মনে করে' যে তা তত্ত্বজ্ঞানের বিরোধী; এবং তত্ত্বজ্ঞান যেহেতু ভারতবর্ষের প্রাণ, অতএব সেটিকে নিরাপদে

রাখবার জন্য এঁদের মতে বিজ্ঞানকে পরিহার করা কর্ত্তব্য। এরূপ কথা অবশ্য বেদবেদান্তে নেই; বরং উপনিষৎ-কারেরা বলেছেন যে, অপরাবিদ্যা আয়ত্ত করতে না পারলে, পরাবিদ্যায় কারও অধিকার জন্মায় না। উপরোক্ত মতটি যে সম্পূর্ণ সত্য, সে বিষয়ে কোনও সন্দেহ নেই। কেন না, বিজ্ঞানের চর্চ্চা ত্যাগ করলে, বহু সম্বন্ধে আমাদের ভ্রম-জ্ঞান হওয়া অবশ্যম্ভাবী, কারণ বিজ্ঞান হচ্ছে পরীক্ষিত জ্ঞান;—বৈজ্ঞানিকেরা সত্যের টাকা না বাজিয়ে নেন না। বহু খণ্ড-সত্যের উপর যদি এক মোট-সত্যের প্রতিষ্ঠা না করা যায়, তাহলে বহু খণ্ড-মিথ্যার উপর সে সত্যের যে প্রতিষ্ঠা করা যেতে পারে, এরূপ মিছা আশা শুধু পাগলে করতে পারে।

আসল কথা এই যে, দর্শনে আমরা ব্যষ্টি ও সমষ্টি এই দুইটি ভাবকে পৃথক করে নিলেও,—এ বিশ্ব ব্যস্তসমস্ত। তাই সমষ্টির জ্ঞানের ভিতর ব্যষ্টির জ্ঞান প্রচ্ছন্ন থাকে, এবং ব্যষ্টির জ্ঞান সমষ্টির জ্ঞানের অপেক্ষা রাখে; কেন না বস্তুতঃ ও-দুই একসঙ্গে জড়ানো। তত্ত্বজ্ঞানে ও বিজ্ঞানে প্রভেদ এই যে, সমষ্টিজ্ঞান পরাবিদ্যায় এক ভাবে পাওয়া যায়, আর অপরাবিদ্যায় আর-একভাবে পাওয়া যায়। পরাবিদ্যার সমষ্টিজ্ঞান হচ্ছে মূলতঃ একত্বের জ্ঞান। অপরপক্ষে বহুকে যোগ দিয়ে যে সমষ্টি পাওয়া যায়, তারি জ্ঞান হচ্ছে বিজ্ঞানানুমোদিত সমষ্টিজ্ঞান। তত্ত্বজ্ঞানী এক জেনে সব জানতে চান, আর বৈজ্ঞানিক সবকে একত্র করে জানতে চান। এ দুয়ের ভিতর পার্থক্য আছে, কিন্তু বিরোধ নেই। সুতরাং বিজ্ঞানের চর্চ্চায় পারমার্থিক সত্যের নাশের ভয় নেই; ভয় আছে শুধু মিথ্যাজ্ঞানের উচ্ছেদের। যাঁরা মিথ্যাকে আঁকড়ে ধরে থাকতে চান, তাঁরাই শুধু বিজ্ঞানকে ডরান।

পূর্ব্বে বলা হয়েছে যে, প্রাতিভাসিক সত্য হচ্ছে ভ্রমজ্ঞান। এ কথা শুনে লোকের এই ধোঁকা লাগ্‌তে পারে যে, কি করে' একই জ্ঞান যুগপৎ সত্য ও ভ্রম হতে পারে। প্রাতিভাসিক সত্য যে এক হিসাবে সত্য, আর এক হিসাবে মিথ্যা,—এর স্পষ্ট প্রমাণ আছে। সম্মিলনের সভাপতি মহাশয় যে দুটি উদাহরণ দিয়েছেন, তারি সাহায্যে প্রাতিভাসিক সত্যের স্বরূপ নির্ণয় কর্‌তে চেষ্টা কর্‌ব।

সূর্য্য পৃথিবীর চারদিকে ঘুরছে, এটি হচ্ছে প্রাতিভাসিক সত্য; আর পৃথিবী যে সূর্য্যের চারদিকে ঘুরছে, এটি হচ্ছে বৈজ্ঞানিক সত্য। পৃথিবী চেপ্টা, এটি হচ্ছে প্রাতিভাসিক সত্য; আর পৃথিবী গোলাকার, এটি হচ্ছে বৈজ্ঞানিক সত্য। পৃথিবী চেপ্টা ও সূর্য্যের যে উদয়াস্ত হয়, এ দুটিই হচ্ছে প্রত্যক্ষ সত্য; অর্থাৎ আমাদের চোখের পক্ষে ও আমাদের চলাফেরার পক্ষে সম্পূর্ণ সত্য। যতখানি জমি বাঙ্গলা দেশে চোখে দেখা যায়, তা যে সমতল, এর চাইতে খাঁটি সত্য আর নেই। সুতরাং পৃথিবীর যে খণ্ডদেশ আমাদের কাছে প্রত্যক্ষ, তা চেপ্টা—গোলাকার নয়। সমগ্র পৃথিবীটি গোলাকার, কিন্তু সমগ্র পৃথিবীটি প্রত্যক্ষ নয়। আমরা যখন প্রত্যক্ষের সীমা লঙ্ঘন করে', অপ্রত্যক্ষের বিষয় প্রত্যক্ষ-জ্ঞানের সাহায্যে জানতে চাই, তখনই আমরা ভ্রমে পড়ি। কারণ বৈজ্ঞানিক জ্ঞান হচ্ছে সমষ্টির জ্ঞান,—অসংখ্য খণ্ড খণ্ড প্রত্যক্ষ-জ্ঞানের যোগাযোগ করে' সে জ্ঞান পাওয়া যায়। অসংখ্য চেপ্টা-খণ্ডকে ঠিক দিলে তা গোল হয়ে ওঠে। এক মুহূর্ত্তে একদেশদর্শিতাই হচ্ছে প্রত্যক্ষজ্ঞানের ধর্ম্ম, সুতরাং কোনও একটি বিশেষ প্রত্যক্ষজ্ঞানের উপর নির্ভয়ে বৈজ্ঞানিক সত্যকে দাঁড় করান যায় না।

ইন্দ্রিয় বাহ্যবস্তুর যে পরিচয় দেয়, সাধারণতঃ মানুষে তাই নিয়েই সন্তুষ্ট থাকে—কারণ তাতেই তার কাজ চলে যায়। কিন্তু বৈজ্ঞানিক, ব্রহ্মাণ্ডকে একটি প্রকাণ্ড সমষ্টি হিসেবে দেখ্‌তে চায়; বিশ্বে একটা নিয়ম আছে এই বিশ্বাসে, সে সেই নিয়মের সন্ধানে ফেরে। বস্তু সকলকে পৃথকভাবে না দেখে, যুক্তভাবে দেখ্‌তে গিয়ে, বিজ্ঞান দেখতে পায় যে, প্রাতিভাসিক সত্য সমগ্র সত্য নয়। পৃথিবী যে চেপ্টা, ও সূর্য্য যে পৃথিবীর চারদিকে ঘুরছে, প্রত্যক্ষজ্ঞানের হিসেবে এ দু'টি হচ্ছে সম্পূর্ণ পৃথক এবং সম্পর্করহিত সত্য। কিন্তু বিজ্ঞানের কাছে এ দু'টি হচ্ছে এক সত্যের দুইটি বিভিন্ন রূপ। পৃথিবী নামক মৃৎ পিণ্ডটি যে কারণে সূর্য্যের চারপাশে ঘুরপাক খাচ্ছে, সেই কারণেই সেটি তাল পাকিয়ে গেছে। ত্রিকোণ, বা চতুষ্কোণ কিম্বা চেপ্টা হ'লে, ও-ভাবে ঘোরা তার পক্ষে অসাধ্য হ'ত। সুতরাং প্রত্যক্ষজ্ঞানের সঙ্গে বিজ্ঞানের কোনও বিরোধ নেই; কারণ এ উভয়ের অধিকার স্বতন্ত্র। বিজ্ঞানের সাহায্যে আমরা জানতে চাই বস্তুজগতের সামান্য গুণ, আর প্রত্যক্ষজ্ঞানের সাহায্যে আমরা দেখতে চাই বস্তুর বিশেষ রূপ। অতএব, বিজ্ঞানের চর্চ্চা করলে আমাদের তত্ত্বজ্ঞান মারা যাবে না, অর্থাৎ আমাদের ধর্ম্ম নষ্ট হবে না; এবং আমাদের বাহ্যজ্ঞানও নষ্ট হবে না, অর্থাৎ কাব্য শিল্পও মারা যাবে না। যা' তত্ত্বজ্ঞানও নয়, বিজ্ঞানও নয়, প্রত্যক্ষজ্ঞানও নয়,—তাই হচ্ছে যথার্থ মিথ্যা; এবং তারি চর্চ্চা করে' আমরা ধর্ম্ম, সমাজ, কাব্য, শিল্প,—এক কথায় সমগ্র মানবজীবন সমূলে ধ্বংস করতে বসেছি।

(২)

বিজ্ঞান শুধু একপ্রকার বিশেষ জ্ঞানের নাম নয় ;—একটি বিশেষ প্রণালী অবলম্বন করে' যে জ্ঞান লাভ করা যায়, আসলে তারি নাম হচ্ছে বিজ্ঞান। আমরা বিজ্ঞানকে যতই কেন সাধাসাধি করিনে, সে কখনই এদেশে ফিরে আসবে না, যদি না আমরা তার সাধনা করি। সুতরাং সেই সাধনপদ্ধতিটি আমাদের জানা দরকার। বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিটি যে কি, সে সম্বন্ধে আমি দুই একটি কথা বল্‌তে চাই। বিজ্ঞানের উদ্দেশ্য থেকেই তার উপায়েরও পরিচয় পাওয়া যাবে। তত্ত্বজ্ঞানের জিজ্ঞাস্য বিষয় হচ্ছে—"এক সত্য",—অথচ প্রত্যক্ষ-জ্ঞানের বহুর অস্তিত্ব তত্ত্বজ্ঞানীরাও অস্বীকার করতে পারেন না। তাই বৈদান্তিকেরা বলেন—যা পূর্ব্বে এক ছিল, তাই এখন বহুতে পরিণত হয়েছে। সাংখ্যের মতে সৃষ্টি একটি বিকার মাত্র, কেননা ত্রিগুণের সাম্যাবস্থাই প্রকৃতির সুস্থ অবস্থা। সৃষ্টিকে বিকার হিসেবে দেখা আশ্চর্য্য নয়, কেননা আপাতসুলভ জ্ঞানে এ বিশ্ব একটি ভাঙ্গাচোরা, ছাড়ানো ও ছড়ানো ব্যাপার। বিজ্ঞানের উদ্দেশ্য হচ্ছে, এই অসংখ্য পৃথক পৃথক বস্তুর পরস্পরের সম্বন্ধ নির্ণয় করা,—জড়-জগতের ভগ্নাংশগুলিকে যোগ দিয়ে, একটি মন দিয়ে ধরবার-ছোঁবার মত সমষ্টি গড়ে' তোলা। এই ভগ্নাংশগুলিকে পরস্পরের সঙ্গে যোগ করতে হলে আঁকযোখ চাই। সুতরাং দুইয়ে দুইয়ে চার করার নামই হচ্ছে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি। দুইয়ে দুইয়ে পাঁচ আর-যে-দেশেই হোক, বিজ্ঞানের রাজ্যে হয় না। বিজ্ঞানের কারবার শুধু বস্তুর সংখ্যা নিয়ে নয়—পরিমাণ নিয়েও। সুতরাং বিজ্ঞানে মাপযোখও করা চাই। বিনা মাপে, বিনা আঁকে যে

সত্য পাওয়া যায়, তা বৈজ্ঞানিক সত্য নয়। বিজ্ঞানের যা-কিছু মর্য্যাদা, গৌরব ও মূল্য,—তা সবই এই পদ্ধতির দরুণ। আমাদের কাছে কোনও বৈজ্ঞানিক সত্যের বিশেষ কিছু মূল্য নেই, যদি আমরা কি উপায়ে সেটি পাওয়া গেছে, তা না জানি। পৃথিবী কমলালেবুর মত,—এটি হচ্ছে বৈজ্ঞানিক সত্য; কিন্তু কি মাপযোখের, কি যুক্তির সাহায্যে এই সত্য নির্ণীত হয়েছে, সেটি না জানলে, ও-সত্য আমাদের মনের হাতে কমলালেবু নয়, ছেলের হাতে মোয়া,—অর্থাৎ তা আমাদের এতই কম করায়ত্ত যে, যে-খুসি-সেই কেড়ে নিতে পারে। বৈজ্ঞানিক সিদ্ধান্তসকলের ক্রমান্বয়ে ভুল বেরচ্ছে, আবার তা সংশোধন করা হচ্ছে। কিন্তু সে ভুলের আবিষ্কার ও সংশোধন ঐ একই বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির সাহায্যে সাধিত হচ্ছে।

ঐতিহাসিক শাখার নেতা শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার মৈত্র মহাশয়, ঐতিহাসিক সত্য নির্ণয় করবার পদ্ধতিটি যে কি, তারই বিস্তৃত ব্যাখ্যা করেছেন; কারণ ইতিহাস ঠিক বিজ্ঞান না হলেও, একটি উপ-বিজ্ঞানের মধ্যে গণ্য। এক্ষেত্রে মৈত্রমহাশয়ের মতে ঐতিহাসিকদের প্রধান কর্ত্তব্য হচ্ছে অনুসন্ধান করে' অতীতের দলিল সংগ্রহ করা। সে দলিল, নানা দেশে নানা স্থানে ছড়ানো আছে। সুতরাং সেই সব হারামণির অন্বেষণের জন্য ঐতিহাসিকদের দেশদেশান্তরে ঘুরতে হবে। শুধু তাই নয়। ঐতিহাসিক তত্ত্ব সকল-সময়ে মাটির উপর পড়ে'-পাওয়া যায় না। ও হচ্ছে বেশির ভাগ কষ্ট করে' উদ্ধার করবার জিনিষ; কারণ অতীত প্রত্যক্ষ নয়,—বর্ত্তমানে তা চাবা পড়ে' থাকে। ঐতিহাসিক তত্ত্ব আবিষ্কার করবার অর্থ হচ্ছে অদৃষ্টকে দৃষ্ট করা, তার জন্য পুরুষকার চাই। তাই মৈত্রমহাশয়, কেবলমাত্র ভক্তি-

ভরে অতীতের নাম কীর্ত্তন না করে, তার সাক্ষাৎকার লাভ কর্‌বার পরামর্শ আমাদের দিয়েছেন। তাঁর পরামর্শমত কাজ কর্‌তে হলে, আমাদের করতাল ভেঙ্গে কোদাল গড়াতে হবে। ভূগর্ভে ও কালগর্ভে যে সকল ঐতিহাসিক রত্ন নিহিত আছে, আগে তা খুঁড়ে বার কর্‌তে হবে, পরে তার কাটাই-ছাঁটাই করে' সাহিত্য-সমাজে প্রচলন কর্‌তে হবে। এ কথা অবশ্য স্বীকার্য্য যে, আগে আসে খনিকার, তার পরে মণিকার। মৈত্রমহাশয় তাই ঐতিহাসিকদের কলম ছাড়িয়ে খন্তা ধরাতে চান। তাঁর বিশ্বাস যে, ঐতিহাসিকদের হাতের খন্তা নিয়ত ব্যবহারে ক্ষয়ে গিয়ে ক্রমশঃ কলমের আকার ধারণ করবে, এবং সেই কলমে ইতিহাস লিখতে হবে। ইতিহাসের আবিষ্কর্ত্তা ও রচয়িতার মধ্যে যে অধিকারভেদ আছে—মৈত্রমহাশয় বোধ হয় সেটি মানেন না। অথচ এ কথা সত্য যে, একজনের পক্ষে কলম ছেড়ে খন্তা ধরা যত কঠিন, আর একজনের পক্ষে খন্তা ছেড়ে কলম ধরা তার চাইতে কিছু কম কঠিন নয়।

সে যাই হোক, মৈত্রমহাশয় আমাদের আর একটি বিশেষ আবশ্যকীয় কথা স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন। সে হচ্ছে এই যে, ত্যাগ স্বীকার না কর্‌তে পারলে, কোনোরূপ সাধনা করা যায় না। কেননা ত্যাগের অভ্যাস থেকেই সংযমের শিক্ষা লাভ করা যায়। ইতিহাসের বৈজ্ঞানিক সাধনা কর্‌তে হলে, আমাদের অসংখ্য মানসিক আলস্য-প্রসূত বিশ্বাস ত্যাগ কর্‌তে হবে। আমাদের পুরাণের মায়া, কিম্বদন্তীর মোহ কাটাতে হবে।

শুধু রূপকথা নয়, সেই সঙ্গে কথার মোহও আমাদের ত্যাগ করতে হবে, অর্থাৎ যথার্থ ইতিহাস রচনা কর্‌তে হলে সে রচনায়, "শব্দের

লালিত্য, বর্ণনার মাধুর্য্য, ভাষার চাতুর্য্য” পরিহার করতে হবে। এক কথায় শ্রীহর্ষচরিত আর কাদম্বরীর ভাষায় লেখা চলবে না। এ কথা অবশ্য অক্ষরে অক্ষরে সত্য। কিন্তু কি কারণে অক্ষয়বাবু, অপরকে যে উপদেশ দিয়েছেন নিজে সে উপদেশ অনুসরণ করেন নি, তা ঠিক বুঝতে পারলুম না। কারণ তাঁর অভিভাষণের ভাষা যে “অক্ষর-ডম্বর”, এ কথা টাউনহলে সশরীরে উপস্থিত থাকলে স্বয়ং বাণভট্টও স্বীকার করতেন। সম্ভবতঃ অক্ষয়বাবুর মতে ইতিহাসের আখ্যান হচ্ছে বিজ্ঞান, আর বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির ব্যাখ্যান হচ্ছে কাব্য।

(৩)

যে লোভ অক্ষয়বাবু সংবরণ করতে পারেননি, শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় তা সম্পূর্ণ উপেক্ষা করেছেন। শাস্ত্রীমহাশয় আগাগোড়া অশাস্ত্রীয় ভাষা ব্যবহার করায়, তাঁর অভিভাষণ এতই জলের মত সহজ হয়েছে যে, তা এক-নিশ্বাসে নিঃশেষ করা যায়। এ শ্রেণীর লেখা যে বহতা নদীর জলের মতই স্বচ্ছ ও ঠাণ্ডা হওয়া উচিত, সে বিষয়ে কোনই সন্দেহ নেই। জলের মত ভাষার বিশেষ গুণ এই যে, তা জ্ঞান-পিপাসুদের তৃষ্ণা সহজেই নিবারণ করে। বর্ণগন্ধ চাই শুধু কাব্যের ভাষায়,—কেননা তা হয় অমৃত, নয় সুরা।

আমি বহুকাল হতে এই কথা বলে আসছি যে, বাঙ্গলা সাহিত্য বাঙ্গলা ভাষাতেই রচিত হওয়া উচিত। কিন্তু এই সহজ কথাটি অনেকের কাছে এতই দুর্ব্বোধ ঠেকে যে, তাঁরা এরূপ আজগুবি কথা শুনে বিরক্ত হন্। এঁদের মতে, বাঙ্গলা হচ্ছে আমাদের আটপৌরে

ভাষা, তাতে সাহিত্যের ভদ্রতা রক্ষা হয় না; সুতরাং সাহিত্যের জন্য সাধুভাষা নামক একটি পোষাকী ভাষা তৈরি করা চাই। পোষাক যখন চাইই, তখন তা যত ভারি আর যত জমকালো হয়, ততই ভাল। তাই সাহিত্যিকরা সংস্কৃত ভাষার চোরা জরিতে কিংখাব বুন্‌তে এতই ব্যগ্র ও এতই ব্যস্ত যে, সে জরি সাচ্চা কি ঝুঁটা, তা দিয়ে তাঁরা কিংখাব দূরে থাক্ দোসুতিও বুন্‌তে পারেন কি না,—পারলেও সে বুনানিতে ঐ জরি খাপ খায় কি না,—এ সব বিচার কর্‌বার তাঁদের সময় নেই। সুতরাং বাঙ্গলা লিখ্‌তে বল্‌লে তাঁরা মনে করেন যে, আমরা তাঁদের কাব্যের বস্ত্রহরণ কর্‌তে উদ্যত হয়েছি। কিন্তু আমরা যে ওরূপ কোনও গর্হিত আচরণ কর্‌তে চাইনে তার প্রমাণ,—ভাষা ভাবের লজ্জা নিবারণ কর্‌বার জিনিষ নয়। ভাষা বস্ত্র নয়, ভাবের দেহ,—আলঙ্কারিকদের ভাষায় যাকে বলে "কাব্যশরীর"। বাঙ্গালীর ভাষা বাঙ্গালী চৈতন্যের 'অধিষ্ঠান। বাঙ্গালীর আত্মাকে সংস্কৃত ভাষার দেহে কেহ প্রবেশ করিয়ে দিলে, ব্যাড়ীর আত্মা নন্দ ভূপতির দেহে প্রবেশ করে' যেরূপ দুর্দ্দশাগ্রস্ত হয়েছিল,—সেইরূপ হবারই সম্ভাবনা। দরিদ্র ব্রাহ্মণের আত্মা রাজার দেহে প্রবেশ করায় তার যে কি পর্য্যন্ত দুর্গতি, হয়েছিল, তার বিস্তৃত ইতিহাস কথাসরিৎসাগরে দেখতে পাবেন। বাঙ্গালীর স্কুলে-পড়ানো আত্মা কেন যে নিজের দেহপিঞ্জর হতে নিষ্ক্রমণ করে' পরের পঞ্জরে প্রবেশ লাভ কর্‌বার জন্য ছটফট কর্‌ছে, তার কারণ শাস্ত্রীমহাশয়ই নির্দ্দেশ করে দিয়েছেন। তিনি বলেছেন—

"আমার বিশ্বাস বাঙ্গালী একটি আত্মবিস্মৃত জাতি। বিষ্ণু যখন রামরূপে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন, তখন কোনও ঋষির শাপে তিনি আত্মবিস্মৃত ছিলেন।"

আমরাও তেমনি বাঙ্গালী জাতির অজ্ঞান অবতার,—সম্ভবতঃ গুরু-পুরোহিতের শাপে। মুক্তির জন্য আমাদের এই শাপমুক্ত হতে হবে, অর্থাৎ জাতিস্মর হতে হবে ;—কেননা সত্য লাভের জন্য যেমন বাহ্যজ্ঞান চাই, তেমনি আত্মজ্ঞানও চাই। এই জাতিস্মরতা লাভ করবার একমাত্র উপায় হচ্ছে ইতিহাস। একমাত্র ইতিহাসই জাতির পূর্ব্বজন্মের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। এই জাতীয় পূর্ব্বজন্মের জ্ঞান হারিয়েই আমরা নিজের ভাষার, মনের ও চরিত্রের জ্ঞান হারিয়েছি।

শাস্ত্রীমহাশয়ের মোদ্দা কথা হচ্ছে এই যে, এক "আর্য্য" শব্দের উপর জীবন প্রতিষ্ঠা করতে গেলে, বাঙ্গালীর ইহকাল পরকাল দুই নষ্ট হবে; কেন না আমরা মোক্ষমূলারের আবিষ্কৃত খাঁটি আর্য্য নই। আমরা একটি মিশ্র জাতি। প্রথমতঃ দ্রবিড় ও মংগলের মিশ্রণে বাঙ্গালী জাতি গঠিত হয়। তারপর সেই জাতির দেহে মনে ও সমাজে কতক পরিমাণ আর্য্যত্ব আরোপিত হয়েছে। কিন্তু তাই বলে' আমরা একেবারে আর্য্যমিশ্র হয়ে উঠিনি। শাস্ত্রীমহাশয়ের মতে আর্য্য-সভ্যতা, আবর্ত্তে আবর্ত্তে বাঙ্গলায় এসে পৌঁছেছে। তিনি বলেন—

"এই সকল আবর্ত্ত ঘুরিতে ঘুরিতে যখন বাঙ্গলায় আসিয়া উপনীত হয়, তখন দেখা যায় আর্য্যের মাত্রা বড়ই কম, দেশীর মাত্রা অনেক বেশী"।

এ সত্য আমি নিরাপত্তিতে স্বীকার করি, যদিচ সম্ভবতঃ আমি এই ক্রমাগত আর্য্য আবর্ত্তের একটি ক্ষুদ্র বুদ্বুদ ;—কেন না আমি ব্রাহ্মণ।

বাঙ্গলা ভাষা, আর্য্য ভাষা নয়,—উক্ত ভাষার একটি স্বতন্ত্র শাখা,—এক কথায় একটি নবশাখ ভাষা। বাঙ্গালী জাতিও আর্য্যজাতি

নয়,—একটি নবশাখ জাতি। আজকাল শিক্ষিত-সম্প্রদায়ের প্রধান চেষ্টা হয়েছে আমাদের মন ও ভাষার মধ্যে থেকে তার দেশী-খাঁদটুকু বাদ দিয়ে তার আর্য্য-সোনাটুকু বার করে নেওয়া। প্রথমতঃ ওরূপ খাদ বাদ দেওয়া সম্ভব নয়; দ্বিতীয়তঃ সম্ভব হলেও, বড় বেশি যে সোনা মিলবে তাও নয়। কিন্তু আসল প্রশ্ন হচ্ছে, দেশী অংশটুকু বাদ দেবার এত প্রাণপণ চেষ্টা কেন? ও ত খাদ নয়,—ওই ত হচ্ছে বাঙ্গালীজাতির মূল ধাতু! এবং সে ধাতু যে অবজ্ঞা কিম্বা উপেক্ষা করবার জিনিষ নয়, তা যিনিই বাঙ্গালীর প্রাচীন ইতিহাসের সন্ধান রাখেন, তিনিই মানেন। কাঁঠাল আম নয় বলে' দুঃখ কর্‌বারও কারণ নেই, এবং কাঁঠালের ডালে আমের কলম বসাবার চেষ্টা কর্‌বারও দরকার নেই। আমরা এই বাঙ্গলার গায়ে হয় ইংরাজি, নয় সংস্কৃতের কলম বসিয়ে, সাহিত্যে ও জীবনে শুধু কাঁঠালের আমসত্ব তৈরি করবার বৃথা চেষ্টা করছি।

শাস্ত্রীমহাশয় বলেছেন যে, বাঙ্গালীজাতির প্রাচীন সিদ্ধাচার্য্যেরা সব সহজিয়া মতের প্রবর্ত্তক ও প্রচারক ছিলেন। আমরা আত্মজ্ঞানশূন্য বলে', যা আমাদের কাছে সহজ তাই বর্জ্জন করি। আমরা সাধুভাষায় সাহিত্য লিখি; আর জীবনে হয় সাহেবিয়ানা নয় আর্য্যামী করি। জাতীয় আত্মজ্ঞান লাভ করতে পারলে, আমরা আবার সহজ অর্থাৎ natural হতে পারব। মনের এই সহজ-সাধন অতি কঠিন ব্যাপার; কেননা আমাদের সকল শিক্ষা দীক্ষা হচ্ছে কৃত্রিমতার সহায় ও সম্পদ।

(৪)

সাহিত্য-শাখার সভাপতি শ্রীযুক্ত যাদবেশ্বর তর্করত্নমহাশয়ও আমাদের বলেছেন যে—

"আলস্যের প্রশ্রয় দিলে হইবে না। নিদ্রিত সমাজকে জাগাইতে হইবে। শয্যাশয়ান সমাজের সুখসুপ্তি ভাঙ্গাইতে হইবে।"

এ যে শুধু কথার কথা নয় তার প্রমাণ, কি করে' সাহিত্যের সাহায্যে সমাজকে জাগিয়ে তুল্‌তে পারা যায়, তার পন্থা তিনি দেখিয়ে দিয়েছেন। তাঁর মোট কথা এই যে, দর্শন বিজ্ঞানের চর্চ্চা না করলে সাহিত্য শক্তিহীন ও শ্রীহীন হয়ে পড়ে। তর্করত্নমহাশয়ের মতে "সাহিত্য" শব্দের অর্থ সাহচর্য্য। যদি কেউ জিজ্ঞাসা করেন কিসের সাহচর্য্য? তার উত্তর—সকলপ্রকার জ্ঞানের সাহচর্য্য; কারণ অতি প্রবৃদ্ধ অজ্ঞতার গর্ভে যে সাহিত্য জন্মগ্রহণ করে তা সুকুমার সাহিত্য নয়, তা শুধু কুমার-সাহিত্য, অর্থাৎ ছেলেমানুষি লেখা। তিনি দেখিয়েছেন যে কালিদাস প্রভৃতি বড় বড় সংস্কৃত কবিরা সে যুগের সর্ব্বশাস্ত্রে সুপণ্ডিত ছিলেন। প্রমাণ শকুন্তলা,—অভিজ্ঞান, অবিজ্ঞান নয়। সংস্কৃত সাহিত্যের নানা যুক্ত শাস্ত্রের জ্ঞানের অভাববশতঃ আমরা সংস্কৃত কাব্য আধ বুঝি, সংস্কৃত দর্শন ভুল বুঝি, পুরাণকে ইতিহাস বলে' গণ্য করি, আর ধর্ম্মশাস্ত্রকে বেদবাক্য বলে মান্য করি।

সে যাই হোক, পাণ্ডিত্য কস্মিন্‌কালেও সাহিত্যের বিরোধী নয়। তার প্রমাণ কালিদাস, দান্তে, মিল্টন, গেটে প্রভৃতি। তবে পণ্ডিত অর্থে যদি বিদ্যার চিনির বলদ বোঝায়, তাহলে সে স্বতন্ত্র কথা। জ্ঞানই হচ্ছে কাব্যের ভিত্তি; কারণ সত্যের উপরেই সাহিত্য

প্রতিষ্ঠিত। তর্করত্নমহাশয়ের বক্তব্য এই যে, ইংরাজি ভাষায় যাকে বলে Synthetic Culture, তাই হচ্ছে সাহিত্যের পরম সহায়। এ কথা সম্পূর্ণ সত্য। ইউরোপের দর্শন, বিজ্ঞান, ইতিহাস, অর্থনীতি, সমাজতত্ত্ব, রাজনীতির সঙ্গে কতকটা পরিচয় না থাক্‌লে, কোনো বড় ইংরাজ কবি কিম্বা নভেলিষ্টের লেখা সম্পূর্ণ বোঝাও যায় না, তার রসও আস্বাদন করা যায় না। সাহিত্য হচ্ছে প্রবুদ্ধ চৈতন্যের বিকাশ; এবং চৈতন্যকে জাগিয়ে তুলতে হলে আর পাঁচজনের মনের আর পাঁচ রকমের জ্ঞানের ধাক্কা চাই। যাঁর মন সত্যের স্পর্শে সাড়া দেয় না—সে সত্য আধ্যাত্মিকই হোক্ আর আধিভৌতিকই হোক্—তিনি কবি নন। সুতরাং দর্শন বিজ্ঞানকে অস্পৃশ্য করে' তোলায় কাব্যের পবিত্রতা রক্ষা হয় না। এই কারণেই তর্করত্নমহাশয় আমাদের দেশী বিলাতি সকল প্রকার দর্শন বিজ্ঞান অনুবাদ কর্‌তে পরামর্শ দিয়েছেন। তাঁর মতে আলস্যপ্রিয় বাঙ্গালীমনের পক্ষে বিজ্ঞানচর্চ্চারূপ মানসিক ব্যায়াম হচ্ছে অত্যাবশ্যক। আমাদের অলস মনের আরাম-জনক বিশ্বাসসকল বিজ্ঞানের অগ্নিপরীক্ষায় পরিশুদ্ধ না হলে সত্যের খাঁটি সোনাতে তা পরিণত হবে না,—আর যা খাঁটি সোনা নয়, তার অলঙ্কার ধারণ করলে কাব্যের দেহও কলঙ্কিত হয়।

(৫)

এবারকার সাহিত্য-সম্মিলনের ফলে যদি বিজ্ঞানের সঙ্গে সাহিত্যের মিলন হয়,—তা হলে বঙ্গসাহিত্যের দেহ ও কান্তি দুই পুষ্ট হবে।

সে মিলন যে কবে হবে তা জানিনে। কিন্তু সত্যের সঙ্গে আমাদের ভাবের ও ভাষার বিচ্ছেদটি যে বহু লোকের নিকট অসহ্য হয়ে উঠেছে,—এইটি হচ্ছে মহা আশার কথা। মিথ্যার প্রতি আগে বিরাগ না জন্মালে কেউ সত্যের উদ্দেশে তীর্থযাত্রা করেন না; কারণ, সে পথে কষ্ট আছে। বিজ্ঞানের মন্দিরে, অর্থাৎ সত্যের মান-মন্দিরে পৌঁছতে হলে আগাগোড়া সিঁড়ি ভাঙ্গা চাই।

আমি বৈজ্ঞানিক নই,—কাজেই প্রত্যক্ষ-জ্ঞানই আমার মনের প্রধান সম্বল। সেই প্রত্যক্ষ-জ্ঞানের সম্বন্ধে সাহিত্যাচার্য্যেরা কেউ দুটি ভাল কথা বলেননি। তাই আমি তার স্বপক্ষে কিছু বল্‌তে বাধ্য হচ্ছি।

বিজ্ঞান প্রত্যক্ষ-জ্ঞানের অতিরিক্ত হলেও ঐ মূল জ্ঞানের উপরেই প্রতিষ্ঠিত। বাহ্য বস্তুকে ইন্দ্রিয়গোচর করতে হলে, ইন্দ্রিয়েরও একটা শিক্ষা চাই। অনেকে চোখ থাকতেও কাণা, কান থাকতেও কালা,—অথচ মুখ না থাক্‌লেও মূক নন। এই শ্রেণীর লোকের বাচালতার গুণেই আজ বাঙ্গলা-সাহিত্যের কোন মর্য্যাদা নেই। কাব্যকে আবার সাহিত্যের শীর্ষস্থান অধিকার করতে হলে, ইন্দ্রিয়কে আবার সজাগ করে' তোলা চাই। চোখও বাহ্যবস্তুসম্বন্ধে আমাদের ঠকাতে পারে, যদি সে চোখ ঘুমে ঢোলে। অপরপক্ষে ফ্যাল্‌ফ্যাল্‌ করে' চেয়ে থাকলেও, যা স্পষ্ট তাও আমাদের কাছে ঝাপ্‌সা হয়ে যায়। চোখে আর মনে এক না করতে পারলে, কোনও পদার্থ লক্ষ্য করা যায় না। ইন্দ্রিয় ও মনের এই একীকরণ, সাধনা বিনা সিদ্ধ হয় না। যাঁরা কাব্য রচনা করবেন, তাঁদের পক্ষে বাহিরের ভিতরের সকল সত্যকে প্রত্যক্ষ করবার ক্ষমতা অর্জ্জন করতে হবে। কারণ

কাব্যে প্রত্যক্ষ ব্যতীত অপর কোনও সত্যের স্থান নেই। সুতরাং প্রত্যক্ষ-জ্ঞানের উপর অবিশ্বাস এবং তার প্রতি অমনোযোগ হচ্ছে কাব্যে সকল সর্ব্বনাশের মূল। প্রত্যক্ষ-জ্ঞান অবশ্য নিজের সীমা লঙ্ঘন করলে মিথ্যা বিজ্ঞানে পরিণত হয়। বিজ্ঞানও তেমনি নিজের সীমা লঙ্ঘন করলে মিথ্যা তত্ত্বজ্ঞানে পরিণত হয়। তার কারণ, বিজ্ঞান কোনও পদার্থকে এক-হিসেবে দেখতে পারে না। বিজ্ঞান যে সমষ্টি খোঁজে, সে হচ্ছে সংখ্যার সমষ্টি। বিজ্ঞান চারকে এক করতে পারে না। বিজ্ঞান চারকে পাওয়ামাত্র,—হয় তাকে দুই দিয়ে ভাগ করে, নয় তার থেকে দুই বিয়োগ করে; পরে আবার হয় দুই দ্বিগুণে, নয় দুয়ে দুয়ে চার করে। অর্থাৎ বিজ্ঞান যার উপর হস্তক্ষেপ করে, তাকে আগে ভাঙ্গে, পরে আবার যোড়াতাড়া দিয়ে গড়ে। উদাহরণস্বরূপ দেখানো যেতে পারে যে, বিজ্ঞানের হাতে জল হয় বাষ্প হয়ে উড়ে যায়, নয় বরফ হয়ে জমে থাকে,—আর না হয়ত একভাগ অক্সিজেন আর দুভাগ হাইড্রোজেনে বিভক্ত হয়ে পড়ে। তারপর বিজ্ঞান আবার সেই বাষ্পকে ঠাণ্ডা করে', সেই বরফকে তাতিয়ে জল করে দেয়, এবং অক্সিজেনে হাইড্রোজেনে পুনর্ম্মিলন করে দেয়।

কিন্তু আমরা এক-নজরে যা দেখতে পাই, তাই হচ্ছে প্রত্যক্ষ জ্ঞান;—এ জ্ঞানও একের জ্ঞান,—অতএব প্রত্যক্ষজ্ঞান হচ্ছে তত্ত্বজ্ঞানের সবর্ণ। "ঈশাবাস্যমিদং সর্ব্বং যৎকিঞ্চ জগত্যাং জগৎ"—এ কথা তাঁরি কাছে সত্য, যাঁর কাছে এটি প্রত্যক্ষ সত্য। কেন না কোনরূপ আঁকের সাহায্যে কিম্বা মাপের সাহায্যে ও-সত্য পাওয়া যায় না। একত্বের জ্ঞান কেবলমাত্র অনুভূতিসাপেক্ষ।

আমি পূর্ব্বে বলেছি প্রত্যক্ষজ্ঞানের জন্য ইন্দ্রিয়গ্রামে মনঃসংযোগ করা চাই,—সেই মনঃসংযোগের জন্য আন্তরিক ইচ্ছা চাই,—এবং সেই ইচ্ছার মূলে আন্তরিক অনুরাগ চাই। এবং এ অনুরাগ অহৈতুকী প্রীতি হওয়া চাই। কোনরূপ স্বার্থসাধনের জন্য যে সত্য আমরা খুঁজি, তা কখনও সুন্দর হয়ে দেখা দেয় না। যে প্রীতির মূলে আমার সহজ প্রবৃত্তি নেই, তা কখনও অহৈতুকী হ'তে পারে না। সুতরাং সত্য যে সুন্দর, এই জ্ঞানলাভের উপায় হচ্ছে সহজ সাধন, অর্থাৎ সর্ব্বাপেক্ষা কঠিন সাধন;—কারণ আত্মার উপর বিশ্বাস আমরা হারিয়েছি।

সে যাই হোক, বিজ্ঞানের অবিরোধে যে প্রত্যক্ষ-জ্ঞানের চর্চ্চা করা যায়, এ বিশ্বাস হারালে আমরা কাব্য-শিল্প সৃষ্টি করতে পারি নে। বিজ্ঞান হচ্ছে পূর্ব্ব-সৃষ্ট পদার্থের জ্ঞান। নূতন সৃষ্টির হিসাব, বিজ্ঞানের পাকাখাতায় পাওয়া যায় না। সৃষ্টির মূলে যে চির-রহস্য আছে, তা কোনরূপ বৈজ্ঞানিক যন্ত্রে ধরা পড়ে না। এই কারণে দেশের লোককে বিজ্ঞানের চর্চ্চা করবার পরামর্শ দেওয়াটা সৎপরামর্শ, কেননা যা স্পষ্ট তাতে সর্ব্বসাধারণের সমান অধিকার আছে। অপরপক্ষে কাব্যে শিল্পে অধিকারীভেদ আছে। সত্যের মূর্ত্তিদর্শন সকলের ভাগ্যে ঘটে না।

শ্রীপ্রমথ চৌধুরী।

বাংলা ছন্দ *

* * * আপনি বলিয়াছেন আমাদের উচ্চারণের ঝোঁকটা বাক্যের আরম্ভে পড়ে;—ইহা আমি অনেক দিন পূর্ব্বে লক্ষ্য করিয়াছি। ইংরাজিতে প্রত্যেক শব্দেরই একটি নিজস্ব ঝোঁক আছে। সেই বিচিত্র ঝোঁকগুলিকে নিপুণভাবে ব্যবহার করার দ্বারাই আপনাদের ছন্দ সঙ্গীতে মুখরিত হইয়া উঠে। সংস্কৃত ভাষার ঝোঁক নাই কিন্তু দীর্ঘ হ্রস্ব স্বর ও যুক্ত ব্যঞ্জনবর্ণের মাত্রাবৈচিত্র্য আছে, তাহাতে সংস্কৃত ছন্দ ঢেউ খেলাইয়া উঠে। যথা—

অস্ত্যুত্তরস্যাং দিশি দেবতাত্মা

উক্ত বাক্যের যেখানে যেখানে যুক্ত ব্যঞ্জনবর্ণ বা দীর্ঘস্বর আছে সেখানেই ধ্বনি গিয়া বাধা পায়। সেই বাধার আঘাতে আঘাতে ছন্দ হিল্লোলিত হইয়া উঠে।

যে ভাষায় এইরূপ প্রত্যেক শব্দের একটি বিশেষ বেগ আছে সে ভাষার মস্ত সুবিধা এই যে, প্রত্যেক শব্দটিই নিজেকে জানান দিয়া যায়, কেহই পাশ কাটাইয়া আমাদের মনোযোগ এড়াইয়া যাইতে পারে না। এইজন্য যখন একটা বাক্য (Sentence) আমাদের সম্মুখে উপস্থিত হয় তখন তাহার উচ্চনীচতার বৈচিত্র্যবশত একটা সুস্পষ্ট চেহারা দেখিতে পাওয়া যায়। বাংলা বাক্যের অসুবিধা এই যে, একটা ঝোঁকের টানে একসঙ্গে অনেকগুলা শব্দ অনায়াসে আমাদের

---

* কেম্ব্রিজের বাংলা অধ্যাপক জে, ডি, এণ্ডার্সন, আই, সি, এস মহাশয়কে লিখিত পত্র হইতে অধ্যাপকমহাশয়ের অনুমতিক্রমে মুদ্রিত।

কানের উপর দিয়া পিছলাইয়া চলিয়া যায়; তাহাদের প্রত্যেকটার সঙ্গে সুস্পষ্ট পরিচয়ের সময় পাওয়া যায় না। ঠিক যেন আমাদের একান্নবর্ত্তী পরিবারের মত। বাড়ির কর্ত্তাটিকেই স্পষ্ট করিয়া অনুভব করা যায় কিন্তু তাঁহার পশ্চাতে তাঁহার কত পোষ্য আছে, তাহারা আছে কি নাই, তাহার হিসাব রাখিবার দরকার হয় না।

এইজন্য দেখা যায় আমাদের দেশে কথকতা যদিচ জনসাধারণকে শিক্ষা এবং আমোদ দিবার জন্য তথাপি কথকমহাশয় ক্ষণে ক্ষণে তাহার মধ্যে ঘনঘটাচ্ছন্ন সংস্কৃত সমাসের আমদানি করিয়া থাকেন। সে সকল শব্দ গ্রাম্যলোকেরা বোঝে না কিন্তু এই সমস্ত গম্ভীর শব্দের আওয়াজে তাহাদের মনটা ভাল করিয়া জাগিয়া ওঠে। বাংলা ভাষায় শব্দের মধ্যে আওয়াজ মৃদু বলিয়া অনেক সময় আমাদের কবিদিগকে দায়ে পড়িয়া অপ্রচলিত সংস্কৃত শব্দ ব্যবহার করিতে হয়।

এইজন্যই আমাদের যাত্রার ও পাঁচালির গানে ঘন ঘন অনুপ্রাস ব্যবহারের প্রথা আছে। সে অনুপ্রাস অনেক সময় অর্থহীন এবং ব্যাকরণবিরুদ্ধ; কিন্তু সাধারণ শ্রোতাদের পক্ষে তাহার প্রয়োজন এত অধিক যে, বাছ-বিচার করিবার সময় পাওয়া যায় না। নিরামিষ তরকারি রাঁধিতে হইলে ঝাল-মসলা বেশী করিয়া দিতে হয়, নহিলে স্বাদ পাওয়া যায় না। এই মসলা, পুষ্টির জন্য নহে; ইহা কেবলমাত্র রসনাকে তাড়া দিয়া উত্তেজিত করিবার জন্য। সেইজন্য দাশরথী রায়ের রামচন্দ্র যখন নিম্নলিখিত রীতিতে অনুপ্রাসচ্ছটা বিস্তার করিয়া বিলাপ করিতে থাকেন—

"অতি অগণ্য কাজে ছি ছি জঘন্য সাজে
ঘোর অরণ্য মাঝে কত কাঁদিলাম।"

তাহাতে শ্রোতার হৃদয় ক্ষুব্ধ হইয়া উঠে। আমাদের বন্ধু দীনেশবাবু-কর্ত্তৃক পরম-প্রশংসিত কৃষ্ণকমল গোস্বামী মহাশয়ের গানের মধ্যে নিম্নলিখিত প্রকারের আবর্জ্জনা ঝুড়ি ঝুড়ি চাপিয়া আছে। তাহাতে কাহাকেও বাধা দেয় না।

"পুনঃ যদি কোনক্ষণে দেখা দেয় কমলেক্ষণে
যতনে করে রক্ষণে জানাবি তৎক্ষণে।"

এখানে কমলেক্ষণ এবং রক্ষণ শব্দটাতে এ-কার যোগ করা একেবারেই নিরর্থক; কিন্তু অনুপ্রাসের বন্যার মুখে অমন কত এ-কার উ-কার স্থানে অস্থানে ভাসিয়া বেড়ায় তাহাতে কাহারো কিছু আসে যায় না।

একটা কথা মনে রাখিতে হইবে, বাংলা রামায়ণ, মহাভারত, অন্নদামঙ্গল, কবিকঙ্কণচণ্ডী প্রভৃতি সমস্ত পুরাতন-কাব্য গানের সুরে কীর্ত্তিত হইত। এই জন্য শব্দের মধ্যে যাহা কিছু ক্ষীণতা ও ছন্দের মধ্যে যাহা কিছু ফাঁক ছিল সমস্তই গানের সুরে ভরিয়া উঠিত; সঙ্গে সঙ্গে চামর দুলিত, করতাল চলিত এবং মৃদঙ্গ বাজিতে থাকিত। সেই সমস্ত বাদ দিয়া যখন আমাদের সাধুসাহিত্য-প্রচলিত ছন্দগুলি পড়িয়া দেখি, তখন দেখিতে পাই একে ত প্রত্যেক কথাটিতে স্বতন্ত্র ঝোঁক নাই, তাহাতে প্রত্যেক অক্ষরটি একমাত্রা বলিয়া গণ্য হইয়াছে। যেমন—

"মহাভারতের কথা অমৃত সমান।"

ইহাতে চোদ্দটি অক্ষরে চোদ্দ মাত্রা। সকল শব্দই মাথায় সমান। বাংলা দেশটি যেমন সমভূমি তাহার পয়ার ত্রিপদী ছন্দগুলিও সেইরূপ;—কোথাও ওঠানামা করিতে হয় না।

গানের পক্ষে ইহাই সুবিধা। বাংলার সমতল-ক্ষেত্রে নদীর ধারা

যেমন স্বচ্ছন্দে চারিদিকে শাখায় প্রশাখায় প্রসারিত হইয়াছে, তেমনি সম-মাত্রিক ছন্দে সুর আপন প্রয়োজন মত যেমন-তেমন করিয়া চলিতে পারে। কথাগুলা মাথা হেঁট করিয়া সম্পূর্ণ তাহার অনুগত হইয়া থাকে।

কিন্তু সুর হইতে বিযুক্ত করিয়া পড়িতে গেলে এই ছন্দগুলি একেবারে বিধবার মত হইয়া পড়ে। এই জন্য আজ পর্য্যন্ত বাংলা কবিতা পড়িতে হইলে আমরা সুর করিয়া পড়ি। এমন কি, আমাদের গদ্য-আবৃত্তিতেও যথেষ্ট পরিমাণে সুর লাগে। আমাদের ভাষার প্রকৃতি অনুসারেই এরূপ ঘটিয়াছে। আমাদের এই অভ্যাসবশত ইংরেজি পড়িবার সময়েও আমরা সুর লাগাই; ইংরেজের কানে নিশ্চয়ই তাহা অদ্ভুত লাগে।

কিন্তু আমাদের প্রত্যেক অক্ষরটিই যে বস্তুত একমাত্রার এ কথা সত্য নহে। যুক্ত বর্ণ এবং অযুক্ত বর্ণ কখনই একমাত্রার হইতে পারে না।

"কাশিরাম দাস কহে শুনে পুণ্যবান।"

"পুণ্যবান" শব্দটি "কাশিরাম" শব্দের সমান ওজনের নহে। কিন্তু আমরা প্রত্যেক বর্ণটিকে সুর করিয়া টানিয়া টানিয়া পড়ি বলিয়া আমাদের শব্দগুলির মধ্যে এতটা ফাঁক থাকে যে, হাল্কা ও ভারি দুই রকম শব্দই সমমাত্রা অধিকার করিতে পারে। যে সভায় চৌকি পাতিয়া মানুষ বসে, সেখানে প্রত্যেক চৌকির পরিমাপ সমান, সেই চৌকিতে যে মানুষগুলি বসে তাহারা মোটাই হউক, আর রোগাই হউক, সমান জায়গা জোড়ে। কিন্তু ফরাসের উপর গায়ে গায়ে যদি বসিতে হয় তবে ভিন্ন ভিন্ন লোক আপনার দেহের ভিন্ন ভিন্ন পরিমাণমত স্থান

দখল করে। আমাদের পয়ার ত্রিপদীতে শব্দগুলি অত্যন্ত সভ্য হইয়া চৌকির উপর বসিয়া গেছে।

Equality, Fraternity প্রভৃতি পদার্থগুলি খুব মূল্যবান বটে কিন্তু সেই জন্যই ঝুটা হইলে তাহা ত্যাজ্য হয়। আমাদের সাধুছন্দে বর্ণগুলির মধ্যে যে সাম্য ও সৌভ্রাত্র্য দেখা যায় তাহা গানের সুরে সাঁচ্চা হইতে পারে কিন্তু আবৃত্তি করিয়া পড়িবার প্রয়োজনে তাহা ঝুটা। এই কথাটা অনেকদিন আমার মনে বাজিয়াছে। কোনো কোনো কবি, ছন্দের এই দীনতা দূর করিবার জন্য বিশেষ জোর দিবার বেলায় বাংলা শব্দগুলিকে সংস্কৃতের রীতি অনুযায়ী স্বরের হ্রস্ব দীর্ঘ রাখিয়া ছন্দে বসাইবার চেষ্টা করিয়াছেন; ভারতচন্দ্রে তাহার দুই একটা নমুনা আছে, যথা :—

মহারুদ্র বেশে মহাদেব সাজে।

বৈষ্ণব কবিদের রচনায় এরূপ অনেক দেখা যায়, যেমন :—

সুন্দরি রাধে, আওয়ে বনি
ব্রজরমণীগণ-মুকুটমণি!

কিন্তু এগুলি বাংলা নয় বলিলেই হয়। ভারতচন্দ্র যেখানে সংস্কৃত ছন্দে লিখিয়াছেন, সেখানে তিনি বাংলা শব্দ যতদূর সম্ভব পরিত্যাগ করিয়াছেন এবং বৈষ্ণব কবিরা যে ভাষা ব্যবহার করিয়াছেন তাহা মৈথিলী ভাষার বিকার।

আমার বড়দাদা মাঝে মাঝে এ কাজ করিয়াছেন, কিন্তু তাহা কৌতুক করিয়া। যথা :—

ইচ্ছা সম্যক ভ্রমণ গমনে কিন্তু পাথেয় নাস্তি।
পায়ে শিক্লী মন উড় উড় এ কি দৈবেরি শাস্তি!

বাংলায় এ জিনিস চলিবে না; কারণ বাংলায় হ্রস্বদীর্ঘস্বরের পরিমাণভেদ সুব্যক্ত নহে। কিন্তু যুক্ত ও অযুক্ত বর্ণের মাত্রাভেদ বাংলাতেও না ঘটিয়া থাকিতে পারে না। এই কথা মনে রাখিয়া বহুকাল হইল আমি "মানসী" নামক কাব্যগ্রন্থে বাংলা ছন্দে যুক্ত-বর্ণকে দুইমাত্রা গণ্য করিয়া ছন্দ রচিবার দৃষ্টান্ত দেখাইয়াছি; এখন তাহা প্রচলিত হইয়াছে।

সংস্কৃতের সঙ্গে বাংলার একটা প্রভেদ এই যে, বাংলার প্রায় সর্ব্বত্রই শব্দের অন্তস্থিত অ-স্বরবর্ণের উচ্চারণ হয় না। যেমন—ফল, জল, মাঠ, ঘাট, চাঁদ, ফাঁদ, বাঁদর, আদর ইত্যাদি। ফল শব্দ বস্তুত একমাত্রার কথা। অথচ সাধু বাংলা ভাষার ছন্দে ইহাকে দুই মাত্রা বলিয়া ধরা হয়। অর্থাৎ ফলা এবং ফল বাংলা ছন্দে একই ওজনের। এইরূপে বাংলা সাধুছন্দে হসন্ত জিনিসটাকে একেবারে ব্যবহারে লাগান হয় না। অথচ জিনিসটা ধ্বনি উৎপাদনের কাজে ভারি মজবুৎ। হসন্ত শব্দটা স্বরবর্ণের বাধা পায় না বলিয়া পরবর্ত্তী শব্দের ঘাড়ের উপর পড়িয়া তাহাকে ধাক্কা দেয় ও বাজাইয়া তোলে। "করিতেছি" শব্দটা ভোঁতা। উহাতে কোনো সুর বাজে না; কিন্তু "কর্চ্চি" শব্দে একটা সুর আছে। "যাহা হইবার তাহাই হইবে" এই বাক্যের ধ্বনিটা অত্যন্ত ঢিলা; সেই জন্য ইহার অর্থের মধ্যেও একটা আলস্য প্রকাশ পায়। কিন্তু যখন বলা যায় "যা হবার তাই হবে" তখন "হবার" শব্দের হসন্ত-"র" "তাই" শব্দের উপর আছাড় খাইয়া একটা জোর জাগাইয়া তোলে; তখন উহার নাকী সুর ঘুচিয়া গিয়া ইহা হইতে একটা "মরিয়া" ভাবের আওয়াজ বাহির হয়। বাংলার হসন্ত-বর্জ্জিত সাধু ভাষাটা বাবুদের আদুরে ছেলেটার মত মোটাসোটা

গোলগাল; চর্ব্বির স্তরে তাহার চেহারাটা একেবারে ঢাকা পড়িয়া গেছে, এবং তাহার চিক্কণতা যতই থাক, তাহার জোর অতি অল্পই।

কিন্তু বাংলার অসাধু ভাষাটা খুব জোরালো ভাষা—এবং তাহার চেহারা বলিয়া একটা পদার্থ আছে। আমাদের সাধু ভাষার কাব্যে এই অসাধু ভাষাকে একেবারেই আমল দেওয়া হয় নাই; কিন্তু তাই বলিয়া অসাধু ভাষা যে বাসায় গিয়া মরিয়া আছে তাহা নহে। সে আউলের মুখে, বাউলের মুখে, ভক্ত কবিদের গানে, মেয়েদের ছড়ায় বাংলা দেশের চিত্তটাকে একেবারে শ্যামল করিয়া ছাইয়া রহিয়াছে। কেবল ছাপার কালীর তিলক পরিয়া সে ভদ্র-সাহিত্য-সভায় মোড়লি করিয়া বেড়াইতে পারে না। কিন্তু তাহার কণ্ঠে গান থামে নাই, তাহার বাঁশের বাঁশী বাজিতেছেই। সেই সব মেঠো-গানের ঝরণার তলায় বাংলা ভাষার হসন্ত-শব্দগুলা নুড়ির মত পরস্পরের উপর পড়িয়া ঠুন্ঠুন্ শব্দ করিতেছে। আমাদের ভদ্র সাহিত্য-পল্লীর গম্ভীর দীঘিটার স্থির জলে সেই শব্দ নাই;—সেখানে হসন্তর ঝঙ্কার বন্ধ।

আমার শেষ বয়সের কাব্য রচনায় আমি বাংলার এই চলতি ভাষার সুরটাকে ব্যবহারে লাগাইবার চেষ্টা করিয়াছি। কেননা দেখিয়াছি চলতি ভাষাটাই স্রোতের জলের মত চলে—তাহার নিজের একটি কলধ্বনি আছে। "গীতাঞ্জলি" হইতে আপনি আমার যে লাইনগুলি তুলিয়া দিয়াছেন তাহা আমাদের চল্‌তি ভাষার হসন্ত সুরের লাইন।

আমার্ সকল্ কাঁটা ধন্য করে
ফুট্‌বেগো ফুল্ ফুট্‌বে।
আমার্ সকল্ ব্যথা রঙীন্ হয়ে
গোলাপ্ হয়ে উঠ্‌বে।

আপনি লক্ষ্য করিয়া দেখিবেন এই ছন্দের প্রত্যেক গাঁঠে গাঁঠে একটি করিয়া হসন্তের ভঙ্গী আছে। "ধন্য" শব্দটার মধ্যেও একটা হসন্ত আছে। উহা "ধন্‌ন" এই বানানে লেখা যাইতে পারে। এইটে সাধুভাষার ছন্দে লিখিলাম—

যত কাঁটা মম সফল করিয়া ফুটিবে কুসুম ফুটিবে।
সকল বেদনা অরুণ বরণে গোলাপ হইয়া উঠিবে।

অথবা যুক্ত বর্ণকে যদি একমাত্রা বলিয়া ধরা যায় তবে এমন হইতে পারে—

সকল কণ্টক সার্থক করিয়া কুসুম স্তবক ফুটিবে।
বেদনা যন্ত্রণা রক্তমূর্ত্তি ধরি গোলাপ হইয়া উঠিবে।

এমনি করিয়া সাধুভাষার কাব্যসভায় যুক্তবর্ণের মৃদঙ্গটা আমরা ফুটা করিয়া দিয়াছি এবং হসন্তের বাঁশীর ফাঁকগুলি শিষা দিয়া ভর্ত্তি করিয়াছি। ভাষার নিজের অন্তরের স্বাভাবিক সুরটাকে রুদ্ধ করিয়া দিয়া বাহির হইতে সুর যোজনা করিতে হইয়াছে। সংস্কৃত ভাষার জরি-জহরতের ঝালরওয়ালা দেড় হাত দুই হাত ঘোমটার আড়ালে আমাদের ভাষাবধূটির চোখের জল মুখের হাসি সমস্ত ঢাকা পড়িয়া গেছে, তাহার কালো চোখের কটাক্ষে যে কত তীক্ষ্ণতা তাহা আমরা ভুলিয়া গেছি। আমি তাহার সেই সংস্কৃত ঘোমটা খুলিয়া দিবার কিছু সাধনা করিয়াছি, তাহাতে সাধুলোকেরা ছি ছি করিয়াছে। সাধু লোকেরা জরির আঁচলাটা দেখিয়া তাহার দর যাচাই করুক; আমার কাছে চোখের চাহনিটুকুর দর তাহার চেয়ে অনেক বেশি; সে যে বিনামূল্যের ধন, সে ভট্টাচার্য্যপাড়ার হাটে বাজারে মেলে না। * * *

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

আমরা চলি সমুখ পানে

আমরা চলি সমুখ পানে,
কে আমাদের বাঁধবে ?
রৈল যারা পিছুর টানে
কাঁদবে তারা কাঁদবে।

ছিঁড়ব বাধা রক্ত পায়ে,
চলব ছুটে রৌদ্রে ছায়ে,
জড়িয়ে ওরা আপন গায়ে
কেবলি ফাঁদ ফাঁদবে।
কাঁদবে ওরা কাঁদবে।

রুদ্র মোদের হাঁক দিয়েছে
বাজিয়ে আপন তূর্য্য।
মাথার পরে ডাক দিয়েছে
মধ্যদিনের সূর্য্য।

মন ছড়াল আকাশ ব্যেপে,
আলোর নেশায় গেছি ক্ষেপে,
ওরা আছে দুয়ার ঝেঁপে,
চক্ষু ওদের ধাঁধবে।
কাঁদবে ওরা কাঁদবে।

সাগর গিরি করবরে জয়
 'যাব তাদের লঙ্ঘি'।
একলা পথে করিনে ভয়,
 সঙ্গে ফেরেন সঙ্গী।
আপন ঘোরে আপ্‌নি মেতে
আছে ওরা গণ্ডি পেতে,
ঘর ছেড়ে আঙিনায় যেতে
 বাধবে ওদের বাধবে।
 কাঁদবে ওরা কাঁদবে।

জাগবে ঈশান, বাজ্‌বে বিষাণ
 পুড়বে সকল বন্ধ।
উড়বে হাওয়ায় বিজয় নিশান
 ঘুচবে দ্বিধাদ্বন্দ্ব।
মৃত্যুসাগর মথন করে
অমৃতরস আনব হরে',
ওরা জীবন আঁকড়ে ধরে
 মরণ-সাধন সাধবে।
 কাঁদবে ওরা কাঁদবে।

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

হৈমন্তী

'কন্যার বাপ সবুর করিতে পারিতেন কিন্তু বরের বাপ সবুর করিতে চাহিলেন না। তিনি দেখিলেন মেয়েটির বিবাহের বয়স পার হইয়া গেছে, কিন্তু আর কিছুদিন গেলে সেটাকে ভদ্র বা অভদ্র কোনো রকমে চাপা দিবার সময়টাও পার হইয়া যাইবে। মেয়ের বয়স অবৈধ রকমে বাড়িয়া গেছে বটে কিন্তু পণের টাকার আপেক্ষিক গুরুত্ব এখনো তাহার চেয়ে কিঞ্চিৎ উপরে আছে সেই জন্যই তাড়া।

আমি ছিলাম বর। সুতরাং বিবাহ সম্বন্ধে আমার মত যাচাই করা অনাবশ্যক ছিল। আমার কাজ আমি করিয়াছি; এফ,এ, পাশ করিয়া বৃত্তি পাইয়াছি। তাই প্রজাপতির দুই পক্ষ, কন্যাপক্ষ ও বরপক্ষ ঘন ঘন বিচলিত হইয়া উঠিল।

আমাদের দেশে যে-মানুষ একবার বিবাহ করিয়াছে বিবাহ সম্বন্ধে তাহার মনে আর কোনো উদ্বেগ থাকে না। নর-মাংসের স্বাদ পাইলে মানুষের সম্বন্ধে বাঘের যে দশা হয়, স্ত্রীর সম্বন্ধে তাহার ভাবটা সেইরূপ হইয়া উঠে। অবস্থা যেমনি ও বয়স যতই হউক স্ত্রীর অভাব ঘটিবামাত্র তাহা পূরণ করিয়া লইতে তাহার কোনো দ্বিধা থাকে না। যত দ্বিধা ও দুশ্চিন্তা, সে দেখি আমাদের নবীন ছাত্রদের। বিবাহের পৌনঃপুনিক প্রস্তাবে তাহাদের পিতৃপক্ষের পাকা চুল কলপের আশীর্ব্বাদে পুনঃপুনঃ কাঁচা হইয়া উঠে আর প্রথম ঘটকালির আঁচেই ইহাদের কাঁচা চুল ভাবনায় একরাত্রে পাকিবার উপক্রম হয়।

সত্য বলিতেছি আমার মনে এমন বিষম উদ্বেগ জন্মে নাই। বরঞ্চ

বিবাহের কথায় আমার মনের মধ্যে যেন দক্ষিণে হাওয়া দিতে লাগিল। কৌতূহলী কল্পনার কিশলয়গুলির মধ্যে একটা যেন কানাকানি পড়িয়া গেল। যাহাকে বার্কের ফ্রেঞ্চ রেভোল্যুশনের নোট পাঁচ সাত খাতা মুখস্থ করিতে হইবে তাহার পক্ষে এ ভাবটা দোষের। আমার এ লেখা যদি টেক্স্‌ট্‌বুক্‌ কমিটির অনুমোদিত হইবার কোনো আশঙ্কা থাকিত তবে সাবধান হইতাম।

কিন্তু এ কি করিতেছি? এ কি একটা গল্প যে উপন্যাস লিখিতে বসিলাম? এমন সুরে আমার লেখা সুরু হইবে এ আমি কি জানিতাম? মনে ছিল কয় বৎসরের বেদনার যে মেঘ কালো হইয়া জমিয়া উঠিয়াছে তাহাকে বৈশাখসন্ধ্যার ঝোড়ো বৃষ্টির মত প্রবল বর্ষণে নিঃশেষ করিয়া দিব। কিন্তু না পারিলাম বাংলায় শিশুপাঠ্য বই লিখিতে, কারণ সংস্কৃত মুগ্ধবোধ ব্যাকরণ আমার পড়া নাই; আর না পারিলাম কাব্য রচনা করিতে, কারণ, মাতৃভাষা আমার জীবনের মধ্যে এমন পুষ্পিত হইয়া উঠে নাই যাহাতে নিজের অন্তরকে বাহিরে টানিয়া আনিতে পারি। সেই জন্যই দেখিতেছি আমার ভিতরকার শ্মশানচারী সন্ন্যাসীটা অট্টহাস্যে আপনাকে আপনি পরিহাস করিতে বসিয়াছে। না করিয়া করিবে কি? তাহার যে অশ্রু শুকাইয়া গেছে। জ্যৈষ্ঠের খররৌদ্রই ত জ্যৈষ্ঠের অশ্রুশূন্য রোদন।

আমার সঙ্গে যাহার বিবাহ হইয়াছিল তাহার সত্য নামটা দিব না। কারণ পৃথিবীর ইতিহাসে তাহার নামটি লইয়া প্রত্নতাত্ত্বিকদের মধ্যে বিবাদের কোনো আশঙ্কা নাই। যে তাম্রশাসনে তাহার নাম খোদাই করা আছে সেটা আমার হৃদয়পট। কোনোকালে সে পট এবং সে নাম বিলুপ্ত হইবে এমন কথা আমি মনে করিতে পারি না। কিন্তু

যে অমৃতলোকে তাহা অক্ষয় হইয়া রহিল সেখানে ঐতিহাসিকের আনাগোনা নাই।

আমার এ লেখায় তাহার যেমন হউক একটা নাম চাই। আচ্ছা, তাহার নাম দিলাম শিশির। কেননা, শিশিরে কান্নাহাসি একেবারে এক হইয়া আছে,—আর শিশিরে ভোরবেলাটুকুর কথা সকাল বেলায় আসিয়া ফুরাইয়া যায়।

শিশির আমার চেয়ে কেবল দুই বছরের ছোট ছিল। অথচ আমার পিতা যে গৌরীদানের পক্ষপাতী ছিলেন না তাহা নহে। তাঁহার পিতা ছিলেন উগ্রভাবে সমাজবিদ্রোহী—দেশের প্রচলিত ধর্ম্মকর্ম্ম কিছুতে তাঁহার আস্থা ছিল না; তিনি কষিয়া ইংরাজি পড়িয়াছিলেন। আমার পিতা উগ্রভাবে সমাজের অনুগামী; মানিতে তাঁহার বাধে এমন জিনিষ আমাদের সমাজে সদরে বা অন্দরে, দেউড়ি বা খিড়কির পথে খুঁজিয়া পাওয়া দায়, কারণ ইনিও কষিয়া ইংরাজি পড়িয়াছিলেন। পিতামহ এবং পিতা উভয়েরই মতামত বিদ্রোহের দুই বিভিন্ন মূর্ত্তি। কোনোটাই সরল স্বাভাবিক নহে। তবুও বড় বয়সের মেয়ের সঙ্গে বাবা যে আমার বিবাহ দিলেন তাহার কারণ মেয়ের বয়স বড় বলিয়াই পণের অঙ্কটাও বড়। শিশির আমার শ্বশুরের একমাত্র মেয়ে। বাবার বিশ্বাস ছিল কন্যার পিতার সমস্ত টাকা ভাবী জামাতার ভবিষ্যতের গর্ভ পূরণ করিয়া তুলিতেছে।

আমার শ্বশুরের বিশেষ কোনো একটা মতের বালাই ছিল না। তিনি পশ্চিমের এক পাহাড়ের কোনো রাজার অধীনে বড় কাজ করিতেন। শিশির যখন কোলে তখন তাহার মার মৃত্যু হয়। মেয়ে বৎসর অন্তে এক এক বছর করিয়া বড় হইতেছে তাহা আমার শ্বশুরের

চোখেই পড়ে নাই। সেখানে তাঁহার সমাজের লোক এমন কেহই ছিল না, যে তাঁহাকে চোখে আঙুল দিয়া দেখাইয়া দিবে।

শিশিরের বয়স যথাসময়ে ষোলো হইল; কিন্তু সেটা স্বভাবের ষোলো সমাজের ষোলো নহে। কেহ তাহাকে আপন বয়সের জন্য সতর্ক হইতে পরামর্শ দেয় নাই সেও আপন বয়সটার দিকে ফিরিয়াও তাকাইত না।

কলেজে তৃতীয় বৎসরে পা দিয়াছি, আমার বয়স উনিশ,—এমন সময় আমার বিবাহ হইল। বয়সটা সমাজের মতে বা সমাজসংস্কারকের মতে উপযুক্ত কি না তাহা লইয়া তাহারা দুই পক্ষ লড়াই করিয়া রক্তারক্তি করিয়া মরুক কিন্তু আমি বলিতেছি সে বয়সটা পরীক্ষা পাস করিবার পক্ষে যত ভালো হউক, বিবাহের সম্বন্ধ আসিবার পক্ষে কিছুমাত্র কম ভালো নয়।

বিবাহের অরুণোদয় হইল একখানি ফোটোগ্রাফের আভাসে। পড়া মুখস্থ করিতেছিলাম। একজন ঠাট্টার সম্পর্কের আত্মীয়া আমার টেবিলের উপরে শিশিরের ছবিখানি রাখিয়া বলিলেন, এইবার সত্যিকার পড়া পড়—একেবারে ঘাড়মোড় ভাঙিয়া!

কোনো একজন আনাড়ি কারিগরের তোলা ছবি। মা ছিল না, সুতরাং কেহ তাহার চুল টানিয়া বাঁধিয়া, খোঁপায় জরি জড়াইয়া, সাহা বা মল্লিক কম্পানির জবড়জঙ্গ জ্যাকেট পরাইয়া বরপক্ষের চোখ ভুলাইবার জন্য জালিয়াতির চেষ্টা করে নাই। ভারি একখানি সাদাসিধা মুখ, সাদাসিধা দুটি চোখ, এবং সাদাসিধা একটি সাড়ি। কিন্তু সমস্তটি লইয়া কি যে মহিমা সে আমি বলিতে পারি না! যেমন-তেমন একখানি চৌকিতে বসিয়া, পিছনে একখানা ডোরা দাগকাটা

শতরঞ্চ ঝোলানো, পাশে একটা টিপাইয়ের উপরে ফুলদানিতে ফুলের তোড়া; আর গালিচার উপরে সাড়ির বাঁকা পাড়টির নীচে দুখানি খালি পা।

পটের ছবিটির উপর আমার মনের সোনার কাঠি লাগিতেই সে আমার জীবনের মধ্যে জাগিয়া উঠিল। সেই কালো দুটি চোখ আমার সমস্ত ভাবনার মাঝখানে কেমন করিয়া চাহিয়া রহিল। আর সেই বাঁকা পাড়ের নীচেকার দুখানি খালি পা আমার হৃদয়কে আপন পদ্মাসন করিয়া লইল।

পঞ্জিকার পাতা উল্টাইতে থাকিল—দুটা তিনটা বিবাহের লগ্ন পিছাইয়া যায় শ্বশুরের ছুটি আর মেলে না। ওদিকে সাম্‌নে একটা অকাল চার পাঁচটা মাস জুড়িয়া আমার আইবড় বয়সের সীমানাটাকে উনিশ বছর হইতে অনর্থক বিশ বছরের দিকে ঠেলিয়া দিবার চক্রান্ত করিতেছে। শ্বশুরের এবং তাঁহার মনিবের উপর রাগ হইতে লাগিল।

যা হউক, অকালের ঠিক পূর্ব্ব লগ্নটাতে আসিয়া বিবাহের দিন ঠেকিল। সেদিনকার সানাইয়ের প্রত্যেক তানটি যে আমার মনে পড়িতেছে। সেদিনকার প্রত্যেক মুহূর্ত্তটিকে আমি আমার সমস্ত চৈতন্য দিয়া স্পর্শ করিয়াছি;—আমার সেই উনিশ বছরের বয়সটি আমার জীবনে অক্ষয় হইয়া থাক্!

বিবাহ-সভায় চারিদিকে হট্টগোল—তাহারি মাঝখানে কন্যার কোমল হাতখানি আমার হাতের উপর পড়িল। এমন আশ্চর্য্য আর কি আছে! আমার মন বারবার করিয়া বলিতে লাগিল, আমি পাইলাম, আমি ইহাকে পাইলাম। কাহাকে পাইলাম? এ যে দুর্লভ, এ যে মানবী, ইহার রহস্যের কি অন্ত আছে?

আমার শ্বশুরের নাম গৌরীশঙ্কর। যে হিমালয়ে বাস করিতেন সেই হিমালয়ের তিনি যেন মিতা। তাঁহার গাম্ভীর্য্যের শিখরদেশে একটি স্থির হাস্য শুভ্র হইয়া ছিল। আর তাঁহার হৃদয়ের ভিতরটিতে স্নেহের যে একটি প্রস্রবণ ছিল তাহার সন্ধান যাহারা জানিত তাহারা তাঁহাকে ছাড়িতে চাহিত না।

কর্ম্মক্ষেত্রে ফিরিবার পূর্ব্বে আমার শ্বশুর আমাকে ডাকিয়া বলিলেন—বাবা আমার মেয়েটিকে আমি সতেরো বছর ধরিয়া জানি, আর তোমাকে এই ক'টি দিন মাত্র জানিলাম, তবু তোমার হাতেই ও রহিল। যে ধন দিলাম তাহার মূল্য যেন বুঝিতে পার ইহার বেশি আশীর্ব্বাদ আর নাই।

তাঁহার বেহাই বেহান সকলেই তাঁহাকে বারবার করিয়া আশ্বাস দিয়া বলিলেন, বেহাই, মনে কোনো চিন্তা রাখিয়ো না। তোমার মেয়েটি যেমন বাপকে ছাড়িয়া আসিয়াছে এখানে তেমনি বাপ মা উভয়কেই পাইল।

তাহার পরে শ্বশুরমশায় মেয়ের কাছে বিদায় লইবার বেলা হাসিলেন, বলিলেন, বুড়ি চলিলাম। তোর একখানি মাত্র এই বাপ, আজ হইতে ইহার যদি কিছু খোওয়া যায় বা চুরি যায় বা নষ্ট হয় আমি তাহার জন্য দায়ী নই।

মেয়ে বলিল, তাই বই কি! কোথাও একটু যদি লোকসান হয় তোমাকে তার ক্ষতি পূরণ করিতে হইবে।

অবশেষে নিত্য তাঁহার যে সব বিষয়ে বিভ্রাট ঘটে বাপকে সে সম্বন্ধে সে বারবার সতর্ক করিয়া দিল। আহার সম্বন্ধে আমার শ্বশুরের যথেষ্ট সংযম ছিল না; গুটিকয়েক অপথ্য ছিল তাহার প্রতি তাঁহার

বিশেষ আসক্তি; বাপকে সেই সমস্ত প্রলোভন হইতে যথাসম্ভব ঠেকাইয়া রাখা মেয়ের এক কাজ ছিল। তাই আজ সে বাপের হাত ধরিয়া উদ্বেগের সহিত বলিল—বাবা তুমি আমার কথা রেখো—রাখবে?

বাবা হাসিয়া কহিলেন, মানুষ পণ করে পণ ভাঙিয়া ফেলিয়া হাঁফ ছাড়িবার জন্য। অতএব কথা না দেওয়াই সব চেয়ে নিরাপদ।

তাহার পরে বাপ চলিয়া আসিলে ঘরে কপাট পড়িল। তাহার পরে কি হইল কেহ জানে না।

বাপ ও মেয়ের অশ্রুহীন বিদায়ব্যাপার পাশের ঘর হইতে কৌতূহলী অন্তঃপুরিকার দল দেখিল ও শুনিল। অবাক্ কাণ্ড! খোট্টার দেশে থাকিয়া খোট্টা হইয়া গেছে! মায়া মমতা একেবারে নাই!

আমার শ্বশুরের বন্ধু বনমালীবাবুই আমাদের বিবাহের ঘট্‌কালি করিয়াছিলেন। তিনি আমাদের পরিবারেরও পরিচিত। তিনি আমার শ্বশুরকে বলিয়াছিলেন—সংসারে তোমার ত ঐ একটি মেয়ে। এখন ইহাদেরি পাশে বাড়ি লইয়া এইখানেই জীবনটা কাটাও!

তিনি বলিলেল, যাহা দিলাম তাহা উজাড় করিয়াই দিলাম। এখন ফিরিয়া তাকাইতে গেলে দুঃখ পাইতে হইবে। অধিকার ছাড়িয়া দিয়া অধিকার রাখিতে যাইবার মত এমন বিড়ম্বনা আর নাই।

সব শেষে আমাকে নিভৃতে লইয়া গিয়া অপরাধীর মত সসঙ্কোচে বলিলেন—আমার মেয়েটির বই পড়িবার সখ, এবং লোকজনকে খাওয়াইতে ও বড় ভালবাসে। এজন্য বেহাইকে বিরক্ত করিতে ইচ্ছা করি না। আমি মাঝে মাঝে তোমাকে টাকা পাঠাইব। তোমার বাবা জানিতে পারিলে কি রাগ করিবেন?

প্রশ্ন শুনিয়া কিছু আশ্চর্য্য হইলাম। সংসারে কোনো একটা দিক

হইতে অর্থ সমাগম হইলে বাবা রাগ করিবেন তাঁহার মেজাজ এত খারাপ ত দেখি নাই।

যেন ঘুষ দিতেছেন এমনি ভাবে আমার হাতে একখানা একশো টাকার নোট গুঁজিয়া দিয়াই আমার শ্বশুর দ্রুত প্রস্থান করিলেন; আমার প্রণাম লইবার জন্য সবুর করিলেন না। পিছন হইতে দেখিতে পাইলাম এইবার পকেট হইতে রুমাল বাহির হইল।

আমি স্তব্ধ হইয়া বসিয়া ভাবিতে লাগিলাম। মনে বুঝিলাম, ইহারা অন্য জাতের মানুষ।

বন্ধুদের অনেককেই ত বিবাহ করিতে দেখিলাম। মন্ত্র পড়ার সঙ্গে সঙ্গেই স্ত্রীটিকে একেবারে একগ্রাসে গলাধঃকরণ করা হয়। পাকযন্ত্রে পৌঁছিয়া কিছুক্ষণ বাদে এই পদার্থটির নানা গুণাগুণ প্রকাশ হইতে পারে এবং ক্ষণে ক্ষণে আভ্যন্তরিক উদ্বেগ উপস্থিত হইয়াও থাকে, কিন্তু রাস্তাটুকুতে কোথাও কিছুমাত্র বাধে না। আমি কিন্তু বিবাহ-সভাতেই বুঝিয়াছিলাম দানের মন্ত্রে স্ত্রীকে যেটুকু পাওয়া যায় তাহাতে সংসার চলে কিন্তু পনেরো আনা বাকি থাকিয়া যায়। আমার সন্দেহ হয় অধিকাংশ লোকে স্ত্রীকে বিবাহমাত্র করে, পায় না, এবং জানেও না যে পায় নাই; তাহাদের স্ত্রীর কাছেও আমৃত্যুকাল এ খবর ধরা পড়ে না। কিন্তু সে যে আমার সাধনার ধন ছিল—সে আমার সম্পত্তি নয়, সে আমার সম্পদ।

শিশির—না, এ নামটা আর ব্যবহার করা চলিল না। একে ত এটা তাহার নাম নয় তাহাতে এটা তাহার পরিচয়ও নহে। সে সূর্য্যের মত ধ্রুব—সে ক্ষণজীবিনী উষার বিদায়ের অশ্রুবিন্দুটি নয়। কি হইবে গোপন রাখিয়া—তাহার আসল নাম হৈমন্তী।

দেখিলাম এই সতেরো বছরের মেয়েটির উপরে যৌবনের সমস্ত আলো আসিয়া পড়িয়াছে কিন্তু এখনো কৈশোরের কোল হইতে সে জাগিয়া উঠে নাই। ঠিক যেন শৈলচূড়ার বরফের উপর সকালের আলো ঠিকরিয়া পড়িয়াছে কিন্তু বরফ এখনো গলিল না। আমি জানি, কি অকলঙ্ক শুভ্র সে, কি নিবিড় পবিত্র!

আমার মনে একটা ভাবনা ছিল যে, লেখাপড়া-জানা বড় মেয়ে, কি জানি কেমন করিয়া তাহার মন পাইতে হইবে! কিন্তু অতি অল্প দিনেই দেখিলাম মনের রাস্তার সঙ্গে বইয়ের দোকানের রাস্তার কোনো জায়গায় কোনো কাটাকাটি নাই। কবে যে তাহার শাদা মনটির উপরে একটু রং ধরিল, চোখে একটু ঘোর লাগিল, কবে যে তাহার সমস্ত শরীর মন যেন উৎসুক হইয়া উঠিল তাহা ঠিক করিয়া বলিতে পারিব না।

এ ত গেল একদিকের কথা—আবার অন্যদিকও আছে—সেটা বিস্তারিত বলিবার সময় আসিয়াছে।

রাজসংসারে আমার শ্বশুরের চাকরি,—ব্যাঙ্কে যে তাঁহার কত টাকা জমিল সে সম্বন্ধে জনশ্রুতি নানা প্রকার অঙ্কপাত করিয়াছে কিন্তু কোনো অঙ্কটাই লাখের নীচে নামে নাই। ইহার ফল হইয়াছিল এই যে, তাহার পিতার দর যেমন যেমন বাড়িল, হৈমর আদরও তেমনি বাড়িতে থাকিল। আমাদের ঘরের কাজকর্ম্ম রীতিপদ্ধতি শিখিয়া লইবার জন্য সে ব্যগ্র, কিন্তু মা তাহাকে অত্যন্ত স্নেহে কিছুতেই হাত দিতে দিলেন না। এমন কি হৈমর সঙ্গে পাহাড় হইতে যে দাসী আসিয়াছিল যদিও তাহাকে নিজেদের ঘরে ঢুকিতে দিতেন না, তবু তাহার জাত সম্বন্ধে প্রশ্নমাত্র করিলেন না, পাছে বিশ্রী একটা উত্তর শুনিতে হয়।

এমনিভাবেই দিন চলিয়া যাইতে পারিত কিন্তু হঠাৎ একদিন বাবার মুখ ঘোর অন্ধকার দেখা গেল। ব্যাপারখানা এই—আমার বিবাহে আমার শ্বশুর পনেরো হাজার টাকা নগদ এবং পাঁচ হাজার টাকার গহনা দিয়াছিলেন। বাবা তাঁহার এক দালাল বন্ধুর কাছে খবর পাইয়াছেন, ইহার মধ্যে পনেরো হাজার টাকাই ধার করিয়া সংগ্রহ করিতে হইয়াছে—তাহার সুদও নিতান্ত সামান্য নহে। লাখটাকার গুজব ত একেবারেই ফাঁকি!

যদিও আমার শ্বশুরের সম্পত্তির পরিমাণসম্বন্ধে আমার বাবার সঙ্গে তাঁহার কোনোদিন কোনো আলোচনাই হয় নাই তবু বাবা জানি না কোন্ যুক্তিতে ঠিক করিলেন তাঁহার বেহাই তাঁহাকে ইচ্ছাপূর্ব্বক প্রবঞ্চনা করিয়াছেন।

তার পরে বাবার একটা ধারণা ছিল আমার শ্বশুর রাজার প্রধান মন্ত্রীগোছের একটা কিছু। খবর লইয়া জানিলেন, তিনি সেখানকার শিক্ষাবিভাগের অধ্যক্ষ। বাবা বলিলেন, অর্থাৎ ইস্কুলের হেডমাষ্টার;—সংসারে ভদ্র পদ যতগুলো আছে তাহার মধ্যে সব চেয়ে ওঁচা! বাবার বড় আশা ছিল শ্বশুর আজ বাদে কাল যখন কাজে অবসর লইবেন তখন আমিই রাজমন্ত্রী হইব।

এমন সময়ে রাস উপলক্ষ্যে দেশের কুটুম্বরা আমাদের কলিকাতার বাড়িতে আসিয়া জমা হইলেন। কন্যাকে দেখিয়া তাঁহাদের মধ্যে একটা কানাকানি পড়িয়া গেল। কানাকানি ক্রমে অস্ফুট হইতে স্ফুট হইয়া উঠিল। দূরসম্পর্কের কোনো এক দিদিমা বলিয়া উঠিলেন, পোড়া কপাল আমার! নাতবৌ যে বয়সে আমাকেও হার মানাইল।

আর এক দিদিমাশ্রেণীয়া বলিলেন, আমাদেরই যদি হার না মানাইবে তবে অপূ বাহির হইতে বউ আনিতে যাইবে কেন ?

আমার মা খুব জোরের সঙ্গে বলিয়া উঠিলেন,—ওমা, সে কি কথা! বৌমার বয়স সবে এগারো বই ত নয়, এই আস্‌চে ফাল্গুনে বারোয় পা দিবে। খোট্টার দেশে ডালরুটি খাইয়া মানুষ, তাই অমন বাড়ন্ত হইয়া উঠিয়াছে।

দিদিমারা বলিলেন, বাছা, এখনো চোখে এত কম ত দেখি না! কন্যাপক্ষ নিশ্চয় তোমাদের কাছে বয়স ভাঁড়াইয়াছে!

মা বলিলেন, আমরা যে কুষ্ঠি দেখিলাম।

কথাটা সত্য। কিন্তু কোষ্ঠীতেই প্রমাণ আছে মেয়ের বয়স সতেরো।

প্রবীণারা বলিলেন, কুষ্ঠিতে কি আর ফাঁকি চলে না ?

এই লইয়া ঘোর তর্ক, এমন কি, বিবাদ হইয়া গেল।

এমন সময়ে সেখানে হৈম আসিয়া উপস্থিত। কোনো এক দিদিমা জিজ্ঞাসা করিলেন, নাতবৌ তোমার বয়স কত বল ত।

মা তাহাকে চোখ টিপিয়া ইসারা করিলেন। হৈম তাহার অর্থ বুঝিল না, বলিল, সতেরো।

মা ব্যস্ত হইয়া বলিয়া উঠিলেন, তুমি জান না।

হৈম কহিল, আমি জানি আমার বয়স সতেরো।

দিদিমারা পরস্পর গা-টেপাটেপি করিলেন।

বধূর নির্ব্বুদ্ধিতায় রাগিয়া উঠিয়া মা বলিলেন, তুমি ত সব জান! তোমার বাবা যে বলিলেন তোমার বয়স এগারো।

হৈম চমকিয়া কহিল, বাবা বলিয়াছেন ? কখনো না!

মা কহিলেন, অবাক্ করিল! বেহাই আমার সামনে নিজের মুখে বলিলেন, আর মেয়ে বলে কখনো না!—এই বলিয়া আর একবার চোখ টিপিলেন।

এবার হৈম ইসারার মানে বুঝিল। স্বর আরো দৃঢ় করিয়া বলিল—বাবা এমন কথা কখনই বলিতে পারেন না।

মা গলা চড়াইয়া বলিলেন, তুই আমাকে মিথ্যাবাদী বলিতে চাস?

হৈম বলিল, আমার বাবা ত কখনোই মিথ্যা বলেন না।

ইহার পরে মা যতই গালি দিতে লাগিলেন কথাটার কালী ততই গড়াইয়া ছড়াইয়া চারিদিকে লেপিয়া গেল।

মা রাগ করিয়া বাবার কাছে তাঁহার বধূর মূঢ়তা এবং ততোধিক একগুঁয়েমির কথা বলিয়া দিলেন। বাবা হৈমকে ডাকিয়া বলিলেন, আইবড় মেয়ের বয়স সতেরো এটা কি খুব একটা গৌরবের কথা তাই ঢাক পিটিয়া বেড়াইতে হইবে? আমাদের এখানে এ সব চলিবে না বলিয়া রাখিতেছি।

হায়রে তাঁহার বউমার প্রতি বাবার সেই মধুমাখা পঞ্চম স্বর আজ একেবারে এমন বাজখাঁই খাদে নাবিল কেমন করিয়া?

হৈম ব্যথিত হইয়া প্রশ্ন করিল, কেহ যদি বয়স জিজ্ঞাসা করে কি বলিব?

বাবা বলিলেন, মিথ্যা বলিবার দরকার নাই, তুমি বলিয়ো আমি জানি না, আমার শাশুড়ি জানেন।

কেমন করিয়া মিথ্যা বলিতে না হয় সেই উপদেশ শুনিয়া হৈম এমনভাবে চুপ করিয়া রহিল যে বাবা বুঝিলেন তাঁহার সদুপদেশটা একেবারে বাজে খরচ হইল।

হৈমর দুর্গতিতে দুঃখ করিব কি, তাহার কাছে আমার মাথা হেঁট হইয়া গেল। সে দিন দেখিলাম শরৎ-প্রভাতের আকাশের মত তাহার চোখের সেই সরল উদার দৃষ্টি একটা কি সংশয়ে ম্লান হইয়া গেছে। ভীত হরিণীর মত সে আমার মুখের দিকে চাহিল। ভাবিল, আমি ইহাদিগকে চিনি না।

সে দিন একখানা সৌখীন বাঁধাই-করা ইংরাজি কবিতার বই তাহার জন্য কিনিয়া আনিয়াছিলাম। বইখানি সে হাতে করিয়া লইল এবং আস্তে আস্তে কোলের উপর রাখিয়া দিল, একবার খুলিয়া দেখিল না।

আমি তাহার হাতখানি তুলিয়া ধরিয়া বলিলাম, হৈম, আমার উপর রাগ করিয়োনা। আমি তোমার সত্যে কখনো আঘাত করিব না, আমি যে তোমার সত্যের বাঁধনে বাঁধা।

হৈম কিছু না বলিয়া একটুখানি হাসিল। সে হাসি বিধাতা যাহাকে দিয়াছেন তাহার কোনো কথা বলিবার দরকার নাই।

পিতার আর্থিক উন্নতির পর হইতে দেবতার অনুগ্রহকে স্থায়ী করিবার জন্য নূতন উৎসাহে আমাদের বাড়িতে পূজার্চ্চনা চলিতেছে। এ পর্য্যন্ত সে সমস্ত ক্রিয়াকর্ম্মে বাড়ির বধূকে ডাক পড়ে নাই। নূতন বধূর প্রতি একদিন পূজা সাজাইবার আদেশ হইল—সে বলিল, মা, বলিয়া দাও কি করিতে হইবে?

ইহাতে কাহারো মাথায় আকাশ ভাঙিয়া পড়িবার কথা নয় কারণ সকলেরই জানা ছিল মাতৃহীন প্রবাসে কন্যা মানুষ। কিন্তু কেবলমাত্র হৈমকে লজ্জিত করাই এই আদেশের হেতু। সকলেই গালে হাত দিয়া বলিল, ওমা, এ কি কাণ্ড! এ কোন্ নাস্তিকের ঘরের মেয়ে! এবার এ সংসার হইতে লক্ষ্মী ছাড়িল, আর দেরি নাই।

এই উপলক্ষ্যে হৈমর বাপের উদ্দেশে যাহা-না-বলিবার তাহা বলা হইল। যখন হইতে কটুকথার হাওয়া দিয়াছে হৈম একেবারে চুপ করিয়া সমস্ত সহ্য করিয়াছে। একদিনের জন্য কাহারও সামনে সে চোখের জলও ফেলে নাই। আজ তাহার বড় বড় দুই চোখ ভাসাইয়া দিয়া জল পড়িতে লাগিল। সে উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিল, আপনারা জানেন সে দেশে আমার বাবাকে সকলে ঋষি বলে?

ঋষি বলে! ভারি একটা হাসি পড়িয়া গেল। ইহার পরে তাহার পিতার উল্লেখ করিতে হইলে প্রায়ই বলা হইত, তোমার ঋষিবাবা! এই মেয়েটির সকলের চেয়ে দরদের জায়গাটি যে কোথায় তাহা আমাদের সংসার বুঝিয়া লইয়াছিল।

বস্তুত আমার শ্বশুর ব্রাহ্মও নন্, খৃষ্টানও নন্, হয় ত বা নাস্তিকও না হইবেন। দেবার্চ্চনার কথা কোনোদিন তিনি চিন্তাও করেন নাই। মেয়েকে তিনি অনেক পড়াইয়াছেন শুনাইয়াছেন কিন্তু কোনোদিনের জন্য দেবতাসম্বন্ধে তিনি তাহাকে কোনো উপদেশ দেন নাই। বনমালী বাবু এ. লইয়া তাঁহাকে একবার প্রশ্ন করিয়াছিলেন। তিনি বলিয়াছিলেন, আমি যাহা বুঝি না তাহা শিখাইতে গেলে কেবল কপটতা শেখানো হইবে।

অন্তঃপুরে হৈমর একটি প্রকৃত ভক্ত ছিল—সে আমার ছোট বোন নারাণী। বৌদিদিকে ভালবাসে বলিয়া তাহাকে অনেক গঞ্জনা সহিতে হইয়াছিল। সংসারযাত্রায় হৈমর সমস্ত অপমানের পালা আমি তাহার কাছেই শুনিতে পাইতাম। একদিনের জন্যও আমি হৈমর কাছে শুনি নাই। এসব কথা সঙ্কোচে সে মুখে আনিতে পারিত না। সে সঙ্কোচ নিজের জন্য নহে।

হৈম তাহার বাপের কাছ হইতে যত চিঠি পাইত সমস্ত আমাকে পড়িতে দিত। চিঠিগুলি ছোট কিন্তু রসে ভরা। সেও বাপকে যত চিঠি লিখিত সমস্ত আমাকে দেখাইত। বাপের সঙ্গে তাহার সম্বন্ধটিকে আমার সঙ্গে ভাগ করিয়া না লইলে তাহার দাম্পত্য যে পূর্ণ হইতে পারিত না। তাহার চিঠিতে শ্বশুরবাড়ি সম্বন্ধে কোনো নালিশের ইসারাটুকুও ছিল না। থাকিলে বিপদ ঘটিতে পারিত। নারাণীর কাছে শুনিয়াছি শ্বশুরবাড়ির কথা কি লেখে জানিবার জন্য মাঝে মাঝে তাহার চিঠি খোলা হইত।

চিঠির মধ্যে অপরাধের কোনো প্রমাণ না পাইয়া উপরওয়ালাদের মন যে শান্ত হইয়াছিল তাহা নহে। বোধ করি তাহাতে তাঁহারা আশাভঙ্গের দুঃখই পাইয়াছিলেন। বিষম বিরক্ত হইয়া তাঁহারা বলিতে লাগিলেন, এত ঘন ঘন চিঠিই বা কিসের জন্য? বাপই যেন সব, আমরা কি কেহ নই? এই লইয়া অনেক অপ্রিয় কথা চলিতে লাগিল। আমি ক্ষুব্ধ হইয়া হৈমকে বলিলাম—তোমার বাবার চিঠি আর কাহাকেও না দিয়া আমাকেই দিয়ো। কলেজে যাইবার সময় আমি পোষ্ট করিয়া দিব।

হৈম বিস্মিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, কেন?

আমি লজ্জায় তাহার উত্তর দিলাম না।

বাড়িতে এখন সকলে বলিতে আরম্ভ করিল—এইবার অপূর মাথা খাওয়া হইল। বি, এ, ডিগ্রি শিকায় তোলা রহিল। ছেলেরই বা দোষ কি?

সে ত বটেই। দোষ সমস্তই হৈমর। তাহার দোষ যে তাহার বয়স সতেরো, তাহার দোষ যে আমি তাহাকে ভালবাসি, তাহার

দোষ যে বিধাতার এই বিধি, তাই আমার হৃদয়ের রন্ধ্রে রন্ধ্রে সমস্ত আকাশ আজ বাঁশি বাজাইতেছে।

বি, এ, ডিগ্রি অকাতর চিত্তে আমি চুলায় দিতে পারিতাম কিন্তু হৈমর কল্যাণে পণ করিলাম পাস করিবই এবং ভালো করিয়াই পাস করিব। এ পণ রক্ষা করা আমার সে অবস্থায় যে সম্ভবপর বোধ হইয়াছিল তাহার দুইটি কারণ ছিল—এক ত হৈমর ভালবাসার মধ্যে এমন একটি আকাশের বিস্তার ছিল যে, সঙ্কীর্ণ আসক্তির মধ্যে সে মনকে জড়াইয়া রাখিত না, সেই ভালবাসার চারিদিকে ভারি একটি স্বাস্থ্যকর হাওয়া বহিত। দ্বিতীয়, পরীক্ষার জন্য যে বইগুলি পড়ার প্রয়োজন তাহা হৈমর সঙ্গে একত্রে মিলিয়া পড়া অসম্ভব ছিল না।

পরীক্ষা পাসের উদ্যোগে কোমর বাঁধিয়া লাগিলাম। একদিন রবিবার মধ্যাহ্নে বাহিরের ঘরে বসিয়া মার্টিনোর চরিত্রতত্ত্ব বইখানার বিশেষ বিশেষ লাইনের মধ্যপথগুলা ফাড়িয়া ফেলিয়া নীল পেন্সিলের লাঙল চালাইতেছিলাম এমন সময় বাহিরের দিকে হঠাৎ আমার চোখ পড়িল।

আমার ঘরের সমুখে আঙিনার উত্তর দিকে অন্তঃপুরে উঠিবার একটা সিঁড়ি। তাহারই গায়ে গায়ে মাঝে মাঝে গরাদে দেওয়া এক একটা জানলা। দেখি তাহারই একটি জানলায় হৈম চুপ করিয়া বসিয়া পশ্চিমের দিকে চাহিয়া। সেদিকে মল্লিকদের বাগানে কাঞ্চন গাছ গোলাপি ফুলে আচ্ছন্ন।

আমার বুকে ধক্ করিয়া একটা ধাক্কা দিল—মনের মধ্যে একটা অনবধানতার আবরণ ছিঁড়িয়া পড়িয়া গেল। এই নিঃশব্দ গভীর বেদনার রূপটি আমি এতদিন এমন স্পষ্ট করিয়া দেখি নাই।

কিছু না, আমি কেবল তাহার বসিবার ভঙ্গীটুকু দেখিতে পাইতে-ছিলাম। কোলের উপরে, একটি হাতের উপর আর একটি হাত স্থির পড়িয়া আছে, মাথাটি দেয়ালের উপরে হেলানো, খোলা চুল বামং কাঁধের উপর দিয়া বুকের উপর ঝুলিয়া পড়িয়াছে। আমার বুকের ভিতরটা হুহু করিয়া উঠিল।

আমার নিজের জীবনটা এমনি কানায় কানায় ভরিয়াছে যে, আমি কোথাও কোনো শূন্যতা লক্ষ্য করিতে পারি নাই। আজ হঠাৎ আমার অত্যন্ত নিকটে অতি বৃহৎ একটা নৈরাশ্যের গহ্বর দেখিতে পাইলাম। কেমন করিয়া কি দিয়া আমি তাহা পূরণ করিব?

আমাকে ত কিছুই ছাড়িতে হয় নাই। না আত্মীয়, না অভ্যাস, না কিছু। হৈম যে সমস্ত ফেলিয়া আমার কাছে আসিয়াছে। সেটা কতখানি তাহা আমি ভালো করিয়া ভাবি নাই। আমাদের সংসারে অপমানের কণ্টক-শয়নে সে বসিয়া; সে শয়ন আমিও তাহার সঙ্গে ভাগ করিয়া লইয়াছি। সেই দুঃখে হৈমর সঙ্গে আমার যোগ ছিল, তাহাতে আমাদিগকে পৃথক করে নাই। কিন্তু এই গিরিনন্দিনী সতেরো বৎসর কাল অন্তরে বাহিরে কত বড় একটা মুক্তির মধ্যে মানুষ হইয়াছে! কি নির্ম্মল সত্যে এবং উদার আলোকে তাহার প্রকৃতি এমন ঋজু শুভ্র ও সবল হইয়া উঠিয়াছে। তাহা হইতে হৈম যে কিরূপ নিরতিশয় ও নিষ্ঠুররূপে বিচ্ছিন্ন হইয়াছে এতদিন তাহা আমি সম্পূর্ণ অনুভব করিতে পারি নাই, কেননা সেখানে তাহার সঙ্গে আমার সমান আসন ছিল না।

হৈম যে অন্তরে অন্তরে মুহূর্ত্তে মুহূর্ত্তে মরিতেছিল। তাহাকে আমি সব দিতে পারি কিন্তু মুক্তি দিতে পারি না,—তাহা আমার

নিজের মধ্যে কোথায় ? সেইজন্যই কলিকাতার গলিতে ঐ গরাদের ফাঁক দিয়া নির্ব্বাক্ আকাশের সঙ্গে তাহার নির্ব্বাক্ মনের কথা হয় ; এবং এক একদিন রাত্রে হঠাৎ জাগিয়া উঠিয়া দেখি, সে বিছানায় নাই ; হাতের উপর মাথা রাখিয়া আকাশভরা তারার দিকে মুখ তুলিয়া ছাতে শুইয়া আছে।

মার্টিনো পড়িয়া রহিল। ভাবিতে লাগিলাম কি করি ? শিশুকাল হইতে বাবার কাছে আমার সঙ্কোচের অন্ত ছিল না। কখনো মুখামুখি তাঁহার কাছে দরবার করিবার সাহস বা অভ্যাস আমার ছিল না। সেদিন থাকিতে পারিলাম না। লজ্জার মাথা খাইয়া তাঁহাকে বলিয়া বসিলাম, বৌয়ের শরীর ভালো নয় তাহাকে একবার বাপের কাছে পাঠাইলে হয়।

বাবা ত একেবারে হতবুদ্ধি। মনে লেশমাত্র সন্দেহ রহিল না যে হৈমই এইরূপ অভূতপূর্ব্ব স্পর্দ্ধায় আমাকে প্রবর্ত্তিত করিয়াছে। তখনি তিনি উঠিয়া অন্তঃপুরে গিয়া হৈমকে জিজ্ঞাসা করিলেন—বলি বৌমা তোমার অসুখটা কিসের ?

হৈম বলিল, অসুখ ত নাই।

বাবা ভাবিলেন এ উত্তরটা তেজ দেখাইবার জন্যে।

কিন্তু হৈমর শরীরও যে দিনে দিনে শুকাইয়া যাইতেছিল তাহা আমরা প্রতিদিনের অভ্যাসবশতই বুঝি নাই। একদিন বনমালীবাবু তাহাকে দেখিয়া চমকিয়া উঠিলেন—অ্যাঁ, এ কি ? হৈমী, এ কেমন চেহারা তোর ? অসুখ করে নাই ত ?

হৈম কহিল, না।

এই ঘটনার দিনদশেক পরেই বলা নাই কহা নাই হঠাৎ আমার

শ্বশুর আসিয়া উপস্থিত। হৈমর শরীরের কথাটা নিশ্চয় বনমালীবাবু তাঁহাকে লিখিয়াছিলেন।

বিবাহের পর বাপের কাছে বিদায় লইবার সময় মেয়ে আপনার অশ্রু চাপিয়া নিয়াছিল। এবার মিলনের দিন বাপ যেমনি তাহার চিবুক ধরিয়া মুখটি তুলিয়া ধরিলেন অমনি হৈমর চোখের জল আর মানা মানিল না। বাপ একটি কথা বলিতে পারিলেন না—জিজ্ঞাসা পর্য্যন্ত করিলেন না, কেমন আছিস? আমার শ্বশুর তাঁহার মেয়ের মুখে এমন একটা কিছু দেখিয়াছিলেন যাহাতে তাঁহার বুক ফাটিয়া গেল।

হৈম বাবার হাত ধরিয়া তাঁহাকে শোবার ঘরে লইয়া গেল। অনেক কথা যে জিজ্ঞাসা করিবার আছে। তাহার বাবারও যে শরীর ভালো দেখাইতেছে না।

বাবা জিজ্ঞাসা করিলেন—বুড়ি আমার সঙ্গে যাবি?

হৈম কাঙালের মত বলিয়া উঠিল—যাব।

বাপ বলিলেন, আচ্ছা সব ঠিক করিতেছি।

শ্বশুর যদি অত্যন্ত উদ্বিগ্ন হইয়া না থাকিতেন তাহা হইলে এবাড়িতে ঢুকিয়াই বুঝিতে পারিতেন এখানে তাঁহার আর সেদিন নাই। হঠাৎ তাঁহার আবির্ভাবকে উপদ্রব মনে করিয়া বাবা ত ভালো করিয়া কথাই কহিলেন না। আমার শ্বশুরের মনে ছিল তাঁহার বেহাই একদা তাঁহাকে বারবার করিয়া আশ্বাস দিয়াছিলেন যে, যখন তাঁহার খুসি মেয়েকে তিনি বাড়ি লইয়া যাইতে পারিবেন। এ সত্যের অন্যথা হইতে পারে সে কথা তিনি মনেও আনিতে পারেন নাই।

বাবা তামাক টানিতে টানিতে বলিলেন, বেহাই, আমি ত কিছু বলিতে পার্ছি না, একবার তাহলে বাড়ির মধ্যে—

বাড়ির মধ্যের উপর বরাৎ দেওয়ার অর্থ কি আমার জানা ছিল। বুঝিলাম কিছু হইবে না। কিছু হইলও না।

বৌমার শরীর ভালো নাই! এত বড় অন্যায় অপবাদ!

শ্বশুরমশায় স্বয়ং একজন ভালো ডাক্তার আনিয়া পরীক্ষা করাইলেন। ডাক্তার বলিলেন, বায়ু পরিবর্ত্তন আবশ্যক, নহিলে হঠাৎ একটা শক্ত ব্যামো হইতে পারে।

বাবা হাসিয়া কহিলেন, হঠাৎ একটা শক্ত ব্যামো ত সকলেরই হইতে পারে। এটা কি আবার একটা কথা?

আমার শ্বশুর কহিলেন, জানেন ত উনি একজন প্রসিদ্ধ ডাক্তার—উঁহার কথাটা কি—

বাবা কহিলেন, অমন ঢের ডাক্তার দেখিয়াছি। দক্ষিণার জোরে সকল পণ্ডিতেরই কাছে সব বিধান মেলে এবং সকল ডাক্তারেরই কাছে সব রোগের সার্টিফিকেট পাওয়া যায়।

এই কথাটা শুনিয়া আমার শ্বশুর একেবারে স্তব্ধ হইয়া গেলেন। হৈম বুঝিল তাহার বাবার প্রস্তাব অপমানের সহিত অগ্রাহ্য হইয়াছে। তাহার মন একেবারে কাঠ হইয়া গেল।

আমি আর সহিতে পারিলাম না। বাবার কাছে গিয়া বলিলাম, হৈমকে আমি লইয়া যাইব।

বাবা গর্জ্জিয়া উঠিলেন—বটেরে, ইত্যাদি ইত্যাদি!

বন্ধুরা কেহ কেহ আমাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছেন, যাহা বলিলাম তাহা করিলাম না কেন—স্ত্রীকে লইয়া জোর করিয়া বাহির হইয়া গেলেই ত হইত। গেলাম না কেন? কেন! যদি লোকধর্ম্মের কাছে সত্যধর্ম্মকে না ঠেলিব, যদি ঘরের কাছে ঘরের মানুষকে বলি

দিতে না পারিব তবে আমার রক্তের মধ্যে বহুযুগের যে শিক্ষা তাহা কি করিতে আছে? জান তোমরা, যেদিন অযোধ্যার লোকেরা সীতাকে বিসর্জ্জন দিবার দাবী করিয়াছিল তাহার মধ্যে আমিও যে ছিলাম। আর সেই বিসর্জ্জনের গৌরবের কথা যুগে যুগে যাহারা গান করিয়া আসিয়াছে আমিও যে তাহাদের মধ্যে একজন। আর আমিই ত সেদিন, লোকরঞ্জনের জন্য স্ত্রীপরিত্যাগের গুণ বর্ণনা করিয়া মাসিক পত্রে প্রবন্ধ লিখিয়াছি! বুকের রক্ত দিয়া আমাকে যে একদিন দ্বিতীয় সীতাবিসর্জ্জনের কাহিনী লিখিতে হইবে সে কথা কে জানিত?

পিতায় কন্যায় আর একবার বিদায়ের ক্ষণ উপস্থিত হইল। এই-বারেও দুই জনেরই মুখে হাসি। কন্যা হাসিতে হাসিতেই ভৎ‍র্সনা করিয়া বলিল, বাবা আর যদি কখনো তুমি আমাকে দেখিবার জন্য এমন ছুটাছুটি করিয়া এ বাড়িতে আস তবে আমি ঘরে কপাট দিব।

বাপ হাসিতে হাসিতেই বলিলেন, ফের যদি আসি তবে সিঁধকাটি সঙ্গে করিয়াই আসিব।

ইহার পরে হৈমর মুখে তাহার চিরদিনের সেই স্নিগ্ধ হাসিটুকু আর একদিনের জন্যও দেখি নাই।

তাহারো পরে কি হইল সে কথা আর বলিতে পারিব না।

শুনিতেছি মা পাত্রী সন্ধান করিতেছেন। হয় ত একদিন মার অনুরোধ অগ্রাহ্য করিতে পারিব না ইহাও সম্ভব হইতে পারে! কারণ, —থাক্ আর কাজ কি!

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

গমনাগমন

মিশনারি বন্ধু আমার কোণার্ক যাত্রার নাম শুনিয়াই বিচলিত হইয়া উঠিলেন ; এবং কিঞ্চিৎ মুখভঙ্গীসহকারে বলিয়া উঠিলেন—"সে স্থানে কি দর্শনীয় আছে !" মিশনারিটি সেই ধরণের লোক, গির্জ্জা তুলিয়া যাঁহারা জগবন্ধুর মন্দির দমাইতে উদ্যত, নাচ যাঁহাদের চক্ষুশূল, গান যাঁহাদের কাছে কুরুচি, কদম্বতরু অশ্লীল বৃক্ষ এবং কৃষ্ণলীলা তদপেক্ষা অধিক কিছু ! এরূপ বন্ধুর সহবাসও যে সময়ে সময়ে আমাদের অরুচিকর হইয়া পড়ে এবং যেটা তাঁহারা দর্শনীয় বলেন না সেটাই আমাদের কাছে আদরণীয় হইয়া থাকে—এটা আমার বন্ধুকে বুঝাইতে সময়ের বৃথা অপব্যয় না করিয়া আমি এবারে সত্যই কোণার্ক যাইবার আয়োজন করিলাম,—ঠিক সেইগুলাই দেখিতে, পাদরী সাহেবের মতে যেগুলা মোটেই দর্শনীয় নয়।

বছুরকতক পূর্ব্বে আমি "পুরীর পত্রে" শ্রীক্ষেত্র সম্বন্ধে যে ভবিষ্যৎ-বাণী করিয়াছিলাম তাহা সফল হইয়াছে। হোটেলে, মোটরগাড়িতে, বৈদ্যুতিক আলোয়, পুরী অন্ধকার হইয়াছে এবং সুরুচিসঙ্গত সাহেবী পিয়ানোবাদ্যের টুং টাং ধ্বনিতে সাগরের কল্লোল চাপা পড়িয়াছে !

সুতরাং মোগলাই জোব্বার উপরে প্রকাণ্ড একটা সাহেবী সোলা-টুপি চাপাইয়া, একগাছা মোটা লাঠি ও এক লণ্ঠন লইয়া, ছয় ছয় কালা আদ্‌মি যে পাল্কী-বেহারা তাহাদের সঙ্গে একেবারে পূব মুখে দৌড় দিবার বন্দোবস্ত করিলাম—সুরুচির এবং ভদ্রতার কোন দোহাই না মানিয়া। কিন্তু যাত্রার পূর্ব্বে মাথার উপরে একখণ্ড মেঘ এমন

ঘনাইয়া আসিল যে, মনে হইল, বুঝিবা পাদরী সাহেবের অভিশাপ ফলিয়া যায়!

আমাদের যাত্রার মুখে মেঘ কাটিয়া পঞ্চমীর চাঁদ প্রকাশ পাইয়াছে। অদূরে চক্রতীর্থ,—বালুকাস্তূপের ধবলতার উপরে, আধুনিক হইতে দূরে, অতীতের একটি মরীচিকার মত দেখা যাইতেছে।

চক্রতীর্থ পার হইয়া আর অধুনাতনও নাই, পুরাতনও নাই;—রহিয়াছে কেবল চিরন্তন নীরবতা,—অন্তহারা অস্ফুটতাকে আলিঙ্গন করিয়া। মানুষের পদশব্দ সেখানে লুপ্ত, সাগরগর্জ্জন স্বপ্নের প্রায়—পাই কি, না পাই। এই শূন্যতা এত বিরাট যে, চাঁদের আলো সেও সেখানে অন্ধকার ঠেকিতেছে। ছায়ার বৈষম্য দিয়া আলো'কে ফুটাইতে, প্রতিঘাত দিয়া শব্দকে জাগাইতে, সেখানে কিছুই নাই;—অথচ মনে হয় না যে একা! সঙ্গে ছয় ছয় বেহারা চলিয়াছে বলিয়া নয়; কিন্তু এই প্রকাণ্ড শূন্যতা যে নির্জীব নহে সেটা স্পষ্ট অনুভব করিতেছি বলিয়া। এটা যে শ্মশান নয়, এখানেও যে বিরাট প্রাণের স্পন্দন অবাধে আমার চারিদিকে হিল্লোলিত, তাহা বেশ বুঝিতেছি। স্তব্ধ রাত্রি জুড়িয়া লক্ষকোটি কীটপতঙ্গের ঝিনিঝিনি,—দূরে অদূরে কাহাদের নূপুর-শিঞ্জিনীর মত তালে তালে উঠিতেছে পড়িতেছে,—তাহা কানে আসিতেছে না সত্য; অকূল অন্ধকারের ভিতর দিয়া আমাদের সাড়া পাইয়া হরিণের পাল ছুটিয়া চলিয়াছে,—চোখে পড়িতেছে না বটে; কিন্তু মন তাহার সহস্র পরিচয় পাইতেছে এবং আপনাকে নিঃসঙ্গ মানিতেছে না! লোকালয়ে নিজেকে অনেক সময়ে একাকী বোধ করিয়াছি, কিন্তু কোণার্ক যাত্রার প্রথমেই এই যে শিশুর মত ধরিত্রীর কোলে ঝাঁপাইয়া পড়ার আনন্দ,—নিখিলের সহিত আপনাকে সঙ্গত জানার আনন্দ—ইহাতে প্রাণ যেন

দুলিতে থাকে,—মনেই আসে না, একা চলিয়াছি! চলার আনন্দ! নিখিলের সহিত দুলিয়া চলার আনন্দ! শূন্যের মাঝ দিয়া উড়িয়া চলার আনন্দ! প্রদীপ নিভাইয়া আলোকের কোনো অপেক্ষা না রাখিয়া অন্ধকারের ভিতর দিয়া ভাসিয়া চলার আনন্দ!

চক্রতীর্থ হইতে বালুঘাই পর্য্যন্ত সমস্ত পথটা আনন্দের একটা জাগরণের মধ্য দিয়া যেন উড়িয়া আসিয়াছি। এইখানে আসিয়া প্রাণের দুয়ার সহসা যেন বন্ধ হইয়া গেছে;—মন যেন আপনার দুই ডানা টানিয়া চুপ করিয়া বসিয়াছে। নিশ্চল মেঘে চন্দ্র তারকা আচ্ছন্ন; নীরব অন্ধকারের মাঝে নিস্তরঙ্গ বায়ুরাশি;—কোনোদিকে সাড়া শব্দ নাই! মনে হইতেছে এ কোথায় আসিলাম,—কোন্ মৃত্যুর দেশে পায়ে পায়ে অর্দ্ধরাত্রে আমরা এই কয় ক্ষুদ্র প্রাণী! এসময়ে আলোর জন্য, ধ্বনির জন্য, অন্ধকারে কোথাও একটা কিছুকে দেখিবার জন্য, প্রাণ আকুল হইয়া ওঠে। মন চাহিতেছে চলি কিন্তু সমস্ত শরীর যেন অসাড় হইয়া গেছে!

লণ্ঠনের ক্ষীণ আলোটির দিকে দৃষ্টি রাখিয়া, পাল্কীবাহকদের করুণ ক্রন্দন-গান শুনিতে শুনিতে চলিয়াছি। কোথায় চলিয়াছি, কেমন করিয়া চলিয়াছি, কেনই বা চলিয়াছি তাহা আর মনে আসিতেছে না;—শুধু বোধ হইতেছে যেন প্রকাণ্ড একটা অন্ধকার গোলকের ভিতর দাঁড়াইয়া, একটি পাও অগ্রসর না হইয়া, আমরা কেবলি তালে তালে পা ফেলিতেছি—"পহর রাতি, পান বিঁড়িটি! পান বিঁড়িটি, পহর রাতি!"

বালুঘাই পার হইয়া চলিয়াছি। পহর রাতি, পান বিঁড়িটি এবং লণ্ঠনের বাতি, তিনে মিলিয়া মনকে ঘিরিয়া একটা যেন স্বপ্নের সৃজন করিয়াছে।

মাঝে মাঝে এক-একটা তালগাছ অন্ধকারের ভিতর দিয়া হঠাৎ চোখে পড়িয়া আবার কোথায় লুকাইয়া যাইতেছে ! চারিদিকে যেন একটা লুকোচুরির খেলা চলিতেছে ;—মরীচিকার মায়া দেখা দিতেছে, ঢাকা পড়িতেছে ! কাছে আসিতেছে সকলি--গাছ পালা গ্রাম নদী ; কিন্তু ধরিতে গেলেই সরিয়া পালাইতেছে,—কিছুই নিরাকৃত হইতে চাহিতেছে না !

দর্শন আকর্ণন এবং নিরাকরণ—এ তিনের অভাবের মধ্যে 'নিয়াখিয়া' নদীটি শীতল স্পর্শে আমাদের সমস্ত জড়তা দূর করিয়া আপনার স্বচ্ছ হাসির কল্লোলে যখন চকিতের মত রাত্রির গভীরতাকে মুখরিত করিয়া তোলে, তখন প্রাণের দুয়ার সহসা যেন খুলিয়া যায় ; পাল্কী হইতে মুখ বাড়াইয়া দেখি,—অদূরে অন্ধকার বনের ছায়ায় ছোট গ্রামখানি। মন এখান হইতে, এই চিরপরিচিত গৃহকোণকে ছাড়িয়া, এই নিয়াখিয়ার খেয়া ঘাট পার হইয়া আর চলিতে চাহে না।

রাত্রিমুখ হইতে রাত্রিশেষের দিকে যাত্রার মধ্যপথে এই হাস্যময়ী কল্লোলিনী নিয়াখিয়া। এই মধ্য-পথ অতিক্রম করিয়া মন কেবলি আলোকের জন্য, প্রভাতের জন্য, ব্যাকুল হইতে থাকে। কেবলি মনে হয়—আর কতদূর,—আর কত প্রহর--এমনি করিয়া অন্ধকারে চলিব !

অফুরান পথ চলার, প্রহরের পর প্রহর একটা বৈচিত্র্যহীনতার ভিতর দিয়া বাহিত হইবার সুবিপুল শ্রান্তি এই সময় আসিয়া মনকে এমনি করিয়া আক্রমণ করে যে, সে কোনোদিকে আর চাহিতে ইচ্ছা করে না,—আপনাকে গুটাইয়াসুটাইয়া একটি কোণে পড়িয়া থাকিতে পারিলে যেন বাঁচে।

ঘুমাইয়া পড়িবার—আপনাকে এই বিশ্বজোড়া বিলুপ্তির মধ্যে বিনা আপত্তিতে নামাইয়া দিবার জন্য দুর্দ্দমনীয় খোঁয়ারী আসিয়াছে; যেন একটা শীতল মুষ্টি, প্রাণের সমস্ত ইচ্ছাকে—জাগিয়া রহিবার সকল চেষ্টাকে—সবলে চাপিয়া অসাড় করিয়া দিতেছে। দারুণ অবসাদ! দেখিতেছি যাত্রীদল ফিরিয়া আসিতেছে, তাহাদের কাছে ডাকিয়া শুধাইতে চাই—পথ আর কতখানি, কিন্তু পারি না। কোষের মধ্যে কীটের মত নিশ্চল মন, একটা খট্ খট্ ছাড়া আর কোনোরূপ সাড়া দিতেছে না! পাল্কীর তলা দিয়া লণ্ঠনের আলো এবং বাহকদের দ্রুত চঞ্চল পদক্ষেপের ছায়া, আলো-আঁধারের স্রোতের মত, অবিশ্রান্ত বহিয়া চলিয়াছে। চোখ এই আলো এবং কালো, কালো এবং আলোর গতাগতির দিকে চাহিয়া চাহিয়া ঝিমাইয়া পড়িয়াছে।

রামচণ্ডীর বটচ্ছায়ায় পাল্কী নামাইয়া বাহকেরা কখন কে কোথায় সরিয়া গেছে! সমস্ত দেহ মন একটা আগুনের উত্তাপ অনুভব করিতেছে এবং ধীরে ধীরে আপনাকে জড়তার নিষ্পেষণ হইতে মুক্ত করিয়া আবার সজাগ হইয়া বাস্তবের সঙ্গে যুক্ত হইতে চাহিতেছে;—কিন্তু পারিতেছে না। চারিদিক এমনি নীরব, স্থির ও স্তিমিত যে, মনে হইতেছে একখানা প্রকাণ্ড দৃশ্যপটের ভিতরে তাহারা আমাকে রাখিয়া গিয়াছে! মন্দিরের পিছনে,—আকাশের নীলের উপরে একটিমাত্র তারার জ্যোতি স্থির হইয়া আছে। সম্মুখে প্রকাণ্ড বটগাছের শিখরে সামান্যমাত্র কম্পন নাই; তলদেশে,—পাতার গুচ্ছে, শাখার গায়ে, আগুনের রং হলুদের প্রলেপের মত লাগিয়া আছে —অচঞ্চল। আগুনের তপ্তকাঞ্চনবর্ণের সম্মুখে চক্রাকারে সজ্জিত

মানুষের ছায়া সুতীক্ষ্ণ, সুস্পষ্ট দেখিতেছি—কিন্তু অবিচল, অবিকল, ছবির মত।

চণ্ডীদেবীকে দর্শন করিলাম, পাল্কীতে আসিয়া বসিলাম, বাহক আসিল, পাল্কী চলিল—এত গভীর নীরবতার মাঝখানে, যে, মনে হইতে লাগিল, সেই সীমাচলে পৌঁছিয়াছি যেখানে বাস্তবে অবাস্তবে স্থূলে সূক্ষ্মে গলাগলি ভাব। নিজেই আছি কিনা এ কথাটা জানিতে চারিদিক হাতড়াইতে হাতড়াইতে, কাঁটাবনের ঢালু পথ বাহিয়া, পায়ে পায়ে সন্তর্পণে, একটা অচেনা অন্ধকারের দিকে পুনরায় যখন নামিয়া চলিয়াছি, সেই সময়ে সহসা খোলকরতাল ও সঙ্কীর্ত্তনের প্রচণ্ড শব্দতরঙ্গের ঘাতপ্রতিঘাত বাস্তবকে আনিয়া মনের উপরে এমনি করিয়া আছড়াইয়া ফেলিল, যে, মনে হইল বুক বুঝি ছিঁড়িয়া পড়িল! অন্ধকারে হঠাৎ আলোর আঘাতে দৃষ্টি যেমন সঙ্কুচিত হইয়া যায়, তেমনি সুনিবিড় স্তব্ধতার মধ্যে হঠাৎ একসময়ে এই শব্দতরঙ্গের ঝনঝনায় প্রাণের তন্ত্রী বিদ্যুৎবেগে রণরণ করিয়াই শিথিল হইয়া পড়ে।

রামচণ্ডী—আমাদের যাত্রাপথের শেষ ঘাট—পিছনে ফেলিয়া বহুদূরে চলিয়া আসিয়াছি। সেখান হইতে এখানেও কীর্ত্তনের সুর, যেন কোন্ পরিত্যক্ত পার হইতে একটুখানি আক্ষেপের মত, আমাদের নিকটে পৌঁছিতেছে—অস্পষ্ট, মৃদু, ক্ষণে ক্ষণে! পাড়ি দিয়াছি যে-ঘাট হইতে, তাহার সংবাদ এখনো পাইতেছি ;—পাড়ি দিতেছি যে-পারে, তাহার সংবাদ এখনো পাই নাই ;—মাঝগঙ্গায় মন সমস্ত পাল তুলিয়া যেন মন্থর গতিতে ভাসিয়া চলিয়াছে—আলোকরাজ্যের সিংহদ্বারের দিকে।

প্রাতঃসন্ধ্যার ভরপূর অন্ধকার। তারার আলো নিভিয়া গেছে। প্রভাতের আলো—সে 'এখনো সুদূরে। এই সাড়াশব্দহীন ধূসরতার মাঝে, ক্ষণেকের জন্য আমরা থমকিয়া দাঁড়াইয়াছি—কাঁধ বদলাইতে।

হরিণ যেমন বহুপথ দৌড়িয়া হঠাৎ একবার উৎকর্ণ, উদ্‌গ্রীব হইয়া দাঁড়ায়, তারপরে পথের ঠিকানা পাইয়া তীরের মত সেইদিকে চলিয়া যায়, তেমনি আমরা উড়িয়া চলিয়াছি—সিন্ধুতীরের নিষ্কলুষ ধবলতার উপর দিয়া, একটা বিশাল গম্ভীর কল্লোলের মুখে—নির্ভয়ে, বাতাসে বুক ফুলাইয়া।

জ্যোতিমন্দিরের সিংহদ্বার অতিক্রম করিতেছি। আলো গলিয়া আমাদের পায়ের নীচে বিছাইয়া যাইতেছে, শব্দ গলিয়া আমাদের আশেপাশে প্রদীপ্ত হইয়া উঠিতেছে। যতদূর দৃষ্টি চলে ততদূর কালো সমুদ্রের সাদা আলো,—মায়ার প্রাচীরের মত, অবিরাম চোখের সম্মুখে জাগিয়া উঠিতেছে, ভাঙিয়া পড়িতেছে!

রাত্রি চতুর্থ প্রহর। বিশ্বমন্দিরে উত্থান-আরতি বাজিতেছে। কালের দুন্দুভি, আলোর তালে ধ্বনিত হইতেছে,—দিকে দিগন্তে, সীমে অসীমে! এই জ্যোতির্ম্ময় ঝন্‌ঝনার ভিতর দিয়া, এই বিগলিত আলোকের চলায়মান, শব্দায়মান আস্তরণের উপর দিয়া, দ্রুত পদক্ষেপে ইহারা আমাকে লইয়া চলিয়াছে—বরুণ দেবতার অনুচরগণের মত, —নীল, নগ্ন, দীর্ঘকায়! আলোকবিধৌত সিন্ধুতীরে ইহাদের পদক্ষেপ ছায়া ফেলিতেছে না, চিহ্ন রাখিতেছে না!

বালুতট ওদিকে গড়াইয়া চন্দ্রভাগার কোলে পড়িয়াছে, এদিকে গিয়া সমুদ্রজলে নিজেকে হারাইয়া দিয়াছে। রাত্রি—আলো-আঁধারের, ধ্বনিপ্রতিধ্বনির মরীচিকার পারে প্রহর-শেষের নিশ্চল ধূসরতা

দিয়া গড়া নীরব এই বালুতটে আমাদের ক'টিকে আছড়াইয়া ফেলিয়া, যেন বহুদূরে সরিয়া গেছে।

নূতন দিন জন্ম লইতেছে—অনাবৃত আলোকে, নীরবতার মাঝখানে, আনন্দময়ী ঊষার অঙ্কে। বিশ্বব্যাপী প্রসববেদনার আঘাতে মেঘ ছিঁড়িয়া পড়িতেছে, সমুদ্র আলোড়িত হইতেছে, বাতাস মুহুর্মুহু শিহরিতেছে! একাকী এই জন্ম-রহস্যের অভিমুখে চাহিয়া দেখিতেছি। একটিমাত্র রক্তবিন্দু! পূর্ব্বসন্ধ্যার অরুণিমার উপরে বিশ্বজগতের পূর্ব্বরাগের একটিমাত্র বুদ্বুদ—অখণ্ড অম্লান! অনন্তের পাত্রে টল্‌টল্‌ করিতেছে! জ্যোতির রথ, মহাদ্যুতি এই প্রাণ-বিন্দুটিকে বহিয়া আমাদের দিকে ছুটিয়া আসিতেছে—সপ্তসিন্ধুর জলোর্ম্মি ভেদ করিয়া, জাগরণের জ্যোতিষ্মান চক্রতলে সুষুপ্তিকে নিষ্পেষিত করিয়া! পূর্ব্ব আকাশে এই শোণিতবিন্দুর আভা লাগিয়াছে, সমুদ্র-তরঙ্গ বহিয়া তাহারি প্রভা গড়াইয়া আসিতেছে। পাণ্ডুর তটভূমি দেখিতে দেখিতে রক্তচন্দনের প্রলেপে প্লাবিত হইয়া গেল, রক্তবৃষ্টিতে চন্দ্রভাগার তীর্থজল রাঙিয়া উঠিল; মৈত্রবনের শিখরে কোণার্ক মন্দিরের প্রত্যেক কোণ, প্রতি শিলাখণ্ড, আতপ্ত রক্তের সজীব প্রভা নিঃশেষে পান করিয়া অনঙ্গ দেবতার উল্লসিত কেলিকদম্বের মত প্রকাশ পাইতে লাগিল।

মানুষের গড়া কোণার্কের এই বিচিত্র রথ দেখিতেছি—কত যেন ক্ষুদ্র! সূর্য্যের তেজ ধারণ করিয়া, তাহারি শক্তিতে ঊর্দ্ধে বাড়িয়া আপনাকে চিরশ্যামল, চিরশোভন রাখিয়াছে এই যে বনস্পতি, ইহারও ঊর্দ্ধে কোণার্কের রথধ্বজা উঠিয়া তিষ্ঠিতে পারে নাই;—আপনার ভারে আপনি ভাঙিয়া পড়িয়াছে!

জরাজীর্ণ, বজ্রাহত এই মন্দিরের উপর হইতে অরুণোদয়ের রক্ত আভার মোহ 'সরিয়া গেছে। দিনের প্রখর আলোয় সে তাহার সমস্ত দীনতা লইয়া বনস্পতিটির আড়ালে আপনাকে যেন গোপন করিতে চাহিতেছে, মিলাইতে চাহিতেছে! দূর হইতে কোণার্কের এই হীন এবং দীন ভাব মনকে যেন লোহার মত শক্ত করিয়া দিয়াছে। উহার দিকে আর এক পাও অগ্রসর হইতে ইচ্ছা নাই। কিন্তু তবু চলিয়াছি—চন্দ্রভাগা উত্তীর্ণ হইয়া, অসমতল কালিয়াইগণ্ড পায়ে পায়ে অতিক্রম করিয়া—মানবশিল্পের একটা সুবিদিত আকর্ষণ-বশে,—চুম্বকের টানে লোহার মত। মন টানিতেছে! ঐ বটচ্ছায়ায় মন টানিতেছে, ঐ চূড়াহীন মন্দিরের দিকে মন টানিতেছে, ঐ ঝরিয়া-পড়া, ঝুঁকিয়া-পড়া বালুশয়ানে শুইয়া-পড়া রাশি রাশি পাথরের দিকে মন টানিতেছে!

কোণার্কের বিরাট আকর্ষণে বাধা দেয় ঐ বনস্পতিটির শ্যাম যবনিকা। সেটি সরাইয়া মৈত্রবনের ছায়ানিবিড় আশ্রমটি পার হইয়া যে-মুহূর্ত্তে কোণার্কের অন্তঃপুর-প্রাঙ্গণে পা রাখিয়াছি অমনি দৃষ্টি মন সকলি, অগ্নিশিখার চারিদিকে পতঙ্গের মত, আপনাকে ঘুরাইয়া ঘুরাইয়া শ্রান্ত করিয়া ফিরিতেছে,—কিছুতে আর তৃপ্তি মানিতেছে না!

চিরযৌবনের হাট বসিয়াছে! চিরপুরাতন অথচ চিরনূতন কেলিকদম্বতলে নিখিলের রাসলীলা চলিয়াছে—কিবা রাত্রি, কিবা দিন—বিচিত্র বর্ণের প্রদীপ জ্বালাইয়া, মূর্ত্তিহীন অনঙ্গ দেবতার রত্নবেদীটি ঘিরিয়া।

এখানে কিছুই নীরব নাই, নিশ্চল নাই, অনুর্ব্বর নাই! পাথর বাজিতেছে মৃদঙ্গের মন্দ্রস্বনে, পাথর চলিয়াছে তেজীয়ান্ অশ্বের মত

বেগে রথ টানিয়া, উর্ব্বর পাথর ফুটিয়া উঠিয়াছে নিরন্তর-পুষ্পিত কুঞ্জলতার মত,—শ্যাম-সুন্দর আলিঙ্গনের সহস্রবন্ধে চারিদিক বেড়িয়া! ইহারি শিখরে—এই শব্দায়মান, চলায়মান উর্ব্বরতার চিত্রবিচিত্র শৃঙ্গারবেশের চূড়ায়—শোভা পাইতেছে কোণার্কের দ্বাদশ শত শিল্পীর মানস-শতদল,—সকল গোপনতার সীমা হইতে বিচ্ছিন্ন, নির্ভীক, সতেজ, আলোকের দিকে উন্মুখ।

এইবার ফিরিতেছি—উদয়ের পার হইতে আবার সেই অস্তের পারে;—আর একবার সংসারের দিকে, সুরুচি কুরুচি শ্লীল অশ্লীলের দিকে।

কোণার্ক আমাদের নিকটে বিদায় লইতেছে। মরুশয্যায় অর্দ্ধ-নিমগ্না পড়িয়া আছে সে—পাষাণী অহল্যার মত সুন্দরী;—নীরব, নিস্পন্দ,—মণিদর্পণে নিশ্চল দৃষ্টি রাখিয়া, দিগন্ত-জোড়া মেঘের ম্লান আলোয় যুগযুগান্তব্যাপী প্রতীক্ষার মত, শতসহস্রের গমনাগমনের একপ্রান্তে, সুদুর্ল্লভ একটি-কণা পদরেণুর প্রত্যাশী!

শ্রীঅবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

"যৌবনে দাও রাজটীকা"

গত মাসের সবুজ পত্রে শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত যৌবনকে রাজটীকা দেবার প্রস্তাব করেছেন। আমার কোনও টীকাকার বন্ধু এই প্রস্তাবের বক্ষ্যমাণরূপ ব্যাখ্যা করেছেন ঃ—

"যৌবনকে টীকা দেওয়া অবশ্য কর্ত্তব্য,—তাহাকে বসন্তের হস্ত হইতে রক্ষা করিবার জন্য। এস্থলে রাজটীকা অর্থ—রাজা অর্থাৎ যৌবনের শাসনকর্ত্তাকর্ত্তৃক তাহার উপকারার্থে দত্ত যে টীকা সেই টীকা। উক্তপদ তৃতীয়াতৎপুরুষ সমাসে সিদ্ধ হইয়াছে।"

উল্লিখিত ভাষ্য আমি রহস্য বলে মনে করতুম, যদি না আমার জানা থাকত যে, এদেশে জ্ঞানীব্যক্তিদিগের মতে মনের বসন্তঋতু ও প্রকৃতির যৌবনকাল,—দুই অসায়েস্তা, অতএব শাসনযোগ্য। এ উভয়কে জুড়ীতে যুতলে আর বাগ মানান যায় না;—অতএব এদের প্রথমে পৃথক করে, পরে পরাজিত করতে হয়।

বসন্তের স্পর্শে ধরণীর সর্ব্বাঙ্গ শিউরে ওঠে;—অবশ্য তাই বলে পৃথিবী তার আলিঙ্গন হতে মুক্তিলাভ করবার চেষ্টা করে না, এবং পোষমাসকেও বারোমাস পুষে রাখে না! শীতকে অতিক্রম করে বসন্তের কাছে আত্মসমর্পণ করায় প্রকৃতি যে অর্ব্বাচীনতার পরিচয় দেয় না, তার পরিচয় ফলে।

প্রকৃতির যৌবন শাসনযোগ্য হলেও তাকে শাসন করবার ক্ষমতা মানুষের হাতে নেই; কেননা প্রকৃতির ধর্ম্ম মানবধর্ম্মশাস্ত্র-বহির্ভূত। সেই কারণে জ্ঞানীব্যক্তিরা আমাদের প্রকৃতির দৃষ্টান্ত অনুসরণ করতে বারণ করেন, এবং নিত্যই আমাদের প্রকৃতির

উল্টো টান টানতে পরামর্শ দেন; এই কারণেই মানুষের যৌবনকে বসন্তের প্রভাব হতে দূরে রাখা আবশ্যক। অন্যথা, যৌবন ও বসন্ত এ দুয়ের আবির্ভাব যে একই দৈবীশক্তির লীলা—এইরূপ একটি বিশ্বাস আমাদের মনে স্থানলাভ করতে পারে।

এদেশে লোকে যে, যৌবনের কপালে রাজটীকার পরিবর্তে তার পৃষ্ঠে রাজদণ্ড প্রয়োগ করতে সদাই প্রস্তুত, সে বিষয়ে আর কোন সন্দেহ নেই। এর কারণ হচ্ছে যে, আমাদের বিশ্বাস মানব-জীবনে যৌবন একটা মস্ত ফাঁড়া—কোনো রকমে সেটি কাটিয়ে উঠতে পারলেই বাঁচা যায়। এ অবস্থায় কি জ্ঞানী, কি অজ্ঞানী সকলেই চান্ যে, একলম্ফে বাল্য হতে বার্দ্ধক্যে উত্তীর্ণ হন। যৌবনের নামে আমরা ভয় পাই, কেননা তার অন্তরে শক্তি আছে। অপর পক্ষে বালকের মনে শক্তি নেই, বৃদ্ধের দেহে শক্তি নেই; বালকের জ্ঞান নেই, বৃদ্ধের প্রাণ নেই। তাই আমাদের নিয়ত চেষ্টা হচ্ছে দেহের জড়তার সঙ্গে মনের জড়তার মিলন করা, অজ্ঞতার সঙ্গে বিজ্ঞতার সন্ধিস্থাপন করা। তাই আমাদের শিক্ষানীতির উদ্দেশ্য হচ্ছে ইঁচড়ে পাকানো, আর আমাদের সমাজনীতির উদ্দেশ্য হচ্ছে জাগ দিয়ে পাকানো।

আমাদের উপরোক্ত চেষ্টা যে ব্যর্থ হয় নি, তার প্রমাণ আমাদের সামাজিক জীবন। আজকের দিনে এদেশে রাজনীতির ক্ষেত্রে এক দিকে বালক, অপর দিকে বৃদ্ধ; সাহিত্যক্ষেত্রে এক-দিকে স্কুলবয়, অপর দিকে স্কুলমাষ্টার; সমাজে এক দিকে বাল্য-বিবাহ, অপর দিকে অকালমৃত্যু; ধর্ম্মক্ষেত্রে এক দিকে শুধু "ইতি" "ইতি", অপর দিকে শুধু "নেতি" "নেতি";—অর্থাৎ এক

দিকে লোষ্ট্রকাষ্ঠও দেবতা, অপর দিকে ঈশ্বরও ব্রহ্ম নন। অর্থাৎ আমাদের জীবনগ্রন্থে প্রথমে ভূমিকা আছে, শেষে উপসংহার আছে;—ভিতরে কিছু নেই। এ বিশ্বের জীবনের আদি নেই, অন্ত নেই, শুধু মধ্য আছে; কিন্তু তারি অংশীভূত আমাদের জীবনের আদি আছে, অন্ত আছে;—শুধু মধ্য নেই।

বার্দ্ধক্যকে বাল্যের পাশে এনে ফেল্‌লেও আমরা তার মিলন সাধন করতে পারি নি; কারণ ক্রিয়া বাদ দিয়ে দুটি পদকে জুড়ে এক করা যায় না। তা ছাড়া যা আছে, তা নেই বল্‌লেও, তার অস্তিত্ব লোপ হয়ে যায় না। এ বিশ্বকে মায়া বল্‌লেও তা অস্পৃশ্য হয়ে যায় না এবং আত্মাকে ছায়া বল্‌লেও তা অদৃশ্য হয়ে যায় না। বরং কোনও কোনও সত্যের দিকে পিঠ ফেরালে তা অনেক সময়ে আমাদের ঘাড়ে চড়ে বসে। যে যৌবনকে আমরা সমাজে স্থান দেই নি, তা এখন নানা বিকৃতরূপে নানা ব্যক্তির দেহ অবলম্বন করে রয়েছে। যাঁরা সমাজের সুমুখে জীবনের শুধু নান্দী ও ভরতবচন পাঠ করেন, তাঁদের জীবনের অভিনয়টা যবনিকার অন্তরালেই হয়ে থাকে। রুদ্ধ ও বদ্ধ করে রাখলে পদার্থমাত্রই আলোর ও বায়ুর সম্পর্ক হারায় এবং সেই জন্য তার গায়ে কলঙ্ক ধরাও অনিবার্য্য। গুপ্ত জিনিষের পক্ষে দুষ্ট হওয়া স্বাভাবিক।

আমরা যে, যৌবনকে গোপন করে রাখ্‌তে চাই, তার জন্য আমাদের প্রাচীন সাহিত্য অনেক পরিমাণে দায়ী। কোনও বিখ্যাত ইংরাজ লেখক বলেন যে, literature হচ্ছে criticism of life. —ইংরাজি-সাহিত্য জীবনের সমালোচনা হতে পারে কিন্তু সংস্কৃত সাহিত্য হচ্ছে যৌবনের আলোচনা।

সংস্কৃত সাহিত্যে যুবকযুবতী ব্যতীত আর কারও স্থান নেই। আমাদের কাব্যরাজ্য হচ্ছে সূর্য্যবংশের শেষ নৃপতি অগ্নিবর্ণের রাজ্য এবং সে দেশ হচ্ছে অষ্টাদশবর্ষদেশীয়াদের স্বদেশ। যৌবনের যে-ছবি সংস্কৃত দৃশ্যকাব্যে ফুটে উঠেছে, সে হচ্ছে ভোগবিলাসের চিত্র। সংস্কৃত কাব্যজগৎ, মাল্যচন্দনবনিতা দিয়ে গঠিত এবং সে জগতের বনিতাই হচ্ছে স্বর্গ এবং মাল্যচন্দন তার উপসর্গ। এ কাব্যজগতের স্রষ্টা কিম্বা দ্রষ্টা কবিদের মতে প্রকৃতির কাজ হচ্ছে শুধু রমণীদেহের উপমা যোগান এবং পুরুষের কাজ শুধু রমণীর মন যোগান। হিন্দুযুগের শেষ কবি জয়দেব নিজের কাব্যসম্বন্ধে স্পষ্টাক্ষরে যে কথা বলেছেন তাঁর পূর্ব্ববর্ত্তী কবিরাও ইঙ্গিতে সেই একই কথা বলেছেন। সে কথা এই যে—"যদি বিলাস কলায় কুতূহলী হও ত আমার কোমলকান্ত পদাবলী শ্রবণ করো।" এক কথায়, যে-যৌবন যযাতি নিজের পুত্রদের কাছে ভিক্ষা করেছিলেন, সংস্কৃত কবিরা সেই যৌবনেরই রূপগুণ বর্ণনা করেছেন।

এ কথা যে কত সত্য, তা একটি উদাহরণের সাহায্যে প্রমাণ করা যেতে পারে। কৌশাম্বির যুবরাজ উদয়ন এবং কপিলবাস্তুর যুবরাজ সিদ্ধার্থ উভয়ে সমসাময়িক ছিলেন। উভয়েই পরম রূপবান্ এবং দিব্য শক্তিশালী যুবাপুরুষ; কিন্তু উভয়ের মধ্যে প্রভেদ এইটুকু যে, একজন হচ্ছেন ভোগের আর একজন হচ্ছেন ত্যাগের পূর্ণ অবতার। ভগবান গৌতম-বুদ্ধের জীবনের ব্রত ছিল মানবের মোহনাশ করে তাকে সংসারের সকল শৃঙ্খল হতে মুক্ত করা; আর বৎসরাজ উদয়নের জীবনের ব্রত ছিল ঘোষবতী বীণার সাহায্যে অরণ্যের গজকামিনী এবং অন্তঃপুরের গজগামিনীদের প্রথমে মুগ্ধ

করে, পরে নিজের ভোগের জন্য তাদের অবরুদ্ধ করা। অথচ সংস্কৃত কাব্যে বুদ্ধচরিতের স্থান নেই, কিন্তু উদয়ন-কথায় তা পরিপূর্ণ।

সংস্কৃত ভাষায় যে বুদ্ধের জীবনচরিত লেখা হয়নি, তা নয়; তবে ললিতবিস্তরকে আর কেউ কাব্য বলে স্বীকার করবেন না; এবং অশ্বঘোষের নাম পর্য্যন্তও লুপ্ত হয়ে গেছে। অপর দিকে উদয়ন-বাসবদত্তার কথা অবলম্বন করে যাঁরা কাব্য রচনা করেছেন, যথা, ভাস, গুণাঢ্য, সুবন্ধু ও শ্রীহর্ষ ইত্যাদি, তাঁদের বাদ দিলে সংস্কৃত সাহিত্যের অর্দ্ধেক বাদ পড়ে যায়। কালিদাস বলেছেন যে, কৌশাম্বির গ্রামবৃদ্ধেরা উদয়ন-কথা শুনতে ও বলতে ভালবাসতেন; কিন্তু আমরা দেখতে পাচ্ছি যে, কেবল কৌশাম্বির গ্রামবৃদ্ধ কেন, সমগ্র ভারতবর্ষের আবালবৃদ্ধবনিতা সকলেই ঐ কথা-রসের রসিক। সংস্কৃত সাহিত্য এ সত্যের পরিচয় দেয় না, যে, বুদ্ধের উপদেশের বলে জাতীয় জীবনে যৌবন এনে দিয়েছিল এবং উদয়নের দৃষ্টান্তের ফলে অনেকের যৌবনে অকালবার্দ্ধক্য এনে দিয়েছিল। বৌদ্ধধর্ম্মের অনুশীলনের ফলে—রাজা অশোক লাভ করেছিলেন সাম্রাজ্য; আর উদয়ন-ধর্ম্মের অনুশীলন করে রাজা অগ্নিবর্ণ লাভ করেছিলেন রাজযক্ষ্মা। সংস্কৃত কবিরা এ সত্যটি উপেক্ষা করেছিলেন যে, ভোগের ন্যায় ত্যাগও যৌবনেরি ধর্ম্ম। বার্দ্ধক্য কিছু অর্জ্জন করতে পারে না বলে, কিছু বর্জ্জনও করতে পারে না। বার্দ্ধক্য কিছু কাড়তে পারে না বলে, কিছু ছাড়তেও পারে না;—দুটি কালো চোখের জন্যও নয়, বিশকোটি কালো লোকের জন্যও নয়।

পাছে লোকে ভুল বোঝেন বলে, এখানে আমি একটি কথা বলে রাখতে চাই। কেউ মনে করবেন না যে, আমি কাউকে

সংস্কৃত কাব্য 'বয়কট' করতে বলছি কিম্বা নীতি এবং রুচির দোহাই দিয়ে সে কাব্যের সংশোধিত সংস্করণ প্রকাশ করবার পরামর্শ দিচ্ছি। আমার মতে যা সত্য তা গোপন করা সুনীতি নয় এবং তা প্রকাশ করাও দুর্নীতি নয়। সংস্কৃত কাব্যে যে-যৌবন-ধর্ম্মের বর্ণনা আছে তা যে সামান্য মানব-ধর্ম্ম—এ হচ্ছে অতি স্পষ্ট সত্য; এবং মানবজীবনের উপর তার প্রভাব যে অতি প্রবল তাও অস্বীকার করবার যো নেই।

তবে এই একদেশদর্শিতা ও অত্যুক্তি—ভাষায় যাকে বলে এক-রোখামি ও বাড়াবাড়ি, তাই হচ্ছে সংস্কৃত কাব্যের প্রধান দোষ। যৌবনের স্থূলশরীরকে অত আস্কারা দিলে তা উত্তরোত্তর স্থূল হতে স্থূলতর হয়ে ওঠে এবং সেই সঙ্গে তার সূক্ষ্ম শরীরটি সূক্ষ্ম হতে এত সূক্ষ্মতম হয়ে ওঠে যে তা খুঁজে পাওয়াই ভার হয়। সংস্কৃত সাহিত্যের অবনতির সময় কাব্যে রক্তমাংসের পরিমাণ এতে বেড়ে গিয়েছিল যে, তার ভিতর আত্মার পরিচয় দিতে হলে, সেই রক্তমাংসের আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা করা ছাড়া আর আমাদের উপায় নেই। দেহকে অতটা প্রাধান্য দিলে মন পদার্থটি বিগড়ে যায়; তার ফলে দেহ ও মন পৃথক হয়ে যায় এবং উভয়ের মধ্যে আত্মীয়তার পরিবর্ত্তে জ্ঞাতি-শত্রুতা জন্মায়। সম্ভবতঃ বৌদ্ধ-ধর্ম্মের নিরামিষের প্রতিবাদস্বরূপ হিন্দু কবিরা তাঁদের কাব্যে এতটা আমিষের আমদানি করেছিলেন। কিন্তু যে কারণেই হোক্, প্রাচীন ভারতবর্ষের চিন্তার রাজ্যে দেহমনের পরস্পরের যে বিচ্ছেদ ঘটেছিল তার প্রমাণ—প্রাচীন সমাজের এক দিকে বিলাসী, অপর দিকে সন্ন্যাসী; এক দিকে পত্তন, অপর দিকে বন; এক দিকে রঙ্গালয়, অপর দিকে হিমালয়;—এক কথায় এক

দিকে কামশাস্ত্র অপর দিকে মোক্ষশাস্ত্র। মাঝামাঝি আর-কিছু, জীবনে থাক্‌তে পারত, কিন্তু সাহিত্যে নেই। এবং এ দুই বিরুদ্ধ মনোভাবের পরস্পর মিলনের যে কোনও পন্থা ছিল না, সে কথা ভর্তৃহরি স্পষ্টাক্ষরে বলেছেন—

"একা ভার্য্যা সুন্দরী বা দরী বা!" এই হচ্ছে প্রাচীনযুগের শেষ কথা। যাঁরা দরী-প্রাণ তাঁদের পক্ষে যৌবনের নিন্দা. করা যেমন স্বাভাবিক, যাঁরা সুন্দরী-প্রাণ তাঁদের পক্ষেও তেমনি স্বাভাবিক। যতির মুখের যৌবন-নিন্দা অপেক্ষা কবির মুখের যৌবন-নিন্দায়, আমার বিশ্বাস, অধিক ঝাঁঝ আছে। তার কারণ, ত্যাগীর অপেক্ষা ভোগীরা অভ্যাসবশতঃ কথায় ও কাজে বেশী অসংযত।

যারা স্ত্রীজাতিকে কেবলমাত্র ভোগের সামগ্রী মনে করেন, তারাই যে স্ত্রী-নিন্দার ওস্তাদ—এর প্রমাণ জীবনে ও সাহিত্যে নিত্য পাওয়া যায়। স্ত্রী-নিন্দুকের রাজা হচ্ছেন, রাজকবি ভর্তৃহরি ও রাজকবি Solomon। চরম ভোগবিলাসে পরম চরিতার্থতা লাভ করতে না পেরে এঁরা শেষবয়সে স্ত্রীজাতির উপর গায়ের ঝাল ঝেড়েছেন। যাঁরা বনিতাকে মাল্যচন্দন হিসাবে ব্যবহার করেন, তাঁরা শুকিয়ে গেলে সেই বনিতাকে মাল্যচন্দনের মতই ভূতলে নিক্ষেপ করেন এবং তাকে পদদলিত করতেও সঙ্কুচিত হন না। প্রথমবয়সে মধুর রস অতিমাত্রায় চর্চ্চা করলে শেষবয়সে জীবন তিতো হয়ে উঠে। এ শ্রেণীর লোকের হাতে শৃঙ্গার-শতকের পরেই বৈরাগ্য-শতক রচিত হয়।

একই কারণে, যাঁরা যৌবনকে কেবলমাত্র ভোগের উপকরণ মনে করেন, তাঁদের মুখে যৌবন-নিন্দা লেগে থাক্‌বারই কথা। যাঁরা

যৌবন-জোয়ারে গা-ভাসিয়ে দেন, তাঁরা ভাঁটার সময় পাঁকে পড়ে' গত-জোয়ারের প্রতি কটুকাটব্য প্রয়োগ করেন। যৌবনের উপর তাঁদের রাগ এই, যে, তা পালিয়ে যায় এবং একবার চলে গেলে আর ফেরে না। যযাতি যদি পুরুর কাছে ভিক্ষা করে যৌবন ফিরে না পেতেন, তাহলে তিনি, যে কাব্য কিম্বা ধর্ম্মশাস্ত্র রচনা কর্‌তেন, তাতে যে কি সুতীব্র যৌবন-নিন্দা থাক্‌ত তা আমরা কল্পনাও কর্‌তে পারিনে। পুরু যে পিতৃভক্তির পরিচয় দিয়েছিলেন তার ভিতর পিতার প্রতি কতটা ভক্তি ছিল এবং তাতে পিতারই যে উপকার করা হয়েছিল তা বল্‌তে পারিনে কিন্তু তাতে দেশের মহা অপকার হয়েছে ;—কারণ নীতির একখানা বড় গ্রন্থ মারা গেছে।

যযাতি-কাঙ্ক্ষিত যৌবনের বিরুদ্ধে প্রধান অভিযোগ এই যে, তা অনিত্য। এ বিষয়ে ব্রাহ্মণ ও শ্রমণ, নগ্নক্ষপণক ও নাগরিক সকলেই এক-মত।

"যৌবন ক্ষণস্থায়ী"—এই আক্ষেপে এদেশের কাব্য ও সঙ্গীত পরিপূর্ণ।

> "ফাগুন গেয়ী হয় বহুরা ফেরী আয়ী হয়
> গ্যায় তো জোবন ফেরি আওত নহি।"

এই গান আজও হিন্দুস্থানের পথে ঘাটে অতি করুণ সুরে গাওয়া হয়ে থাকে। যৌবন যে চিরদিন থাকে না, এ আপশোষ রাখবার স্থান ভারতবর্ষে নেই।

যা অতি প্রিয় এবং অতি ক্ষণস্থায়ী তার স্থায়িত্ব বাড়াবার চেষ্টা মানুষের পক্ষে স্বাভাবিক। সম্ভবতঃ নিজের অধিকার বিস্তার করবার

উদ্দেশ্যেই এদেশে যৌবন, শৈশবের উপর আক্রমণ করেছিল। বাল্য-বিবাহের মূলে হয় ত এই যৌবনের মেয়াদ বাড়াবার ইচ্ছাটাই বর্ত্তমান। জীবনের গতিটি উল্টো দিকে ফেরাবার ভিতরও একটা মহা আর্ট আছে। পৃথিবীর অপর সব দেশে, লোকে গাছকে কি করে বড় করতে হয় তারি সন্ধান জানে, কিন্তু গাছকে কি করে ছোট করতে হয়, সে কৌশল শুধু জাপানিরাই জানে। একটি বটগাছকে তারা চিরজীবন একটি টবের ভিতর পুরে রেখে দিতে পারে। শুনতে পাই, এই সব বামন-বট হচ্ছে অক্ষয় বট। জাপানিদের বিশ্বাস যে, গাছকে হ্রস্ব করলে তা আর বৃদ্ধ হয় না। সম্ভবতঃ আমাদেরও মনুষ্যত্বের চর্চ্চা সম্বন্ধে এই জাপানি আর্ট জানা আছে এবং বাল্যবিবাহ হচ্ছে সেই আর্টের একটি প্রধান অঙ্গ। এবং উক্ত কারণেই অপর সকল প্রাচীন সমাজ উৎসন্নে গেলেও আমাদের সমাজ আজও টিঁকে আছে। মনুষ্যত্ব খর্ব্ব করে, মানব-সমাজকে টবে জিইয়ে রাখায় যে বিশেষ কিছু অহঙ্কার করবার আছে এমন ত আমার মনে হয় না। সে যাই হোক, এ যুগে যখন কেউ যৌবনকে রাজটীকা দেবার প্রস্তাব করেন, তখন তিনি সমাজের কথা ভাবেন ;— ব্যক্তিবিশেষের কথা নয়।

ব্যক্তিগত হিসেবে জীবন ও যৌবন অনিত্য হলেও মানব-সমাজের হিসেবে ও দুই পদার্থ নিত্য বল্লেও অত্যুক্তি হয় না। সুতরাং সামাজিক জীবনে যৌবনের প্রতিষ্ঠা করা মানুষের ক্ষমতার বহির্ভূত না হলেও না হতে পারে।

কি উপায়ে যৌবনকে সমাজের যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত করা যেতে পারে তাই হচ্ছে বিবেচ্য ও বিচার্য্য।

এ বিচার কর্‌বার সময়, এ কথাটি মনে রাখা আবশ্যক যে, মানব-জীবনের পূর্ণ অভিব্যক্তি,—যৌবন।

যৌবনে মানুষের বাহ্যেন্দ্রিয় কর্ম্মেন্দ্রিয় ও অন্তরেন্দ্রিয় সব সজাগ ও সবল হয়ে ওঠে এবং সৃষ্টির মূলে যে প্রেরণা আছে মানুষে সেই প্রেরণা তার সকল অঙ্গে, সকল মনে অনুভব করে।

দেহ ও মনের অবিচ্ছেদ্য সম্বন্ধের উপর মানবজীবন প্রতিষ্ঠিত হলেও, দেহ মনের পার্থক্যের উপরেই আমাদের চিন্তারাজ্য প্রতিষ্ঠিত। দেহের যৌবনের সঙ্গে, মনের যৌবনের একটা যোগাযোগ থাক্‌লেও, দৈহিক যৌবন ও মানসিক যৌবন স্বতন্ত্র। এই মানসিক যৌবন লাভ কর্‌তে পারলেই আমরা তা সমাজে প্রতিষ্ঠা কর্‌তে পার্‌ব। দেহ সঙ্কীর্ণ ও পরিচ্ছিন্ন; মন উদার ও ব্যাপক। একের দেহের যৌবন, অপরের দেহে প্রবেশ করিয়ে দেবার যো নেই;—কিন্তু একের মনের যৌবন, লক্ষ লোকের মনে সংক্রমণ করে দেওয়া যেতে পারে।

পূর্ব্বে বলেছি যে, দেহ ও মনের সম্বন্ধ অবিচ্ছেদ্য। একমাত্র প্রাণ-শক্তিই জড় ও চৈতন্যের যোগ সাধন করে। যেখানে প্রাণ নেই, সেখানে জড়ে ও চৈতন্যে মিলনও দেখা যায় না। প্রাণই আমাদের দেহ ও মনের মধ্যে মধ্যস্থতা কর্‌ছে। প্রাণের পায়ের নীচে হচ্চে জড়জগৎ আর তার মাথার উপরে মনোজগৎ। প্রাণের ধর্ম্ম, যে, জীবনপ্রবাহ রক্ষা করা, নব নব সৃষ্টির দ্বারা সৃষ্টি রক্ষা করা,—এটি সর্ব্বলোকবিদিত। কিন্তু প্রাণের আর একটি বিশেষ ধর্ম্ম আছে যা সকলের কাছে সমান প্রত্যক্ষ নয়। সেটি হচ্চে এই যে, প্রাণ প্রতিমুহূর্ত্তে রূপান্তরিত হয়। হিন্দু-দর্শনের মতে, জীবের প্রাণময় কোষ, অন্নময় কোষ ও মনোময় কোষের মধ্যে অবস্থিত। প্রাণের

গতি উভয়মুখী। প্রাণের পক্ষে মনোময় কোষে ওঠা এবং অন্নময় কোষে নামা—দুই সম্ভব। প্রাণ অধোগতি প্রাপ্ত হয়ে জড়জগতের অন্তর্ভূত হয়ে যায়; আর উন্নত হয়ে মনোজগতের অন্তর্ভূত হয়। মনকে প্রাণের পরিণতি এবং জড়কে প্রাণের বিকৃতি বল্‌লেও অত্যুক্তি হয় না। প্রাণের স্বাভাবিক গতি হচ্ছে মনোজগতের দিকে; প্রাণের স্বাধীন স্ফূর্ত্তিতে বাধা দিলেই তা জড়তা প্রাপ্ত হয়। প্রাণ নিজের অভিব্যক্তির নিয়ম নিজে গড়ে নেয়;—বাইরের নিয়মে তাকে বদ্ধ করাতেই সে জড়জগতের অধীন হয়ে পড়ে। যেমন প্রাণী-জগতের রক্ষার জন্য নিত্য নূতন প্রাণের সৃষ্টি আবশ্যক এবং সে সৃষ্টির জন্য দেহের যৌবন চাই; তেমনি মনোজগতের এবং তদধীন কর্ম্ম-জগতের রক্ষার জন্য সেখানেও নিত্য নব সৃষ্টির আবশ্যক এবং সে সৃষ্টির জন্য মনের যৌবন চাই। পুরাতনকে আঁকড়ে থাকাই বার্দ্ধক্য অর্থাৎ জড়তা। মানসিক যৌবন লাভের জন্য প্রথম আবশ্যক—প্রাণ-শক্তি যে দৈবী শক্তি—এই বিশ্বাস।

এই মানসিক যৌবনই সমাজে প্রতিষ্ঠা করা হচ্ছে আমাদের উদ্দেশ্য। এবং কি উপায়ে তা সাধিত হতে পারে তাই হচ্ছে আলোচ্য।

আমরা সমগ্র সমাজকে একটি ব্যক্তিহিসেবে দেখলেও, আসলে মানবসমাজ হচ্ছে বহুব্যক্তির সমষ্টি। যে সমাজে বহু ব্যক্তির মানসিক যৌবন আছে, সেই সমাজেরই যৌবন আছে। দেহের যৌবনের সঙ্গে সঙ্গেই মনের যৌবনের অবির্ভাব হয়। সেই মানসিক যৌবনকে স্থায়ী করতে হলে, শৈশব নয়—বার্দ্ধক্যের দেশ আক্রমণ এবং অধিকার করতে হয়। দেহের যৌবনের অন্তে, বার্দ্ধক্যের রাজ্যে যৌবনের

অধিকার বিস্তার কর্‌বার শক্তি আমরা সমাজ হতেই সংগ্রহ কর্‌তে পারি। ব্যক্তিগত জীবনে ফাল্গুন একবার চলে গেলে আবার ফিরে আসে না; কিন্তু সমগ্র সমাজে ফাল্গুন চিরদিন বিরাজ করছে। সমাজে নূতন প্রাণ, নূতন মন, নিত্য জন্মলাভ করছে। অর্থাৎ নূতন সুখদুঃখ, নূতন আশা, নূতন ভালবাসা, নূতন কর্ত্তব্য ও নূতন চিন্তা, নিত্য উদয় হচ্ছে। সমগ্র সমাজের এই জীবন-প্রবাহ যিনি নিজের অন্তরে টেনে নিতে পারবেন তাঁর মনের যৌবনের আর ক্ষয়ের আশঙ্কা নেই। এবং তিনিই আবার কথায় ও কাজে সেই যৌবন সমাজকে ফিরিয়ে দিতে পারবেন।

এ যৌবনের কপালে রাজটীকা দিতে আপত্তি করবেন, এক জড়বাদী, আর এক মায়াবাদী; কারণ এঁরা উভয়েই এক মত। এঁরা উভয়েই বিশ্ব হতে তার অস্থির প্রাণটুকু বার করে দিয়ে, যে এক স্থিরতত্ত্ব লাভ করেন, তাকে জড়ই বল, আর চৈতন্যই বল, সে বস্তু হচ্ছে এক,—প্রভেদ যা, তা নামে।

বীরবল।

তৃতীয় সংখ্যা]　　　　আষাঢ় ১৩২১　　　　[প্রথম বর্ষ

সবুজ পত্র

সম্পাদক—শ্রীপ্রমথ চৌধুরী

সবুজ পত্র

শঙ্খ

তোমার শঙ্খ ধূলায় পড়ে',
কেমন করে সইব ?
বাতাস আলো গেল মরে'
এ কি রে দুর্দ্দৈব !
লড়বি কে আয় ধ্বজা বেয়ে,
গান আছে যার ওঠ্‌না গেয়ে,
চলবি যারা চল্‌রে ধেয়ে,
আয় না রে নিঃশঙ্ক !
ধূলায় পড়ে রইল চেয়ে
ঐ যে অভয় শঙ্খ !

চলেছিলেম পূজার ঘরে
        সাজিয়ে ফুলের অর্ঘ্য।
খুঁজি সারাদিনের পরে
        কোথায় শান্তি-স্বর্গ।
এবার আমার হৃদয়-ক্ষত
ভেবেছিলেম হবে গত,
ধুয়ে মলিন চিহ্ন যত
        হব নিষ্কলঙ্ক।
পথে দেখি ধূলায় নত
        তোমার মহাশঙ্খ।

আরতি-দীপ এই কি জ্বালা?
        এই কি আমার সন্ধ্যা?
গাঁথব রক্ত-জবার মালা?
        হায় রজনীগন্ধা!
ভেবেছিলেম যোঝাযুঝি
মিটিয়ে পাব বিরাম খুঁজি,
চুকিয়ে দিয়ে ঋণের পুঁজি
        লব তোমার অঙ্ক।
হেনকালে ডাকল বুঝি
        নীরব তব শঙ্খ!

যৌবনেরি পরশমণি
        করাও তবে স্পর্শ !
দীপক-তানে উঠুক ধ্বনি'
        দীপ্ত প্রাণের হর্ষ।
নিশার বক্ষ বিদার করে'
উদ্বোধনে গগন ভরে'
অন্ধ দিকে দিগন্তরে
        জাগাও না আতঙ্ক !
দুই হাতে আজ তুলব ধরে'
        তোমার জয়শঙ্খ।

জানি জানি তন্দ্রা মম
        রইবে না আর চক্ষে।
জানি শ্রাবণ-ধারাসম
        বাণ বাজিবে বক্ষে।
কেউ বা ছুটে আসবে পাশে,
কাঁদবে বা কেউ দীর্ঘশ্বাসে,
দুঃস্বপনে কাঁপবে ত্রাসে
        সুপ্তির পালঙ্ক।
বাজবে যে আজ মহোল্লাসে
        তোমার মহাশঙ্খ।

তোমার কাছে আরাম চেয়ে
        পেলেম শুধু লজ্জা।
এবার সকল অঙ্গ ছেয়ে
        পরাও রণসজ্জা।
ব্যাঘাত আসুক্ নব নব,
আঘাত খেয়ে অটল রব,
বক্ষে আমার দুঃখে, তব
        বাজ্‌বে জয়ডঙ্ক।
দেব সকল শক্তি, লব
        অভয় তব শঙ্খ!

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

আষাঢ়

ঋতুতে ঋতুতে যে ভেদ সে কেবল বর্ণের ভেদ নহে, বৃত্তিরও ভেদ বটে। মাঝে মাঝে বর্ণসঙ্কর দেখা দেয়—জ্যৈষ্ঠের পিঙ্গল জটা শ্রাবণের মেঘস্তূপে নীল হইয়া উঠে, ফাল্গুনের শ্যামলতায় বৃদ্ধ পৌষ আপনার পীত রেখা পুনরায় চালাইবার চেষ্টা করে। কিন্তু প্রকৃতির ধর্ম্মরাজ্যে এ সমস্ত বিপর্য্যয় টেঁকে না।

গ্রীষ্মকে ব্রাহ্মণ বলা যাইতে পারে। সমস্ত রসবাহুল্য দমন করিয়া, জঞ্জাল মারিয়া, তপস্যার আগুন জ্বালিয়া সে নিবৃত্তিমার্গের মন্ত্রসাধন করে। সাবিত্রী-মন্ত্র জপ করিতে করিতে কখনো বা, সে নিশ্বাস ধারণ করিয়া রাখে, তখন গুমটে গাছের পাতা নড়ে না; আবার যখন সে রুদ্ধ নিশ্বাস ছাড়িয়া দেয় তখন পৃথিবী কাঁপিয়া উঠে। ইহার আহারের আয়োজনটা প্রধানত ফলাহার।

বর্ষাকে ক্ষত্রিয় বলিলে দোষ হয় না। তাহার নকীব আগে আগে গুরুগুরু শব্দে দামামা বাজাইতে বাজাইতে আসে,—মেঘের পাগড়ি পরিয়া পশ্চাতে সে নিজে আসিয়া দেখা দেয়। অল্পে তাহার সন্তোষ নাই। দিগ্বিজয় করাই তাহার কাজ। লড়াই করিয়া সমস্ত আকাশটা দখল করিয়া সে দিক্চক্রবর্ত্তী হইয়া বসে। তমালতালীবন-রাজির নীলতম প্রান্ত হইতে তাহার রথের ঘর্ঘরধ্বনি শোনা যায়, তাহার বাঁকা তলোয়ারখানা ক্ষণে ক্ষণে কোষ হইতে বাহির হইয়া দিগ্বক্ষ বিদীর্ণ করিতে থাকে,. আর তাহার তূণ হইতে বরুণ-বাণ আর নিঃশেষ হইতে চায় না। এদিকে তাহার পাদপীঠের উপর

সবুজ কিংখাবের আস্তরণ বিছানো, মাথার উপরে ঘনপল্লবশ্যামল চন্দ্রাতপে সোনার কদম্বের ঝালর ঝুলিতেছে, আর বন্দিনী পূর্ব্বদিগ্বধূ পাশে দাঁড়াইয়া অশ্রুনয়নে তাহাকে কেতকীগন্ধবারিসিক্ত পাখা বীজন করিবার সময় আপন বিদ্যুন্মণিজড়িত কঙ্কণখানি ঝলকিয়া তুলিতেছে।

আর শীতটা বৈশ্য। তাহার পাকা ধান কাটাই-মাড়াইয়ের আয়োজনে চারিটি প্রহর ব্যস্ত, কলাই যব ছোলার প্রচুর আশ্বাসে ধরণীর ডালা পরিপূর্ণ। প্রাঙ্গণে গোলা ভরিয়া উঠিয়াছে, গোষ্ঠে গোরুর পাল রোমন্থ করিতেছে, ঘাটে ঘাটে নৌকা বোঝাই হইল, পথে পথে ভারে মন্থর হইয়া গাড়ি চলিয়াছে; আর ঘরে ঘরে নবান্ন এবং পিঠাপার্ব্বণের উদ্যোগে ঢেঁকিশালা মুখরিত।

এই তিনটেই প্রধান বর্ণ। আর শূদ্র যদি বল সে শরৎ ও বসন্ত। একজন শীতের, আর একজন গ্রীষ্মের তল্পি বহিয়া আনে। মানুষের সঙ্গে এইখানে প্রকৃতির তফাৎ। প্রকৃতির ব্যবস্থায় যেখানে সেবা সেইখানেই সৌন্দর্য্য, যেখানে নম্রতা সেইখানেই গৌরব। তাহার সভায় শূদ্র যে, সে ক্ষুদ্র নহে, ভার যে বহন করে সমস্ত আভরণ তাহারই। তাই ত শরতের নীল পাগড়ির উপরে সোনার কল্কা, বসন্তের সুগন্ধ পীত উত্তরীয়খানি ফুলকাটা। ইহারা যে পাদুকা পরিয়া ধরণী-পথে বিচরণ করে তাহা রং-বেরঙের সূত্রশিল্পে বুটিদার; ইহাদের অঙ্গদে কুণ্ডলে অঙ্গুরীয়ে জহরতের সীমা নাই।

এই ত পাঁচটার হিসাব পাওয়া গেল। লোকে কিন্তু ছয়টা ঋতুর কথাই বলিয়া থাকে। ওটা নেহাৎ জোড় মেলাইবার জন্য। তাহারা জানেনা বেজোড় লইয়াই প্রকৃতির যত বাহার। ৩৬৫ দিনকে

দুই দিয়া ভাগ কর—৩৬ পর্য্যন্ত বেশ মেলে কিন্তু সব-শেষের ঐ ছোট্টো পাঁচ-টি কিছুতেই বাগ মানিতে চায় না। দুইয়ে দুইয়ে মিল হইয়া গেলে সে মিল থামিয়া যায়, অলস হইয়া পড়ে। এই জন্য কোথা হইতে একটা তিন আসিয়া সেটাকে নাড়া দিয়া তাহার যত রকম সঙ্গীত সমস্তটা বাজাইয়া তোলে। বিশ্বসভায় অমিল-সয়তানটা এই কাজ করিবার জন্যই আছে,—সে মিলের স্বর্গপুরীকে কোনো-মতেই ঘুমাইয়া পড়িতে দিবে না;—সেই ত নৃত্যপরা উর্ব্বশীর নূপুরে ক্ষণে ক্ষণে তাল কাটাইয়া দেয়—সেই বেতালটি সাম্‌লাইবার সময়েই সুরসভায় তালের রস-উৎস উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠে।

ছয় ঋতু গণনার একটা কারণ আছে। বৈশ্যকে তিন বর্ণের মধ্যে সব নীচে ফেলিলেও উহারই পরিমাণ বেশি। সমাজের নীচের বড় ভিত্তি ঐ বৈশ্য। এক দিক দিয়া দেখিতে গেলে সম্বৎসরের প্রধান বিভাগ শরৎ হইতে শীত। বৎসরের পূর্ণ পরিণতি ঐখানে। ফসলের গোপন আয়োজন সকল-ঋতুতেই কিন্তু ফসলের প্রকাশ হয় ঐ সময়েই। এই জন্য বৎসরের এই ভাগটাকে মানুষ বিস্তারিত করিয়া দেখে। এই অংশেই বাল্য যৌবন বার্দ্ধক্যের তিন মূর্ত্তিতে বৎসরের সফলতা মানুষের কাছে প্রত্যক্ষ হয়। শরতে তাহা চোখ জুড়াইয়া নবীন বেশে দেখা দেয়, হেমন্তে তাহা মাঠ ভরিয়া প্রবীণ শোভায় পাকে, আর শীতে তাহা ঘর ভরিয়া পরিণত রূপে সঞ্চিত হয়।

শরৎ-হেমন্ত-শীতকে মানুষ এক বলিয়া ধরিতে পারিত কিন্তু আপনার লাভটাকে সে থাকে থাকে ভাগ করিয়া দেখিতে ভালবাসে। তাহার স্পৃহনীয় জিনিষ একটি হইলেও সেটাকে অনেকখানি করিয়া

নাড়াচাড়া করাতেই তাহার সুখ। একখানা নোটে কেবলমাত্র সুবিধা, কিন্তু সারিবন্দী তোড়ায় যথার্থ মনের তৃপ্তি। এই জন্য ঋতুর যে অংশে তাহার লাভ সেই অংশে মানুষ ভাগ বাড়াইয়াছে। শরৎ-হেমন্ত-শীতে মানুষের ফসলের ভাণ্ডার, সেইজন্য সেখানে তাহার তিন মহল; ঐখানে তাহার গৃহলক্ষ্মী। আর যেখানে আছেন বনলক্ষ্মী সেখানে দুই মহল,—বসন্ত ও গ্রীষ্ম। ঐখানে তাহার ফলের ভাণ্ডার, বনভোজনের ব্যবস্থা। ফাল্গুনে বোল ধরিল, জ্যৈষ্ঠে তাহা পাকিয়া উঠিল। বসন্তে ঘ্রাণগ্রহণ, আর গ্রীষ্মে স্বাদগ্রহণ।

ঋতুর মধ্যে বর্ষাই কেবল একা একমাত্র। তাহার জুড়ি নাই। গ্রীষ্মের সঙ্গে তাহার মিল হয় না;—গ্রীষ্ম দরিদ্র, সে ধনী। শরতের সঙ্গেও তাহার মিল হইবার কোনো সম্ভাবনা নাই। কেননা শরৎ তাহারি সমস্ত সম্পত্তি নিলাম করাইয়া নিজের নদীনালা মাঠঘাটে বেনামি করিয়া রাখিয়াছে। যে ঋণী সে কৃতজ্ঞ নহে।

মানুষ বর্ষাকে খণ্ড করিয়া দেখে নাই; কেননা বর্ষা-ঋতুটা মানুষের সংসারব্যবস্থার সঙ্গে কোনোদিক দিয়া জড়াইয়া পড়ে নাই। তাহার দাক্ষিণ্যের উপর সমস্ত বছরের ফল-ফসল নির্ভর করে কিন্তু সে ধনী তেমন নয় যে নিজের দানের কথাটা রটনা করিয়া দিবে। শরতের মত মাঠে ঘাটে পত্রে পত্রে সে আপনার বদান্যতা ঘোষণা করে না। প্রত্যক্ষভাবে দেনা-পাওনার সম্পর্ক নাই বলিয়া মানুষ ফলাকাঙ্ক্ষা ত্যাগ করিয়া বর্ষার সঙ্গে ব্যবহার করিয়া থাকে। বস্তুত বর্ষার যা-কিছু প্রধান ফল তাহা গ্রীষ্মেরই ফলাহার-ভাণ্ডারের উদ্বৃত্ত।

এই জন্য বর্ষা-ঋতুটা বিশেষভাবে কবির ঋতু। কেননা কবি গীতার উপদেশকে ছাড়াইয়া গেছে। তাহার কর্ম্মেও অধিকার

নাই; ফলেও অধিকার নাই। তাহার কেবলমাত্র অধিকার ছুটিতে;—কর্ম্ম হইতে ছুটি, ফল হইতে ছুটি।

বর্ষা-ঋতুটাতে ফলের চেষ্টা অল্প এবং বর্ষার সমস্ত ব্যবস্থা কর্ম্মের প্রতিকূল। এই জন্য বর্ষায় হৃদয়টা ছাড়া পায়। ব্যাকরণে হৃদয় যে লিঙ্গই হউক, আমাদের প্রকৃতির মধ্যে সে যে স্ত্রীজাতীয় তাহাতে সন্দেহ নাই। এই জন্য কাজ-কর্ম্মের আপিসে বা লাভ-লোকসানের বাজারে সে আপনার পাল্কীর বাহির হইতে পারে না। সেখানে সে পর্দ্দা-নসিন।

বাবুরা যখন পূজার ছুটিতে আপনাদের কাজের সংসার হইতে দূরে পশ্চিমে হাওয়া খাইতে যান, তখন ঘরের বধূর পর্দ্দা উঠিয়া যায়। বর্ষায় আমাদের হৃদয়-বধূর পর্দ্দা থাকে না। বাদলার কর্ম্মহীন বেলায় সে যে কোথায় বাহির হইয়া পড়ে তাহাকে ধরিয়া রাখা দায় হয়। একদিন পয়লা আষাঢ়ে উজ্জয়িনীর কবি তাহাকে রামগিরি হইতে অলকায়, মর্ত্ত্য হইতে কৈলাস পর্য্যন্ত অনুসরণ করিয়াছেন।

বর্ষায় হৃদয়ের বাধা-ব্যবধান চলিয়া যায় বলিয়াই সে সময়টা বিরহী বিরহিনীর পক্ষে বড় সহজ সময় নয়। তখন হৃদয় আপনার সমস্ত বেদনার দাবী লইয়া সম্মুখে আসে। এদিক-ওদিকে আপিসের পেয়াদা থাকিলে সে অনেকটা চুপ করিয়া থাকে কিন্তু এখন তাহাকে থামাইয়া রাখে কে?

বিশ্বব্যাপারে মস্ত একটা ডিপার্টমেণ্ট্ আছে, সেটা বিনা কাজের। সেটা পাব্লিক্ ওয়ার্কস্ ডিপার্ট্মেণ্টের বিপরীত। সেখানে যে-সমস্ত কাণ্ড ঘটে সে একেবারে বেহিসাবী। সরকারী হিসাব পরিদর্শক হতাশ হইয়া সেখানকার খাতাপত্র পরীক্ষা একেবারে ছাড়িয়া দিয়াছে।

মনে কর, খামখা এত বড় আকাশটার আগাগোড়া নীল তুলি বুলাইবার কোনো দরকার ছিল না—এই শব্দহীন শূন্যটাকে বর্ণহীন করিয়া রাখিলে সে ত কোনো নালিশ চালাইত না। তাহার পরে, অরণ্যে প্রান্তরে লক্ষ লক্ষ ফুল একবেলা ফুটিয়া আর-একবেলা ঝরিয়া যাইতেছে, তাহাদের বোঁটা হইতে পাতার ডগা পর্য্যন্ত এত যে কারিগরি সেই অজস্র অপব্যয়ের জন্য কাহারো কাছে কি কোনো জবাবদিহি নাই? আমাদের শক্তির পক্ষে এ সমস্তই ছেলেখেলা, কোনো ব্যবহারে লাগে না; আমাদের বুদ্ধির পক্ষে এ সমস্তই মায়া, ইহার মধ্যে কোনো বাস্তবতা নাই।

আশ্চর্য্য এই যে, এই নিষ্প্রয়োজনের জায়গাটাই হৃদয়ের জায়গা। এই জন্য ফলের চেয়ে ফুলেই তাহার তৃপ্তি। ফল কিছু কম সুন্দর নয়, কিন্তু ফলের প্রয়োজনীয়তাটা এমন একটা জিনিষ যাহা লোভীর ভিড় জমায়; বুদ্ধি-বিবেচনা আসিয়া সেটা দাবী করে; সেই জন্য ঘোমটা টানিয়া হৃদয়কে সেখান হইতে একটু সরিয়া দাঁড়াইতে হয়। তাই দেখা যায় তাম্রবর্ণ পাকা আমের ভারে গাছের ডালগুলি নত হইয়া পড়িলে বিরহিণীর রসনায় যে রসের উত্তেজনা উপস্থিত হয় সেটা গীতি-কাব্যের বিষয় নহে। সেটা অত্যন্ত বাস্তব, সেটার মধ্যে যে প্রয়োজন আছে তাহা টাকা-আনা-পাইয়ের মধ্যে বাঁধা যাইতে পারে।

বর্ষা-ঋতু নিষ্প্রয়োজনের ঋতু। অর্থাৎ তাহার সঙ্গীতে, তাহার সমারোহে, তাহার অন্ধকারে, তাহার দীপ্তিতে, তাহার চাঞ্চল্যে, তাহার গাম্ভীর্য্যে তাহার সমস্ত প্রয়োজন কোথায় ঢাকা পড়িয়া গেছে। এই ঋতু ছুটির ঋতু। তাই ভারতবর্ষে বর্ষায় ছিল ছুটি—কেননা ভারতবর্ষে প্রকৃতির সঙ্গে মানুষের একটা বোঝাপড়া ছিল। ঋতুগুলি তাহার

দ্বারের বাহিরে দাঁড়াইয়া দর্শন না পাইয়া ফিরিত না। তাহার হৃদয়ের মধ্যে ঋতুর অভ্যর্থনা চলিত।

ভারতবর্ষের প্রত্যেক ঋতুরই একটা না একটা উৎসব আছে। কিন্তু কোন্ ঋতু যে নিতান্ত বিনা-কারণে তাহার হৃদয় অধিকার করিয়াছে তাহা যদি দেখিতে চাও তবে সঙ্গীতের মধ্যে সন্ধান কর। কেননা সঙ্গীতেই হৃদয়ের ভিতরকার কথাটা ফাঁস হইয়া পড়ে।

বলিতে গেলে ঋতুর রাগরাগিণী কেবল বর্ষার আছে আর বসন্তের। সঙ্গীত-শাস্ত্রের মধ্যে সকল ঋতুরই জন্য কিছু কিছু সুরের বরাদ্দ থাকা সম্ভব—কিন্তু সেটা কেবল শাস্ত্রগত। ব্যবহারে দেখিতে পাই বসন্তের জন্য আছে বসন্ত আর বাহার—আর বর্ষার জন্য মেঘ, মল্লার, দেশ, এবং আরো বিস্তর। সঙ্গীতের পাড়ায় ভোট লইলে বর্ষারই হয় জিত।

শরতে, হেমন্তে, ভরা-মাঠ, ভরা-নদীতে মন নাচিয়া ওঠে; তখন উৎসবেরও অন্ত নাই, কিন্তু রাগিণীতে তাহার প্রকাশ রহিল না কেন? তাহার প্রধান কারণ, ঐ ঋতুতে বাস্তব ব্যস্ত হইয়া আসিয়া মাঠঘাট জুড়িয়া বসে। বাস্তবের সভায় সঙ্গীত মুজরা দিতে আসে না—যেখানে অখণ্ড অবকাশ সেখানেই সে সেলাম করিয়া বসিয়া যায়।

যাহারা বস্তুর কারবার করিয়া থাকে তাহারা যেটাকে অবস্তু ও শূন্য বলিয়া মনে করে সেটা কম জিনিষ নয়। লোকালয়ের হাটে ভূমি বিক্রি হয়, আকাশ বিক্রি হয় না। কিন্তু পৃথিবীর বস্তু-পিণ্ডকে ঘেরিয়া যে বায়ুমণ্ডল আছে, জ্যোতির্লোক হইতে আলোকের দূত সেই পথ দিয়াই আনাগোনা করে। পৃথিবীর সমস্ত লাবণ্য ঐ বায়ু-মণ্ডলে। ঐখানেই তাহার জীবন। ভূমি ধ্রুব, তাহা ভারি, তাহার একটা হিসাব পাওয়া যায়। কিন্তু বায়ু-মণ্ডলে যে কত পাগলামি তাহা বিজ্ঞ লোকের

অগোচর নাই। তাহার মেজাজ কে বোঝে? পৃথিবীর সমস্ত প্রয়োজন ধূলির উপরে, কিন্তু পৃথিবীর সমস্ত সঙ্গীত ঐ শূন্যে,—যেখানে তাহার অপরিচ্ছিন্ন অবকাশ।

মানুষের চিত্তের চারিদিকেও একটি বিশাল অবকাশের বায়ু-মণ্ডল আছে। সেইখানেই তাহার নানারঙের খেয়াল ভাসিতেছে; সেইখানেই অনন্ত তাহার হাতে আলোকের রাখী বাঁধিতে আসে; সেইখানেই ঝড়বৃষ্টি, সেইখানেই উনপঞ্চাশ বায়ুর উন্মত্ততা, সেখানকার কোনো হিসাব পাওয়া যায় না। মানুষের যে অতিচৈতন্যলোকে অভাবনীয়ের লীলা চলিতেছে সেখানে যে-সব অকেজো লোক আনাগোনা রাখিতে চায়—তাহারা মাটিকে মান্য করে বটে কিন্তু এই বিপুল অবকাশের মধ্যেই তাহাদের বিহার। সেখানকার ভাষাই সঙ্গীত। এই সঙ্গীতে বাস্তবলোকে বিশেষ কি কাজ হয় জানি না—কিন্তু ইহারই কম্পমান পক্ষের আঘাত-বেগে অতিচৈতন্যলোকের সিংহদ্বার খুলিয়া যায়।

মানুষের ভাষার দিকে একবার তাকাও। ঐ ভাষাতে মানুষের প্রকাশ; সেই জন্য উহার মধ্যে এত রহস্য। শব্দের বস্তুটা হইতেছে তাহার অর্থ। মানুষ যদি কেবলমাত্র হইত বাস্তব, তবে তাহার ভাষার শব্দে নিছক্ অর্থ ছাড়া আর কিছুই থাকিত না। তবে তাহার শব্দ কেবলমাত্র খবর দিত,—সুর দিত না। কিন্তু বিস্তর শব্দ আছে যাহার অর্থ-পিণ্ডের চারিদিকে আকাশের অবকাশ আছে, একটা বায়ু-মণ্ডল আছে। তাহারা যেটুকু জানায় তাহারা তাহার চেয়ে অনেক বেশি—তাহাদের ইসারা তাহাদের বাণীর চেয়ে বড়। ইহাদের পরিচয় তদ্ধিত প্রত্যয়ে নহে, চিত্তপ্রত্যয়ে। এই সমস্ত অবকাশওয়ালা কথা লইয়া অবকাশ-বিহারী কবিদের কারবার। এই অবকাশের বায়ু-মণ্ডলেই নানা

রঙিন আলোর রং ফলাইবার সুযোগ—এই ফাঁকটাতেই ছন্দগুলি নানা ভঙ্গীতে হিল্লোলিত হয়।

এই সমস্ত অবকাশবহুল রঙিন শব্দ যদি না থাকিত তবে বুদ্ধির কোনো ক্ষতি হইত না কিন্তু হৃদয় যে বিনা প্রকাশে বুক ফাটিয়া মরিত। অনির্ব্বচনীয়কে লইয়া তাহার প্রধান কারবার; এই জন্য অর্থে তাহার অতি সামান্য প্রয়োজন। বুদ্ধির দরকার গতিতে, কিন্তু হৃদয়ের দরকার নৃত্যে। গতির লক্ষ্য—একাগ্র হইয়া লাভ করা, নৃত্যের লক্ষ্য—বিচিত্র হইয়া প্রকাশ করা। ভিড়ের মধ্যে ভিড়িয়াও চলা যায় কিন্তু ভিড়ের মধ্যে নৃত্য করা যায় না। নৃত্যের চারিদিকে অবকাশ চাই। এই জন্য হৃদয় অবকাশ দাবী করে। বুদ্ধিমান তাহার সেই দাবীটাকে অবাস্তব এবং তুচ্ছ বলিয়া উড়াইয়া দেয়।

আমি বৈজ্ঞানিক নহি কিন্তু অনেক দিন ছন্দ লইয়া ব্যবহার করিয়াছি বলিয়া ছন্দের তত্ত্বটা কিছু বুঝি বলিয়া মনে হয়। আমি জানি ছন্দের যে অংশটাকে যতি বলে অর্থাৎ যেটা ফাঁকা, অর্থাৎ ছন্দের বস্তু-অংশ যেখানে নাই সেইখানেই ছন্দের প্রাণ—পৃথিবীর প্রাণটা যেমন মাটিতে নহে, তাহার বাতাসেই। ইংরাজিতে যতিকে বলে pause—কিন্তু pause শব্দে একটা অভাব সূচনা করে যতি সেই অভাব নহে। সমস্ত ছন্দের ভাবটাই ঐ যতির মধ্যে—কারণ যতি ছন্দকে নিরস্ত করে না, নিয়মিত করে। ছন্দ যেখানে যেখানে থামে সেইখানেই তাহার ইসারা ফুটিয়া উঠে, সেইখানেই সে নিশ্বাস ছাড়িয়া আপনার পরিচয় দিয়া বাঁচে।

এই প্রমাণটি হইতে আমি বিশ্বাস করি বিশ্বরচনায় কেবলি

যে সমস্ত যতি দেখা যায় সেইখানে শূন্যতা নাই, সেইখানেই বিশ্বের প্রাণ কাজ করিতেছে। শুনিয়াছি অণু-পরমাণুর মধ্যে কেবলি ছিদ্র,—আমি নিশ্চয় জানি সেই ছিদ্রগুলির মধ্যেই বিরাটের অবস্থান। ছিদ্রগুলিই মুখ্য, বস্তুগুলিই গৌণ। যাহাকে শূন্য বলি বস্তুগুলি তাহারই অশ্রান্ত লীলা। সেই শূন্যই তাহাদিগকে আকার দিতেছে, গতি দিতেছে, প্রাণ দিতেছে। আকর্ষণ-বিকর্ষণ ত সেই শূন্যেরই কুস্তির প্যাঁচ। জগতের বস্তুব্যাপার সেই শূন্যের, সেই মহাযতির, পরিচয়। এই বিপুল বিচ্ছেদের ভিতর দিয়াই জগতের সমস্ত যোগ সাধন হইতেছে—অণুর সঙ্গে অণুর, পৃথিবীর সঙ্গে সূর্য্যের, নক্ষত্রের সঙ্গে নক্ষত্রের। সেই বিচ্ছেদ-মহাসমুদ্রের মধ্যে মানুষ ভাসিতেছে বলিয়াই মানুষের শক্তি, মানুষের জ্ঞান, মানুষের প্রেম, মানুষের যত কিছু লীলাখেলা। এই মহাবিচ্ছেদ যদি বস্তুতে নিরেট হইয়া ভরিয়া যায় তবে একেবারে নিবিড় একটানা মৃত্যু।

মৃত্যু আর কিছু নহে—বস্তু যখন আপনার অবকাশকে হারায় তখন তাহাই মৃত্যু। বস্তু তখন যেটুকু কেবলমাত্র সেইটুকুই, তার বেশি নয়। প্রাণ সেই মহা-অবকাশ—যাহাকে অবলম্বন করিয়া বস্তু আপনাকে কেবলি আপনি ছাড়াইয়া চলিতে পারে।

বস্তু-বাদীরা মনে করে অবকাশটা নিশ্চল কিন্তু যাহারা অবকাশ-রসের রসিক তাহারা জানে বস্তুটাই নিশ্চল, অবকাশই তাহাকে গতি দেয়। রণক্ষেত্রে সৈন্যের অবকাশ নাই; তাহারা কাঁধে কাঁধ মিলাইয়া ব্যূহরচনা করিয়া চলিয়াছে, তাহারা মনে ভাবে আমরাই যুদ্ধ করিতেছি। কিন্তু যে-সেনাপতি অবকাশে নিমগ্ন হইয়া দূর হইতে স্তব্ধভাবে দেখিতেছে, সৈন্যদের সমস্ত চলা তাহারই মধ্যে। নিশ্চলের

যে ভয়ঙ্কর চলা তাহার রুদ্রবেগ যদি দেখিতে চাও তবে দেখ ঐ নক্ষত্র-মণ্ডলীর আবর্ত্তনে; দেখ যুগযুগান্তরের তাণ্ডব-নৃত্যে। যে নাচিতেছে না তাহারই নাচ এই সকল চঞ্চলতায়।

এত কথা যে বলিতে হইল তাহার কারণ, কবিশেখর কালিদাস যে আষাঢ়কে আপনার মন্দাক্রান্তাচ্ছন্দের অম্লান মালাটি পরাইয়া বরণ করিয়া লইয়াছেন তাহাকে ব্যস্ত-লোকেরা "আষাঢ়ে" বলিয়া অবজ্ঞা করে। তাহারা মনে করে এই মেঘাবগুণ্ঠিত বর্ষণ-মঞ্জীর-মুখর মাসটি সকল-কাজের বাহির, ইহার ছায়াবৃত প্রহরগুলির পসরায় কেবল বাজে-কথার পণ্য! অন্যায় মনে করে না। সকল-কাজের-বাহিরের যে দলটি যে অহৈতুকী স্বর্গসভায় আসন লইয়া বাজে-কথার অমৃত পান করিতেছে, কিশোর আষাঢ় যদি আপন আলোল কুন্তলে নবমালতীর মালা জড়াইয়া সেই সভার নীলকান্তমণির পেয়ালা ভরিবার ভার লইয়া থাকে, তবে স্বাগত, হে নবঘনশ্যাম, আমরা তোমাকে অভিবাদন করি। এস এস জগতের যত অকর্ম্মণ্য, এস এস ভাবের ভাবুক, রসের রসিক,—আষাঢ়ের মৃদঙ্গ ঐ বাজিল, এস সমস্ত ক্ষ্যাপার দল, তোমাদের নাচের ডাক পড়িয়াছে। বিশ্বের চির-বিরহ-বেদনার অশ্রু-উৎস আজ খুলিয়া গেল, আজ তাহা আর মানা মানিল না। এস গো অভিসারিকা, কাজের সংসারে কপাট পড়িয়াছে, হাটের পথে লোক নাই, চকিত বিদ্যুতের আলোকে আজ যাত্রায় বাহির হইবে—জাতীপুষ্পসুগন্ধিবনান্ত হইতে সজল বাতাসে আহ্বান আসিল—কোন্ ছায়াবিতানে বসিয়া আছে বহুযুগের চিরজাগ্রত প্রতীক্ষা!

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

বোষ্টমী

আমি লিখিয়া থাকি অথচ লোকরঞ্জন আমার কলমের ধর্ম্ম নয় এইজন্য লোকেও আমাকে সদাসর্ব্বদা যে রঙে রঞ্জিত করিয়া থাকে তাহাতে কালীর ভাগই বেশি। আমার সম্বন্ধে অনেক কথাই শুনিতে হয়—কপালক্রমে সেগুলি হিতকথা নয়, মনোহারী ত নহেই।

শরীরে যেখানটায় ঘা পড়িতে থাকে সে জায়গাটা যত তুচ্ছই হোক্ সমস্ত দেহটাকে বেদনার জোরে সেই ছাড়াইয়া যায়। যে লোক গালি খাইয়া মানুষ হয় সে আপনার স্বভাবকে যেন ঠেলিয়া এক-ঝোঁকা হইয়া পড়ে। আপনার চারিদিককে ছাড়াইয়া আপনাকেই কেবল তাহার মনে পড়ে—সেটা আরামও নয়, কল্যাণও নয়। আপনাকে ভোলাটাই ত স্বস্তি।

আমাকে তাই ক্ষণে ক্ষণে নির্জ্জনের খোঁজ করিতে হয়। মানুষের ঠেলা খাইতে খাইতে মনের চারিদিকে যে টোল খাইয়া যায়, বিশ্বপ্রকৃতির সেবানিপুণ হাতখানির গুণে তাহা ভরিয়া উঠে।

কলিকাতা হইতে দূরে নিভৃতে আমার একটি অজ্ঞাতবাসের আয়োজন আছে; আমার নিজ-চর্চ্চার দৌরাত্ম্য হইতে সেইখানে অন্তর্ধান করিয়া থাকি। সেখানকার লোকেরা এখনো আমার সম্বন্ধে কোনো একটা সিদ্ধান্তে আসিয়া পৌঁছে নাই। তাহারা দেখিয়াছে আমি ভোগী নই, পল্লীর রজনীকে কলিকাতার কলুষে আবিল করি না; আবার যোগীও নই, কারণ দূর হইতে আমার যেটুকু পরিচয় পাওয়া যায় তাহার মধ্যে ধনের লক্ষণ আছে।

আমি পথিক নহি, পল্লীর রাস্তায় ঘুরি বটে কিন্তু কোথাও পৌঁছিবার দিকে আমার কোনো লক্ষ্যই নাই; আমি যে গৃহী এমন কথা বলাও শক্ত, কারণ ঘরের লোকের প্রমাণাভাব। এইজন্য পরিচিত জীবশ্রেণীর মধ্যে আমাকে কোনো-একটা প্রচলিত কোঠায় না ফেলিতে পারিয়া গ্রামের লোক আমার সম্বন্ধে চিন্তা করা একরকম ছাড়িয়া দিয়াছে—আমিও নিশ্চিন্ত আছি।

অল্পদিন হইল খবর পাইয়াছি এই গ্রামে একজন মানুষ আছে যে আমার সম্বন্ধে কিছু-একটা মনে ভাবিয়াছে; অন্তত বোকা ভাবে নাই।

তাহার সঙ্গে প্রথম দেখা হইল তখন আষাঢ়মাসের বিকালবেলা। কান্না শেষ হইয়া গেলেও চোখের পল্লব ভিজা থাকিলে যেমন ভাবটা হয়, সকালবেলাকার বৃষ্টি-অবসানে সমস্ত লতাপাতা আকাশ ও বাতাসের মধ্যে সেই ভাবটা ছিল। আমাদের পুকুরের উঁচু পাড়িটার উপর দাঁড়াইয়া আমি একটি নধর শ্যামল গাভীর ঘাস খাওয়া দেখিতেছিলাম। তাহার চিক্কণ দেহটির উপর রৌদ্র পড়িয়াছিল দেখিয়া ভাবিতেছিলাম আকাশের আলো হইতে সভ্যতা আপনার দেহটাকে পৃথক করিয়া রাখিবার জন্য যে এত দরজির দোকান বানাইয়াছে ইহার মত এমন অপব্যয় আর নাই।

এমন সময় হঠাৎ দেখি একটি প্রৌঢ়া স্ত্রীলোক আমাকে ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করিল। তাহার আঁচলে কতকগুলি ঠোঙার মধ্যে করবী, গন্ধরাজ এবং আরো দুইচার রকমের ফুল ছিল। তাহারই মধ্যে একটি আমার হাতে দিয়া ভক্তির সঙ্গে জোড়হাত করিয়া সে বলিল—আমার ঠাকুরকে দিলাম।—বলিয়া চলিয়া গেল।

৩

আমি এমনি আশ্চর্য্য হইয়া গেলাম যে তাহাকে ভালো করিয়া দেখিতেই পাইলাম না।

ব্যাপারটা নিতান্তই সাদা অথচ আমার কাছে তাহা এমন করিয়া প্রকাশ হইল যে, সেই যে গাভীটি বিকালবেলাকার ধূসররৌদ্রে ল্যাজ দিয়া পিঠের মাছি তাড়াইতে তাড়াইতে নববর্ষার রসকোমল ঘাসগুলি বড় বড় নিশ্বাস ফেলিতে ফেলিতে শান্ত আনন্দে খাইয়া বেড়াইতেছে তাহার জীব-লীলাটি আমার কাছে বড় অপরূপ হইয়া দেখা দিল। এ কথা বলিলে লোকে হাসিবে কিন্তু আমার মন ভক্তিতে ভরিয়া উঠিল। আমি সহজ-আনন্দময় জীবনেশ্বরকে প্রণাম করিলাম। বাগানের আমগাছ হইতে পাতা-সমেত একটি কচি আমের ডাল লইয়া সেই গাভীকে খাওয়াইলাম। আমার মনে হইল আমি দেবতাকে সন্তুষ্ট করিয়া দিলাম।

ইহার পরবৎসর যখন সেখানে গিয়াছি তখন মাঘের শেষ। সে বার তখনো শীত ছিল। সকালের রৌদ্রটি পূবের জানলা দিয়া আমার পিঠে আসিয়া পড়িয়াছিল, তাহাকে নিষেধ করি নাই। দোতলার ঘরে বসিয়া লিখিতেছিলাম, বেহারা আসিয়া খবর দিল, আনন্দীবোষ্টমী আমার সঙ্গে দেখা করিতে চায়। লোকটা কে জানি না, অন্যমনস্ক হইয়া বলিলাম, আচ্ছা এইখানে নিয়ে আয়!

বোষ্টমী পায়ের ধূলা লইয়া আমাকে প্রণাম করিল। দেখিলাম সেই আমার পূর্ব্বপরিচিত স্ত্রীলোকটি। সে সুন্দরী কি না সেটা লক্ষ্যগোচর হইবার বয়স তাহার পার হইয়া গেছে। দোহারা, সাধারণ স্ত্রীলোকের চেয়ে লম্বা; একটি নিয়ত ভক্তিতে তাহার শরীরটি নম্র, অথচ বলিষ্ঠ নিঃসঙ্কোচ তাহার ভাব। সব চেয়ে

চোখে পড়ে তাহার দুই চোখ। ভিতরকার কি-একটা শক্তিতে তাহার সেই বড় বড় চোখদুটি যেন কোন্ দূরের জিনিষকে কাছে করিয়া দেখিতেছে।

তাহার সেই দুই চোখ দিয়া আমাকে যেন ঠেলা দিয়া সে বলিল, এ আবার কি কাণ্ড? আমাকে তোমার এই রাজসিংহাসনের তলায় আনিয়া হাজির করা কেন? তোমাকে গাছের তলায় দেখিতাম, সে যে বেশ ছিল!

বুঝিলাম গাছ-তলায় এ আমাকে অনেক দিন লক্ষ্য করিয়াছে কিন্তু আমি ইহাকে দেখি নাই। সর্দ্দির উপক্রম হওয়াতে কয়েক দিন পথে ও বাগানে বেড়ানো বন্ধ করিয়া ছাদের উপরেই সন্ধ্যাকাশের সঙ্গে মোকাবিলা করিয়া থাকি—তাই কিছুদিন সে আমাকে দেখিতে পায় নাই।

একটুক্ষণ থামিয়া সে বলিল, গৌর, আমাকে কিছু-একটা উপদেশ দাও।

আমি মুস্কিলে পড়িলাম। বলিলাম, উপদেশ দিতে পারি না, নিতেও পারি না। চোখ মেলিয়া চুপ করিয়া যাহা পাই তাহা লইয়াই আমার কারবার। এই যে তোমাকে দেখিতেছি আমার দেখাও হইতেছে শোনাও হইতেছে।

বোষ্টমী ভারি খুসী হইয়া গৌর গৌর বলিয়া উঠিল। কহিল, ভগবানের ত শুধু রসনা নয় তিনি যে সর্ব্বাঙ্গ দিয়া কথা কন।

আমি বলিলাম, চুপ করিলেই সর্ব্বাঙ্গ দিয়া তাঁর সেই সর্ব্বাঙ্গের কথা শোনা যায়। তাই শুনিতেই সহর ছাড়িয়া এখানে আসি।

বোষ্টমী কহিল, সেটা আমি বুঝিয়াছি তাই ত তোমার কাছে আসিয়া বসিলাম।

যাইবার সময় সে আমার পায়ের ধূলা লইতে গিয়া দেখিলাম আমার মোজাতে হাত ঠেকিয়া তাহার বড় বাধা বোধ হইল।

পরের দিন ভোরে সূর্য্য উঠিবার পূর্ব্বে আমি ছাদে আসিয়া বসিয়াছি। দক্ষিণে বাগানের ঝাউগাছগুলার মাথার উপর দিয়া একেবারে দিক্‌সীমা পর্য্যন্ত মাঠ ধূ ধূ করিতেছে। পূর্ব্বদিকে বাঁশ-বনে ঘেরা গ্রামের পাশে আখের ক্ষেতের প্রান্ত দিয়া প্রতিদিন আমার সাম্‌নে সূর্য্য উঠে। গ্রামের রাস্তাটা গাছের ঘনছায়ার ভিতর হইতে হঠাৎ বাহির হইয়া খোলা-মাঠের মাঝখান দিয়া বাঁকিয়া বহুদূরের গ্রামগুলির কাজ সারিতে চলিয়াছে।

সূর্য্য উঠিয়াছে কিনা জানিনা। একখানি শুভ্র কুয়াশার চাদর বিধবার ঘোমটার মত গ্রামের গাছগুলির উপর টানা রহিয়াছে। দেখিতে পাইলাম বোষ্টমী সেই ভোরের ঝাপ্‌সা-আলোর ভিতর দিয়া একটি সচল কুয়াশার মূর্ত্তির মত করতাল বাজাইয়া হরিনাম গান করিতে করিতে সেই পূর্বদিকের গ্রামের সমুখ দিয়া চলিয়াছে।

তন্দ্রাভাঙা চোখের পাতার মত একসময়ে কুয়াশাটা উঠিয়া গেল, এবং ঐ সমস্ত মাঠের ও ঘরের নানা কাজকর্ম্মের মাঝখানে শীতের রৌদ্রটি গ্রামের ঠাকুরদাদার মত আসিয়া বেশ করিয়া জমিয়া বসিল।

আমি তখন সম্পাদকের পেয়াদা বিদায় করিবার জন্য লিখিবার টেবিলে আসিয়া বসিয়াছি। এমন সময় সিঁড়িতে পায়ের শব্দের সঙ্গে একটা গানের সুর শোনা গেল। বোষ্টমী গুন্‌গুন্ করিতে

করিতে আসিয়া আমাকে প্রণাম করিয়া কিছু দূরে মাটিতে বসিল। আমি লেখা হইতে মুখ তুলিলাম।

সে বলিল, কাল আমি তোমার প্রসাদ পাইয়াছি।

আমি বলিলাম, সে কি কথা ?

সে কহিল, কাল সন্ধ্যার সময় কখন তোমার খাওয়া হয় আমি সেই আশায় দরজার বাহিরে বসিয়া ছিলাম। খাওয়া হইলে চাকর যখন পাত্র লইয়া বাহিরে আসিল তাহাতে কি ছিল জানিনা কিন্তু আমি খাইয়াছি।

আমি আশ্চর্য্য হইলাম। আমার বিলাত-যাওয়ার কথা সকলেই জানে। সেখানে কি খাইয়াছি, না খাইয়াছি তাহা অনুমান করা কঠিন নহে, কিন্তু গোবর খাই নাই। দীর্ঘকাল মাছমাংসে আমার রুচি নাই বটে কিন্তু আমার পাচকটির জাতিকুলের কথাটা প্রকাশ্য সভায় আলোচনা না করাই সঙ্গত। আমার মুখে বিস্ময়ের লক্ষণ দেখিয়া বোষ্টমী বলিল, যদি তোমার প্রসাদ খাইতেই না পারিব তবে তোমার কাছে আসিবার ত কোনো দরকার ছিল না।

আমি বলিলাম, লোকে জানিলে তোমার উপর ত তাদের ভক্তি থাকিবে না।

সে বলিল, আমি ত সকলকেই বলিয়া বেড়াইয়াছি। শুনিয়া উহারা ভাবিল আমার এইরকমই দশা।

বোষ্টমী যে-সংসারে ছিল উহার কাছে তাহার খবর বিশেষ কিছু পাইলাম না। কেবল এইটুকু শুনিয়াছি তাহার মায়ের অবস্থা বেশ ভালো, এবং এখনো তিনি বাঁচিয়া আছেন। মেয়েকে যে বহু লোক ভক্তি করিয়া থাকে সে খবর তিনি জানেন। তাঁহার

ইচ্ছা মেয়ে তাঁর কাছে গিয়া থাকে কিন্তু আনন্দীর মন তাহাতে সায় দেয় না।

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, তোমার চলে কি করিয়া ?

উত্তরে শুনিলাম তাহার ভক্তদের একজন তাহাকে সামান্য কিছু জমি দিয়াছে। তাহারই ফসলে সেও খায়, পাঁচজনে খায়, কিছুতে সে আর শেষ হয় না। বলিয়া একটু হাসিয়া কহিল, আমার ত সবই ছিল—সমস্ত ছাড়িয়া আসিয়াছি; আবার পরের কাছে মাগিয়া সংগ্রহ করিতেছি, ইহার কি দরকার ছিল বল ত।

সহরে থাকিতে এ প্রশ্ন উঠিলে সহজে ছাড়িতাম না। ভিক্ষা-জীবিতায় সমাজের কত অনিষ্ট তাহা বুঝাইতাম। কিন্তু এ জায়গায় আসিলে আমার পুঁথি-পড়া বিদ্যার সমস্ত ঝাঁজ একেবারে মরিয়া যায়। বোস্টমীর কাছে কোনো তর্কই আমার মুখ দিয়া বাহির হইতে চাহিল না—আমি চুপ করিয়া রহিলাম।

আমার উত্তরের অপেক্ষা না রাখিয়া সে আপনিই বলিয়া উঠিল —না, না, এই আমার ভাল। আমার মাগিয়া-খাওয়া অন্নই অমৃত।

তাহার কথার ভাবখানা আমি বুঝিলাম। প্রতিদিনই যিনি নিজে অন্ন জোগাইয়া দেন ভিক্ষার অন্নে তাঁহাকেই মনে পড়ে। আর ঘরে মনে হয় আমারই অন্ন আমি নিজের শক্তিতে ভোগ করিতেছি।

ইচ্ছা ছিল তাহার স্বামীর ঘরের কথা জিজ্ঞাসা করি কিন্তু সে নিজে বলিল না, আমিও প্রশ্ন করিলাম না।

এখানকার যে-পাড়ায় উচ্চবর্ণের ভদ্রলোকে থাকে সে পাড়ার প্রতি বোস্টমীর শ্রদ্ধা নাই। বলে, ঠাকুরকে উহারা কিছুই দেয়

না অথচ ঠাকুরের ভোগে উহারাই সবচেয়ে বেশি করিয়া ভাগ বসায়। গরীবরা ভক্তি করে আর উপবাস করিয়া মরে।

এ পাড়ার দুষ্কৃতির কথা অনেক শুনিয়াছি তাই বলিলাম, এই সকল দুর্ম্মতিদের মাঝখানে থাকিয়া ইহাদের মতিগতি ভালো কর তাহা হইলেই ত ভগবানের সেবা হইবে।

এইরকমের সব উঁচুদরের উপদেশ অনেক শুনিয়াছি এবং অন্যকে শুনাইতেও ভালবাসি। কিন্তু বোষ্টমীর ইহাতে তাক লাগিল না। আমার মুখের দিকে তাহার উজ্জ্বল চক্ষু দুটি রাখিয়া সে বলিল, তুমি বলিতেছ ভগবান পাপীর মধ্যেও আছেন তাই উহাদের সঙ্গ করিলেও তাঁহারই পূজা করা হয়। এই ত?

আমি কহিলাম, হাঁ।

সে বলিল, উহারা যখন বাঁচিয়া আছে তখন তিনিও উহাদের সঙ্গে আছেন বই কি! কিন্তু আমার তাহাতে কি? আমার ত পূজা ওখানে চলিবে না—আমার ভগবান যে উহাদের মধ্যে নাই। তিনি যেখানে আমি সেখানেই তাঁহাকে খুঁজিয়া বেড়াই।

বলিয়া সে আমাকে প্রণাম করিল। তাহার কথাটা এই যে, শুধু মত লইয়া কি হইবে? সত্য যে চাই। ভগবান সর্ব্বব্যাপী এটা একটা কথা—কিন্তু যেখানে আমি তাঁহাকে দেখি সেখানেই তিনি আমার সত্য।

এত বড় বাহুল্য কথাটাও কোনো কোনো লোকের কাছে বলা আবশ্যক যে আমাকে উপলক্ষ করিয়া বোষ্টমী যে ভক্তি করে আমি তাহা গ্রহণও করি না ফিরাইয়াও দিই না।

এখনকার কালের ছোঁয়াচ আমাকে লাগিয়াছে। আমি গীতা পড়িয়া থাকি এবং বিদ্বান লোকদের দ্বারস্থ হইয়া তাহাদের কাছে ধর্ম্মতত্ত্বের অনেক সূক্ষ্ম ব্যাখ্যা শুনিয়াছি। কেবল শুনিয়া শুনিয়াই বয়স বহিয়া যাইবার জো হইল, কোথাও ত কিছু প্রত্যক্ষ দেখিলাম না। এতদিন পরে নিজের দৃষ্টির অহঙ্কার ত্যাগ করিয়া এই শাস্ত্রহীনা স্ত্রীলোকের দুই চক্ষুর ভিতর দিয়া সত্যকে দেখিলাম। ভক্তি করিবার ছলে শিক্ষা দিবার একি আশ্চর্য্য প্রণালী!

পরদিন সকালে বোষ্টমী আসিয়া আমাকে প্রণাম করিয়া দেখিল তখনো আমি লিখিতে প্রবৃত্ত। বিরক্ত হইয়া বলিল, তোমাকে আমার ঠাকুর এত মিথ্যা খাটাইতেছেন কেন? যখনি আসি দেখিতে পাই লেখা লইয়াই আছ!

আমি বলিলাম, যে লোকটা কোনো কর্ম্মেরই নয় ঠাকুর তাহাকে বসিয়া-থাকিতে দেন না পাছে সে মাটি হইয়া যায়। যত রকমের বাজে কাজ করিবার ভার তাহারই উপরে।

আমি যে কত আবরণে আবৃত তাহাই দেখিয়া সে অধৈর্য্য হইয়া উঠে। আমার সঙ্গে দেখা করিতে হইলে অনুমতি লইয়া দোতলায় চড়িতে হয়, প্রণাম করিতে আসিয়া হাতে ঠেকে মোজা-জোড়া, সহজ দুটো কথা বলা এবং শোনার প্রয়োজন কিন্তু আমার মনটা আছে কোন্ লেখার মধ্যে তলাইয়া!

হাতজোড় করিয়া সে বলিল, গৌর, আজ ভোরে বিছানায় যেমনি উঠিয়া বসিয়াছি অমনি তোমার চরণ পাইলাম। আহা সেই তোমার দুখানি পা, কোনো ঢাকা নাই—সে কি ঠাণ্ডা! কি কোমল! কতক্ষণ মাথায় ধরিয়া রাখিলাম। সে ত খুব হইল।

তবে আর আমার এখানে আসিবার প্রয়োজন কি? প্রভু, এ আমার মোহ নয় ত, ঠিক করিয়া বল!

লিখিবার টেবিলের উপর ফুলদানিতে পূর্ব্বদিনের ফুল ছিল। মালী আসিয়া সেগুলি তুলিয়া লইয়া নূতন ফুল সাজাইবার উদ্যোগ করিল।

বোষ্টমী যেন ব্যথিত হইয়া বলিয়া উঠিল—বাস্? এ ফুলগুলি হইয়া গেল? তোমার আর দরকার নাই? তবে দাও দাও, আমাকে দাও!

এই বলিয়া ফুলগুলি অঞ্জলিতে লইয়া কতক্ষণ মাথা নত করিয়া একান্ত স্নেহে একদৃষ্টিতে দেখিতে লাগিল। কিছুক্ষণ পরে মুখ তুলিয়া বলিল, তুমি চাহিয়া দেখনা বলিয়াই এ ফুল তোমার কাছে মলিন হইয়া যায়। যখন দেখিবে তখন তোমার লেখাপড়া সব ঘুচিয়া যাইবে।

এই বলিয়া সে বহু যত্নে ফুলগুলি আপন আঁচলের প্রান্তে বাঁধিয়া লইয়া মাথায় ঠেকাইয়া বলিল, আমার ঠাকুরকে আমি লইয়া যাই।

কেবল ফুলদানিতে রাখিলেই যে ফুলের আদর হয় না তাহা বুঝিতে আমার বিলম্ব হইল না। আমার মনে হইল, ফুলগুলিকে যেন ইস্কুলের পড়া-না-পারা ছেলেদের মত প্রতিদিন আমি বেঞ্চের উপর দাঁড় করাইয়া রাখি।

সেইদিন সন্ধ্যার সময় যখন ছাদে বসিয়াছি বোষ্টমী আমার পায়ের কাছে আসিয়া বসিল। কহিল, আজ সকালে নাম শুনাইবার সময় তোমার প্রসাদী ফুলগুলি ঘরে ঘরে দিয়া আসিয়াছি। আমার ভক্তি দেখিয়া বেণী চক্রবর্ত্তী হাসিয়া বলিল, পাগ্‌লি, কাকে ভক্তি করিস্

তুই ? বিশ্বের লোকে যে তাকে মন্দ বলে। হাঁগো, সকলে নাকি তোমাকে গালি দেয় ?

কেবল একমুহূর্ত্তের জন্য মনটা সঙ্কুচিত হইয়া গেল। কালীর ছিটা এত দূরেও ছড়ায় !

বোষ্টমী বলিল, বেণী ভাবিয়াছিল আমার ভক্তিটাকে এক ফুঁয়ে নিবাইয়া দিবে। কিন্তু এ ত তেলের বাতি নয়, এ যে আগুন! আমার গৌর, ওরা তোমাকে গালি দেয় কেন গো ?

আমি বলিলাম, আমার পাওনা আছে বলিয়া। আমি হয় ত একদিন লুকাইয়া উহাদের মন চুরি করিবার লোভ করিয়াছিলাম।

বোষ্টমী কহিল, মানুষের মনে বিষ যে কত সে ত দেখিলে। লোভ আর টিঁকিবে না।

আমি বলিলাম, মনে লোভ থাকিলেই মারের মুখে থাকিতে হয়। তখন নিজেকে মারিবার বিষ নিজের মনই জোগায়। তাই আমার ওঝা আমারই মনটাকে নির্বিষ করিবার জন্য এত কড়া করিয়া ঝাড়া দিতেছেন।

বোষ্টমী কহিল, দয়াল ঠাকুর মারিতে মারিতে তবে মারকে খেদান। শেষ পর্য্যন্ত যে সহিতে পারে সেই বাঁচিয়া যায়।

সেই দিন সন্ধ্যার সময় অন্ধকার ছাদের উপর সন্ধ্যা-তারা উঠিয়া আবার অস্ত গেল--বোষ্টমী তাহার জীবনের কথা আমাকে শুনাইল।

আমার স্বামী বড় সাদা মানুষ। কোনো কোনো লোকে মনে করিত তাঁহার বুঝিবার শক্তি কম। কিন্তু আমি জানি যাহারা সাদা করিয়া বুঝিতে পারে তাহারাই মোটের উপর ঠিক বোঝে।

ইহাও দেখিয়াছি তাঁহার চাষবাস জমিজমার কাজে তিনি যে

ঠকিতেন তাহা নহে। বিষয়কাজ এবং ঘরের কাজ দুইই তাঁহার গোছালো ছিল। ধান-চাল-পাটের সামান্য যে একটু ব্যবসা করিতেন কখনো তাহাতে লোকসান করেন নাই। কেননা তাঁহার লোভ অল্প। যেটুকু তাঁহার দরকার সেটুকু তিনি হিসাব করিয়া চলিতেন; তার চেয়ে বেশি যা তাহা তিনি বুঝিতেনও না, তাহাতে হাতও দিতেন না।

আমার বিবাহের পূর্ব্বেই আমার শ্বশুর মারা গিয়াছিলেন এবং আমার বিবাহের অল্পদিন পরেই শাশুড়ির মৃত্যু হয়। সংসারে আমাদের মাথার উপরে কেহই ছিল না।

আমার স্বামী মাথার উপরে একজন উপরওয়ালাকে না বসাইয়া থাকিতে পারিতেন না। এমন কি, বলিতে লজ্জা হয়, আমাকে যেন তিনি ভক্তি করিতেন। তবু আমার বিশ্বাস তিনি আমার চেয়ে বুঝিতেন বেশি, আমি তাঁহার চেয়ে বলিতাম বেশি।

তিনি সকলের চেয়ে ভক্তি করিতেন তাঁহার গুরুঠাকুরকে। শুধু ভক্তি নয় সে ভালবাসা—এমন ভালবাসা দেখা যায় না।

গুরুঠাকুর তাঁর চেয়ে বয়সে কিছু কম। কি সুন্দর রূপ তাঁর!

(বলিতে বলিতে বোষ্টমী ক্ষণকাল থামিয়া তাহার সেই দূরবিহারী চক্ষু দুটিকে বহু দূরে পাঠাইয়া দিল এবং গুন গুন করিয়া গাহিল—

অরুণ-কিরণখানি তরুণ অমৃতে ছানি
কোন্ বিধি নিরমিল দেহা।)

এই গুরুঠাকুরের সঙ্গে বালককাল হইতে তিনি খেলা করিয়াছেন—তখন হইতেই তাঁহাকে আপন মনপ্রাণ সমর্পণ করিয়া দিয়াছেন।

তখন আমার স্বামীকে ঠাকুর বোকা বলিয়াই জানিতেন। সেই

জন্য তাঁহার উপর বিস্তর উপদ্রব করিয়াছেন। অন্য সঙ্গীদের সঙ্গে মিলিয়া পরিহাস করিয়া তাঁহাকে যে কত নাকাল করিয়াছেন তাহার সীমা নাই।

বিবাহ করিয়া এ সংসারে যখন আসিয়াছি তখন গুরুঠাকুরকে দেখি নাই। তিনি তখন কাশিতে অধ্যয়ন করিতে গিয়াছেন। আমার স্বামীই তাঁহাকে সেখানকার খরচ জোগাইতেন।

গুরুঠাকুর যখন দেশে ফিরিলেন তখন আমার বয়স বোধ করি আঠারো হইবে।

পনেরো বছর বয়সে আমার একটি ছেলে হইয়াছিল। বয়স কাঁচা ছিল বলিয়াই আমার সেই ছেলেটিকে আমি যত্ন করিতে শিখি নাই। পাড়ার সই-সাঙাতীদের সঙ্গে মিলিবার জন্যই তখন আমার মন ছুটিত। ছেলের জন্য ঘরে বাঁধা থাকিতে হয় বলিয়া এক এক সময় তাহার উপরে আমার রাগ হইত।

হায় রে, ছেলে যখন আসিয়া পৌঁছিয়াছে, মা তখনো পিছাইয়া পড়িয়া আছে, এমন বিপদ আর কি হইতে পারে? আমার গোপাল আসিয়া দেখিল তখনো তাহার জন্য ননী তৈরী নাই, তাই সে রাগ করিয়া চলিয়া গেছে—আমি আজও মাঠে ঘাটে তাহাকে খুঁজিয়া বেড়াইতেছি।

ছেলেটি ছিল বাপের নয়নের মণি। আমি তাহাকে যত্ন করিতে শিখি নাই বলিয়া তাহার বাপ কষ্ট পাইতেন। কিন্তু তাঁহার হৃদয় যে ছিল বোবা—আজ পর্য্যন্ত তাঁহার দুঃখের কথা কাহাকেও কিছু বলিতে পারেন নাই।

মেয়েমানুষের মত তিনি ছেলের যত্ন করিতেন। রাত্রে ছেলে কাঁদিলে আমার অল্প-বয়সের গভীর ঘুম তিনি ভাঙাইতে চাহিতেন না।

নিজে রাত্রে উঠিয়া দুধ গরম করিয়া খাওয়াইয়া কতদিন খোকাকে কোলে লইয়া ঘুম পাড়াইয়াছেন আমি তাহা জানিতে পারি নাই। তাঁহার সকল কাজই এমনি নিঃশব্দে। পূজাপার্ব্বণে জমিদারদের বাড়িতে যখন যাত্রা বা কথা হইত তিনি বলিতেন, আমি রাত জাগিতে পারি না, তুমি যাও আমি এখানেই থাকি। তিনি ছেলেটিকে লইয়া না থাকিলে আমার যাওয়া হইবে না এই জন্য তাঁহার ছুতা।

আশ্চর্য্য এই, তবু ছেলে আমাকেই সকলের চেয়ে বেশি ভাল-বাসিত। সে যেন বুঝিত সুযোগ পাইলেই আমি তাহাকে ফেলিয়া চলিয়া যাইব, তাই সে যখন আমার কাছে থাকিত তখনো ভয়ে ভয়ে থাকিত। সে আমাকে অল্প পাইয়াছিল বলিয়াই আমাকে পাইবার আকাঙ্ক্ষা তাহার কিছুতেই মিটিতে চাহিত না।

আমি যখন নাহিবার জন্য ঘাটে যাইতাম তাহাকে সঙ্গে লইবার জন্য সে আমাকে রোজ বিরক্ত করিত। ঘাটে সঙ্গিনীদের সঙ্গে আমার মিলনের জায়গা, সেখানে ছেলেকে লইয়া তাহার খবরদারি করিতে আমার ভালো লাগিত না। সেইজন্য পারৎপক্ষে তাহাকে লইয়া যাইতে চাহিতাম না।

সেদিন শ্রাবণ মাস। থাকে থাকে ঘন কালো মেঘে দুই-প্রহর বেলাটাকে একেবারে আগাগোড়া মুড়ি দিয়া রাখিয়াছে। স্নানে যাইবার সময় খোকা কান্না জুড়িয়া দিল। নিস্তারিণী আমাদের হেঁশেলের কাজ করিত, তাহাকে বলিয়া গেলাম, বাছা, ছেলেকে দেখিয়ো আমি ঘাটে একটা ডুব দিয়া আসিগে।

ঘাটে ঠিক সেই সময়টিতে আর কেহ ছিল না। সঙ্গিনীদের আসিবার অপেক্ষায় আমি সাঁতার দিতে লাগিলাম। দীঘিটা প্রাচীন

কালের—কোন্ রাণী কবে খনন করাইয়াছিলেন তাই ইহার নাম রাণী-সাগর। সাঁতার দিয়া এই দীঘি এপার-ওপার-করা মেয়েদের মধ্যে কেবল আমিই পারিতাম। বর্ষায় তখন কূলে কূলে জল। দীঘি যখন প্রায় অর্দ্ধেকটা পার হইয়া গেছি এমন সময় পিছন হইতে ডাক শুনিতে পাইলাম, মা! ফিরিয়া দেখি খোকা ঘাটের সিঁড়িতে নামিতে নামিতে আমাকে ডাকিতেছে। চীৎকার করিয়া বলিলাম, আর আসিস্‌নে, আমি যাচ্চি! নিষেধ শুনিয়া হাসিতে হাসিতে সে আরো নামিতে লাগিল। ভয়ে আমার হাতে পায়ে যেন খিল ধরিয়া আসিল, পার হইতে আর পারিই না। চোখ বুজিলাম। পাছে কি দেখিতে হয়। এমন সময় পিছল ঘাটে সেই দীঘির জলে খোকার হাসি চিরদিনের মত থামিয়া গেল। পার হইয়া আসিয়া সেই মায়ের কোলের-কাঙাল ছেলেকে জলের তলা হইতে তুলিয়া কোলে লইলাম কিন্তু আর সে মা-বলিয়া ডাকিল না।

আমার গোপালকে আমি এতদিন কাঁদাইয়াছি সেই সমস্ত অনাদর আজ আমার উপর ফিরিয়া আসিয়া আমাকে মারিতে লাগিল। বাঁচিয়া থাকিতে তাহাকে বরাবর যে ফেলিয়া চলিয়া গেছি আজ তাই সে দিনরাত আমার মনকে আঁকড়িয়া ধরিয়া রহিল।

আমার স্বামীর বুকে যে কতটা বাজিল সে কেবল তাঁর অন্তর্যামীই জানেন। আমাকে যদি গালি দিতেন ত ভালো হইত কিন্তু তিনি ত কেবল সহিতেই জানেন, কহিতে জানেন না।

এমনি করিয়া আমি যখন একরকম পাগল হইয়া আছি এমন সময় গুরুঠাকুর দেশে ফিরিয়া আসিলেন।

যখন ছেলে-বয়সে আমার স্বামী তাঁহার সঙ্গে একত্রে খেলাধূলা

করিয়াছেন তখন সে এক ভাব ছিল। এখন আবার দীর্ঘকাল বিচ্ছেদের পর যখন তাঁর ছেলে-বয়সের বন্ধু বিদ্যালাভ করিয়া ফিরিয়া আসিলেন তখন তাঁহার পরে আমার স্বামীর ভক্তি একেবারে পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল। কে বলিবে খেলার সাথী, ইঁহার সাম্‌নে তিনি যেন একেবারে কথা কহিতে পারিতেন না!

আমার স্বামী আমাকে সান্ত্বনা করিবার জন্য তাঁহার গুরুকে অনুরোধ করিলেন। গুরু আমাকে শাস্ত্র শুনাইতে লাগিলেন। শাস্ত্রের কথায় আমার বিশেষ ফল হইয়াছিল বলিয়া মনে ত হয় না। আমার কাছে সে সব কথার যা কিছু মূল্য সে তাঁহারই মুখের কথা বলিয়া। মানুষের কণ্ঠ দিয়াই ভগবান তাঁহার অমৃত মানুষকে পান করাইয়া থাকেন—অমন সুধাপাত্র ত তাঁর হাতে আর নাই। আবার, ঐ মানুষের কণ্ঠ দিয়াই ত সুধা তিনিও পান করেন।

গুরুর প্রতি আমার স্বামীর অজস্র ভক্তি আমাদের সংসারকে সর্ব্বত্র মৌচাকের ভিতরকার মধুর মত ভরিয়া রাখিয়াছিল। আমাদের আহার-বিহার ধনজন সমস্তই এই ভক্তিতে ঠাসা ছিল, কোথাও ফাঁক ছিল না। আমি সেই রসে আমার সমস্ত মন লইয়া ডুবিয়া তবে সান্ত্বনা পাইয়াছি। তাই দেবতাকে আমার গুরুর রূপেই দেখিতে পাইলাম।

তিনি আসিয়া আহার করিবেন এবং তারপর তাঁর প্রসাদ পাইব প্রতিদিন সকালে ঘুম হইতে উঠিয়াই এই কথাটি মনে পড়িত, আর সেই আয়োজনে লাগিয়া যাইতাম। তাঁহার জন্য তরকারি কুটিতাম আমার আঙুলের মধ্যে আনন্দ-ধ্বনি বাজিত। ব্রাহ্মণ নই, তাঁহাকে নিজের হাতে রাঁধিয়া খাওয়াইতে পারিতাম না তাই আমার হৃদয়ের সব ক্ষুধাটা মিটিত না।

তিনি যে জ্ঞানের সমুদ্র—সেদিকে ত তাঁর কোনো অভাব নাই। আমি সামান্য রমণী, আমি তাঁহাকে কেবল একটু খাওয়াইয়া-দাওয়াইয়া খুসি করিতে পারি তাহাতেও এতদিকে এত ফাঁক ছিল।

আমার গুরুসেবা দেখিয়া আমার স্বামীর মন খুসি হইতে থাকিত এবং আমার উপরে তাঁহার ভক্তি আরো বাড়িয়া যাইত। তিনি যখন দেখিতেন আমার কাছে শাস্ত্র-ব্যাখ্যা করিবার জন্য গুরুর বিশেষ উৎসাহ তখন তিনি ভাবিতেন গুরুর কাছে বুদ্ধিহীনতার জন্য তিনি বরাবর অশ্রদ্ধা পাইয়াছেন, তাঁহার স্ত্রী এবার বুদ্ধির জোরে গুরুকে খুসি করিতে পারিল এই তাঁহার সৌভাগ্য।

এমন করিয়া চার পাঁচ বছর কোথা দিয়া যে কেমন করিয়া কাটিয়া গেল তাহা চোখে দেখিতে পাইলাম না।

সমস্ত জীবনই এমনি করিয়া কাটিতে পারিত। কিন্তু গোপনে কোথায় একটা চুরি চলিতেছিল, সেটা আমার কাছে ধরা পড়ে নাই, অন্তর্যামীর কাছে ধরা পড়িল। তারপর একদিনে একটি মুহূর্ত্তে সমস্ত উলটপালট হইয়া গেল।

সেদিন ফাল্গুনের সকালবেলায় ঘাটে যাইবার ছায়া-পথে স্নান সারিয়া ভিজা-কাপড়ে ঘরে ফিরিতেছিলাম। পথের একটি বাঁকে আম-তলায় গুরুঠাকুরের সঙ্গে দেখা। তিনি কাঁধে একখানি গামছা লইয়া কোন্ একটা সংস্কৃত মন্ত্র আবৃত্তি করিতে করিতে স্নানে যাইতেছেন।

ভিজা-কাপড়ে তাঁর সঙ্গে দেখা হওয়াতে লজ্জায় একটু পাশ কাটাইয়া চলিয়া যাইবার চেষ্টা করিতেছি এমন সময়ে তিনি আমার নাম ধরিয়া ডাকিলেন। আমি জড়সড় হইয়া মাথা নীচু করিয়া দাঁড়াইলাম। তিনি আমার মুখের পরে দৃষ্টি রাখিয়া বলিলেন, তোমার দেহখানি সুন্দর।

ডালে ডালে রাজ্যের পাখী ডাকিতেছিল, পথের ধারে ধারে ঝোপে ঝাপে ভাঁটি ফুল ফুটিয়াছে, আমের ডালে বোল ধরিতেছে। মনে হইল সমস্ত আকাশ-পাতাল পাগল হইয়া আলুথালু হইয়া উঠিয়াছে। কেমন করিয়া বাড়ি গেলাম কিছু জ্ঞান নাই। একেবারে সেই ভিজা কাপড়েই ঠাকুর-ঘরে ঢুকিলাম, চোখে যেন ঠাকুরকে দেখিতে পাইলাম না—সেই ঘাটের পথের ছায়ার উপরকার আলোর চুম্‌কিগুলি আমার চোখের উপর কেবলি নাচিতে লাগিল।

সেদিন গুরু আহার করিতে আসিলেন, জিজ্ঞাসা করিলেন, আন্দী নাই কেন?

আমার স্বামী আমাকে খুঁজিয়া বেড়াইলেন কোথাও দেখিতে পাইলেন না।

ওগো আমার সে পৃথিবী আর নাই, আমি সে সূর্য্যের আলো আর খুঁজিয়া পাইলাম না। ঠাকুর-ঘরে আমার ঠাকুরকে ডাকি সে আমার দিকে মুখ ফিরাইয়া থাকে।

দিন কোথায় কেমন করিয়া কাটিল ঠিক জানি না। রাত্রে স্বামীর সঙ্গে দেখা হইবে। তখন যে সমস্ত নীরব এবং অন্ধকার। তখনি আমার স্বামীর মন যেন তারার মত ফুটিয়া উঠে। সেই আঁধারে এক-একদিন তাঁহার মুখে একটা-আধটা কথা শুনিয়া হঠাৎ বুঝিতে পারি এই সাদা মানুষটি যাহা বোঝেন তাহা কতই সহজে বুঝিতে পারেন।

সংসারের কাজ সারিয়া আসিতে আমার দেরি হয়। তিনি আমার জন্য বিছানার বাহিরে অপেক্ষা করেন। প্রায়ই তখন আমাদের গুরুর কথা কিছু-না-কিছু হয়।

অনেক রাত করিলাম। তখন তিন প্রহর হইবে, ঘরে আসিয়া

দেখি আমার স্বামী তখনো খাটে শোন নাই, নীচে শুইয়া ঘুমাইয়া পড়িয়াছেন। আমি অতি সাবধানে শব্দ না করিয়া তাঁহার পায়ের তলায় শুইয়া পড়িলাম। ঘুমের ঘোরে একবার তিনি পা ছুঁড়িলেন, আমার বুকের উপর আসিয়া লাগিল। সেইটেই আমি তাঁহার শেষ দান বলিয়া গ্রহণ করিয়াছি।

পরদিন ভোরে যখন তাঁর ঘুম ভাঙিল আমি তখন উঠিয়া বসিয়া আছি। জানলার বাহিরে কাঁঠালগাছটার মাথার উপর দিয়া আঁধারের একধারে অল্প একটু রং ধরিয়াছে—তখনো কাক ডাকে নাই।

আমি স্বামীর পায়ের কাছে মাথা লুটাইয়া প্রণাম করিলাম। তিনি তাড়াতাড়ি উঠিয়া বসিলেন এবং আমার মুখের দিকে অবাক হইয়া চাহিয়া রহিলেন।

আমি বলিলাম, আর আমি সংসার করিব না।

স্বামী বোধ করি ভাবিলেন তিনি স্বপ্ন দেখিতেছেন—কোনো কথাই বলিতে পারিলেন না।

আমি বলিলাম, আমার মাথার দিব্য, তুমি অন্য স্ত্রী বিবাহ কর। আমি বিদায় লইলাম।

স্বামী কহিলেন, তুমি এ কি বলিতেছ? তোমাকে সংসার ছাড়িতে কে বলিল?

আমি বলিলাম, গুরুঠাকুর।

স্বামী হতবুদ্ধি হইয়া গেলেন; গুরুঠাকুর! এমন কথা তিনি কখন বলিলেন?

আমি বলিলাম, আজ সকালে যখন স্নান করিয়া ফিরিতেছিলাম তাঁহার সঙ্গে দেখা হইয়াছিল। তখনি বলিলেন।

স্বামীর কণ্ঠ কাঁপিয়া গেল। জিজ্ঞাসা করিলেন—এমন আদেশ কেন করিলেন ?

আমি বলিলাম, জানি না। তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিয়ো, পারেন ত তিনিই বুঝাইয়া দিবেন।

স্বামী বলিলেন, সংসারে থাকিয়াও ত সংসার ত্যাগ করা যায়, আমি সেই কথা গুরুকে বুঝাইয়া বলিব।

আমি বলিলাম, হয় ত গুরু বুঝিতে পারেন কিন্তু আমার মন বুঝিবে না। আমার সংসার করা আজ হইতে ঘুচিল।

স্বামী চুপ করিয়া বসিয়া রহিলেন। আকাশ যখন ফরসা হইল তিনি বলিলেন, চল না, দুজনে একবার তাঁর কাছেই যাই।

আমি হাত জোড় করিয়া বলিলাম, তাঁর সঙ্গে আর আমার দেখা হইবে না।

তিনি আমার মুখের দিকে চাহিলেন, আমি মুখ নামাইলাম। তিনি আর কোনো কথা বলিলেন না।

আমি জানি আমার মনটা তিনি একরকম করিয়া দেখিয়া লইলেন।

পৃথিবীতে দুটি মানুষ আমাকে সব চেয়ে ভালবাসিয়াছিল, আমার ছেলে আর আমার স্বামী। সে ভালবাসা আমার নারায়ণ, তাই সে মিথ্যা সহিতে পারিল না। একটি আমাকে ছাড়িয়া গেল, একটিকে আমি ছাড়িলাম। এখন সত্যকে খুঁজিতেছি, আর ফাঁকি নয়।

এই বলিয়া সে গড় করিয়া প্রণাম করিল।

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

খেয়ালের জন্ম

(Terza Rima)

বাদশা ছিলেন এক পরম খেয়ালী,
বিলাসের অবতার, জাতে আফ্‌গান।
দিনে তাঁর নিত্য দোল, রাত্তিরে দেয়ালী ॥

জীবন তাঁহার ছিল শুধু নাচ গান,
—শাসন পালন রাজ্য করিতেন মন্ত্রী—
নর্ত্তকী দুবেলা দিত রূপের যোগান ॥

ঘিরে তারে রেখেছিল শত শত যন্ত্রী,
কারো যন্ত্র রুদ্রবীণ, কারো বা রবাব,—
স্পর্শে যার কেঁপে ওঠে হৃদয়ের তন্ত্রী ॥

কারো হস্তে সপ্তস্বরা, যন্ত্রের নবাব,—
ললিত গম্ভীর যার প্রসন্ন আওয়াজ,
মনের সুরের দেয় সুরেতে জবাব ॥

সেকালে কেবলি ছিল ধ্রুপদ রেওয়াজ,—
ছয় রাগ হয়েছিল এত দরবারি,
এক পা নড়িত নাকো, বিনা পাখোয়াজ ॥

সঙ্গীতের ছোট বড় যত কারবারি,
বধিতে সুরের প্রাণ হল অগ্রসর,—
দুহাতে উঁচিয়ে ধরে' তাল-তরবারি ॥

একদিন বাদশার জাঁকিয়ে আসর,
বসেছে ইয়ার যত আমির-ওমরা,
সাকীদের তাগিদের নাই অবসর ॥

দাড়িগোঁফে কেশেবেশে হোমরা-চোমরা
বড় বড় ওস্তাদেরা করে গুলতান্।
হেন সভা নাহি দেখি আমরা তোমরা!

সহসা বিরক্তস্বরে কহে সুলতান্,—
"শুনে কান ঝালাপালা হয়েছে আমার,
রাত্তিরে বেহাগ শুধু, দিনে মূলতান!

ভাল আর নাহি লাগে ধ্রুপদ ধামার।
সুরু করে দাও যবে রাগের আলাপ,
ভুলে যাও শিষ্ট রীতি সময়ে থামার!

বিলম্বিত তালে যবে করগো বিলাপ,
মূর্চ্ছনা ঝিমিয়ে পড়ে মূর্চ্ছাকে জিনিয়ে,—
নয়ত দূনেতে বকো সুরের প্রলাপ ॥

যে গান দুবেলা গাও ইনিয়ে-বিনিয়ে,
সে গানে জমক আছে, নাইকো চমক।
তাল হতে নারো নিতে সুরকে ছিনিয়ে ॥

কারিগরি করে' যবে লাগাও গমক,
তা শুনে আমার শুধু এই মনে হয়,—
রাগ যেন রাগিণীকে দিতেছে ধমক !"

গুণীগণে পরস্পরে মুখ চেয়ে রয়,
বাদশার কথা শুনে সবে হতভম্ব !
হেন সাধ্য নাহি কারো দুটি কথা কয় ॥

ভয়েতে সবার গায়ে ফুটিল কদম্ব,
আকাশ পড়িল যেন শিরেতে ভাঙিয়া,—
মুহূর্ত্তে হইল চূর্ণ ওস্তাদির দম্ভ ॥

নর্ত্তকীগণের মুখ উঠিল রাঙিয়া,
লাজে ভয়ে আন্দোলিত তাহাদের বুক,
মুক্ত হল ছিন্ন করি জরির আঙিয়া ॥

বাদশা কহিল পুনঃ, রাঙা করি মুখ—
"নাহি কি হেথায় হেন সঙ্গীত-নায়ক
যে পারে সৃজিতে গীতে নতুন কৌতুক ?

সভাপ্রান্তে ছিল বসে তরুণ গায়ক,
মদের নেশায় হয়ে একদম চুর,—
রূপেতে সাক্ষাৎ দেব কুসুম-সায়ক ॥

জড়িত কম্পিত স্বরে কহিল "হুজুর!
নাহি মানি দুনিয়ার কোনই বন্ধন,—
সার জানি দুনিয়ায় সুরা আর সুর ॥

অজানা সুরের এক অধীর স্পন্দন,
আজিকে হৃদয় মোর করিছে ব্যাকুল,—
কি যেন বুকের দ্বারে করিছে ক্রন্দন ॥

বাঁধা রাগ, গাঁথা তাল, এই দুই কূল
ছাপিয়ে ছোটাব আমি সঙ্গীতের বান,
উন্মত্ত উন্মুক্ত হবে সুর বিলকুল!"

এত বলি আরম্ভিল অর্থহীন গান,
তারায় চড়িয়ে সুর, মহা চীৎকারি,
আকাশে উড়ায়ে দিল পাপিয়ার তান ॥

ধ্রুপদেরে পদে পদে দিয়া টিট্‌কারি,
যুবকের কণ্ঠ হতে ঝলকে ঝলক,
উথলি উছলি পড়ে ঘন গিট্‌কারি ॥

অবাক বাদশাজাদা, না পড়ে পলক,
চোখের সুমুখে ভাসে সুরের চেহারা—
—প্রক্ষিপ্ত চরণ শূন্যে, বিক্ষিপ্ত অলক !

গায়ক বাদক ছিল সভায় যাহারা,
মনে মনে গণে সবে ঘটিল প্রলয়,—
কোথা সম্ কোথা ফাঁক্ ভেবে আত্মহারা !

শিহরিল নর্ত্তকীর কর-কিশলয়,—
স্ফুরিত সুরেতে লভি কম্পিত দরদ,
শিঞ্জিত হইল ত্রস্ত মণির বলয় ॥

শিকল ছিঁড়িয়া সুর, ভাঙিয়া গারদ,
শূন্যে ছুটি আক্রমিল স্বর্গের দেয়াল,—
সে গান কৌতুকে শোনে তুম্বুরু নারদ ॥

জন্মিল সুরার তেজে সুরের খেয়াল।
নেশায় বাদশা হাঁকে—"বাহবা বাহবা।"
ধ্রুপদীরা কহে রেগে—"ডাকিছে শেয়াল!"

শ্রীপ্রমথ চৌধুরী।

২৯শে মে, ১৯১৪।

ভারতবর্ষের ঐক্য

শ্রীযুক্ত রাধাকুমুদ মুখোপাধ্যায় উপরোক্ত নামে পুস্তিকা-আকারে ইংরাজি ভাষায় একটি প্রবন্ধ প্রকাশ করেছেন। যাঁরা দিবারাত্র জাতীয় ঐক্যের স্বপ্ন দেখেন তাঁদের পক্ষে, অর্থাৎ শিক্ষিত ব্যক্তিমাত্রেরই পক্ষে, এই ক্ষুদ্র পুস্তকের আলোচ্য বিষয়ের যথেষ্ট মূল্য আছে।

স্বদেশ কিম্বা স্বজাতির নাম উল্লেখ কর্‌বামাত্রই, একদলের লোক আমাদের মুখ-ছোপ দিয়ে বলেন—ও সব কথা উচ্চারণ কর্‌বার তোমাদের অধিকার নেই, কেননা ভারতবর্ষ বলে' কোন-একটা বিশেষ দেশ নেই, এবং ভারতবাসী বলে' কোন-একটা বিশেষ জাতি নেই। ভারতবর্ষের অর্থ হচ্ছে—ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র এবং পরস্পর-অসংযুক্ত নানা খণ্ড দেশ, এবং ভারতবাসীর অর্থ হচ্ছে—ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পরস্পর-সম্পর্কহীন নানা ভিন্ন জাতি।

ভারতবর্ষ যে একটি প্রকাণ্ড মহাদেশ, এ সত্য আবিষ্কার কর্‌বার জন্য পায়ে হেঁটে তীর্থ-পর্য্যটন কর্‌বার দরকার নেই। একবার এ দেশের মানচিত্রখানির উপর চোখ বুলিয়ে গেলেই আমাদের শ্রান্তি বোধ হয়, এবং শরীর না হোক, মন অবসন্ন হয়ে পড়ে। এবং ভারতবর্ষের জনসংখ্যা যে অগণ্য, আর এই কোটি কোটি লোক যে জাতি, ধর্ম্ম ও ভাষায় শত শত ভাগে বিভক্ত, এ সত্য আবিষ্কার কর্‌বার জন্যও সেন্সস্ রিপোর্ট পড়বার আবশ্যক নেই; চোখ কান খোলা থাকলেই তা আমাদের কাছে নিত্য প্রত্যক্ষ হয়ে ওঠে।

আমাদের জীবনের যে ঐক্য নেই, এ কথাও যেমন সত্য—

আমাদের মনে যে ঐক্যের আশা আছে, সে কথাও তেমনি সত্য। এক-ভারতবর্ষ হচ্ছে এ যুগের শিক্ষিত লোকের Utopia, সংস্কৃত ভাষায় যাকে বলে গন্ধর্ব্বপুরী। সে পুরী আকাশে ঝোলে এবং সকলের নিকট তা প্রত্যক্ষ নয়। কিন্তু যিনি একবার সে পুরীর মর্ম্মর প্রাচীর, মণিময় তোরণ, রজত সৌধ ও কনকচূড়ার সাক্ষাৎলাভ করেছেন—তিনি আকাশরাজ্য হতে আর চোখ ফেরাতে পারেন না। এক কথায় তিনি ভারতবর্ষের একতার দিবাস্বপ্ন দেখতে বাধ্য। অনেকের মতে দিবাস্বপ্ন দেখাটা নিন্দনীয়, কেননা ও-ব্যাপারে শুধু অলীকের সাধনা করা হয়। মানুষে কিন্তু, বাস্তবজগতের অজ্ঞতা-বশতঃ নয়, তার প্রতি অসন্তোষবশতঃই, চোখ-চেয়ে স্বপ্ন দেখে; সে স্বপ্নের মূল মানবহৃদয়ে প্রতিষ্ঠিত। এবং ইতিহাস এ সত্যের সাক্ষ্য দেয় যে, আজকের কল্পনা-রাজ্য কখন কখন কালকের বাস্তব-জগতে পরিণত হয়, অর্থাৎ দিবাস্বপ্ন কখন কখন ফলে। সুতরাং ভারতবর্ষের ঐক্যসাধন জাতীয়-জীবনের লক্ষ্য করে তোলা—অনেকের পক্ষে স্বাভাবিক, এবং সকলের পক্ষেই আবশ্যক। সমগ্র সমাজের বিশেষ-একটা-কোন লক্ষ্য না থাকায়, দিন দিন আমাদের সামাজিক জীবন নিৰ্জ্জীব, এবং ব্যক্তিগত জীবন সঙ্কীর্ণ হয়ে পড়ছে। পূর্ব্বে যে ঐক্যের কথা বলা গেল, তা অবশ্য ideal unity, এবং অধিকাংশ শিক্ষিত লোকের মনে এক-ভারতবর্ষ একটি বিরাট ideal-রূপেই বিরাজ করছে। আমাদের বাঞ্ছিত Utopia ভবিষ্যতের অঙ্কস্থ রয়েছে।

কিন্তু এই ideal-কে দুটি সম্পূর্ণ বিপরীত দিক থেকে নিত্যই আক্রমণ সহ্য করতে হয়। এক দিকে ইংরাজি সংবাদপত্র, অপর দিকে

বাঙ্গলা সংবাদপত্র, এই ideal-টিকে নিতান্ত উপহাসের পদার্থ মনে করেন। উভয়েই শিক্ষিত-সম্প্রদায়ের উপর বিদ্রূপবাণ বর্ষণ করেন। কাগজওয়ালাদের মতে এই মনোভাবটি বিদেশী-শিক্ষালব্ধ, এবং সেই জন্যই স্বদেশী-ভিত্তিহীন—কেননা ভারতবর্ষের অতীতের সঙ্গে তার কোনও যোগ নেই। ইংরাজি সংবাদপত্রের মতে ভারতবর্ষের সভ্যতার মূল এক নয়, বহু; এবং যা গোড়া হতেই পৃথক, তার আর কোনরূপ মিলন সম্ভব নয়। কুকুর আর বেড়াল নিয়ে এক-সমাজ গড়ে তোলা যায় না; ও দুই শ্রেণীর জীব শুধু গৃহস্বামীর চাবুকের ভয়ে একসঙ্গে ঘর করতে পারে। অপরপক্ষে বাঙ্গলা-সংবাদপত্রের মতে হিন্দুসমাজের বিশেষত্বই এই যে, তা বিভক্ত। এ সমাজ সতরঞ্চের ঘরের মত চক-কাটা। এবং কার কোন্ চক, তাও অতি সুনির্দ্দিষ্ট। এই সমাজের ঘরে, কে সিধে চল্‌বে, কে কোণাকুণি চল্‌বে, কে এক-পা চল্‌বে আর কে আড়াই-পা চল্‌বে, তারও বাঁধাবাঁধি নিয়ম আছে। এর নাম হচ্ছে বর্ণাশ্রম ধর্ম্ম। নিজের নিজের গণ্ডির ভিতর অবস্থিতি করে নিজের নিজের চাল রক্ষা করাই হচ্ছে ভারতবাসীর সনাতন ধর্ম্ম। সুতরাং যাঁরা সেই দাবার ঘরের রেখাগুলি মুছে দিয়ে সমগ্র সমাজকে একঘরে করতে চান, তাঁরা দেশের শত্রু। শিক্ষিত-সম্প্রদায় যে ঐক্য চান, তা ভারতবর্ষের ধাতে নেই—সুতরাং জাতির উন্নতির যে ব্যবস্থা তাঁরা করতে চান, তাতে শুধু সামাজিক অরাজকতার সৃষ্টি করা হবে। সমাজের সুনির্দ্দিষ্ট গণ্ডিগুলি তুলে দিলে সমাজ-তরী কোণাকুণি চলে তীরে আটকে যাবে, এবং সমাজের ঘোড়া আড়াই-পা'র পরিবর্ত্তে চার পা তুলে ছুটবে। এ অবশ্য মহা বিপদের কথা। সুতরাং

ভারতবর্ষের অতীতে এই ঐক্যের ideal-এর ভিত্তি আছে কিনা, সেটা খুঁজে দেখা দরকার। এই কারণেই সম্ভবতঃ রাধাকুমুদবাবু দুহাজার বৎসরের ইতিহাস খুঁড়ে সেই ভিত বার করবার চেষ্টা করেছেন, যার উপরে সেই কাম্যবস্তুকে সুপ্রতিষ্ঠিত করা যেতে পারে। এ যে অতি সাধু উদ্দেশ্য সে বিষয়ে বোধ হয় দ্বিমত নেই।

(২)

রাধাকুমুদবাবু জাতীয় জীবনের ঐক্যের মূল যে প্রাচীন যুগের সামাজিক জীবনে আবিষ্কার করতে চেষ্টা করেছেন, তার জন্য তিনি আমার নিকট বিশেষ ধন্যবাদার্হ। অনেকে, দেখতে পাই, এই ঐক্যের সন্ধান, ঐতিহাসিক সত্যে নয়, দার্শনিক তথ্যে লাভ করেন। এ শ্রেণীর লোকের মতে সমগ্র ভারতবর্ষ এক ব্রহ্মসূত্রে গ্রথিত; কেননা অদ্বৈতবাদে সকল অনৈক্য তিরস্কৃত হয়। কিন্তু যে সমস্যা নিয়ে আমরা নিজেদের বিব্রত করে তুলেছি, তার মীমাংসা বেদান্তদর্শনে করা হয়নি; বরং ঐ দর্শন থেকেই অনুমান করা অসঙ্গত হবে না যে, প্রাচীন যুগে জাতীয় জীবনে কোনও ঐক্য ছিল না। মানব-জীবনের সঙ্গে মানব-মনের যোগ অতি ঘনিষ্ঠ। কাব্যের মত দর্শনও 'জীবন-বৃক্ষের ফুল; তবে এ ফুল এত সূক্ষ্ম বৃন্তে ভর করে' এত উচ্চে ফুটে ওঠে যে, হঠাৎ দেখতে তা আকাশ-কুসুম বলে ভ্রম হয়। আমার বিশ্বাস একটি ক্ষুদ্র দেশের এক রাজার শাসনাধীন জাতির মন একেশ্বর-বাদের অনুকূল। ঐরূপ জাতির পক্ষে, বিশ্বকে একটি দেশ হিসেবে, এবং ভগবানকে তার অদ্বিতীয় শাসন ও পালনকর্তা হিসেবে দেখা স্বাভাবিক এবং সহজ।

অপর পক্ষে যে মহাদেশ নানারাজ্যে বিভক্ত, এবং বহু রাজা উপ-রাজার শাসনাধীন, সে' দেশের লোকের পক্ষে আকাশ-দেশে বহু দেবতা এবং উপ-দেবতার অস্তিত্ব কল্পনা করাও তেমনি স্বাভাবিক। সাধারণতঃ মানুষে, মর্ত্যের ভিত্তির উপরেই স্বর্গের প্রতিষ্ঠা করে। যে দেশের পূর্ব্বপক্ষ একেশ্বরবাদী, সে দেশের উত্তরপক্ষ নাস্তিক,—এবং যে দেশের পূর্ব্ব-পক্ষ বহু-দেবতাবাদী, সে দেশের উত্তর পক্ষ অদ্বৈতবাদী। অদ্বৈতবাদী বহুর ভিতর এক দেখেন না; কিন্তু বহুকে মায়া বলে' তার অস্তিত্ব অস্বীকার করেন। সুতরাং উত্তর-মীমাংসার সার-কথা "ব্রহ্ম সত্য, জগৎ মিথ্যা"—এই অর্দ্ধ শ্লোকে যে বলা হয়েছে, তার আর সন্দেহ নেই। এই কারণেই বেদান্তদর্শন সাংখ্যদর্শনের প্রধান বিরোধী। অথচ এ কথা অস্বীকার করবার যো নেই যে, সংখ্যা বাদ দিলে অবশিষ্ট থাকে শুধু শূন্য। সুতরাং মায়াবাদ যে ভাষান্তরে শূন্যবাদ, এবং শঙ্কর যে প্রচ্ছন্নবৌদ্ধ —এই প্রাচীন অভিযোগের মূলে কতকটা সত্য আছে। যে একাত্ম-জ্ঞান কর্ম্মশূন্যতার উপর প্রতিষ্ঠিত, সে জ্ঞানের চর্চ্চায় আত্মার যতটা চর্চ্চা করা হয়, বিশ্ব-মানবের সঙ্গে আত্মীয়তার চর্চ্চা ততটা করা হয় না। আরণ্যক ধর্ম্ম যে সামাজিক, এ কথা শুধু ইংরাজি-শিক্ষিত নাগরিকেরাই বল্‌তে পারেন। সমাজ-ত্যাগ করাই যে সন্ন্যাসের প্রথম সাধনা, এ কথা বিস্মৃত হবার ভিতর যথেষ্ট আরাম আছে।

সোঽহং হচ্ছে Individualism-এর চরম উক্তি। সুতরাং বেদান্ত-মত আমাদের মনোজগৎকে যে পরিমাণে উদার ও মুক্ত করে দিয়েছে, আমাদের ব্যবহারিক জীবনকে সেই পরিমাণে বদ্ধ ও

সঙ্কীর্ণ করে ফেলেছে। বেদান্তের দর্পণে প্রাচীন যুগের সামাজিক মন প্রতিফলিত হয় নি,—প্রতিহত হয়েছে। বেদান্তদর্শন সামাজিক জীবনের প্রকাশ নয়,—প্রতিবাদ। অদ্বৈতবাদ হচ্ছে সঙ্কীর্ণ কর্ম্মের বিরুদ্ধে উদার মনের প্রতিবাদ, সীমার বিরুদ্ধে অসীমের প্রতিবাদ, বিষয়-জ্ঞানের বিরুদ্ধে আত্ম-জ্ঞানের প্রতিবাদ;—এক কথায় জড়ের বিরুদ্ধে আত্মার প্রতিবাদ। সমাজের দিক থেকে দেখলে, জীবের এই স্বরাট-জ্ঞান শুধু বিরাট অহঙ্কার মাত্র। সুতরাং যে সূত্রে এ কালের লোকেরা জাতিকে একতার বন্ধনে আবদ্ধ করতে চান তা ব্রহ্মসূত্র নয়, কিন্তু তার অপেক্ষা ঢের স্থূল জীবন সূত্র।

কেন যে পুরাকালে অদ্বৈতবাদীরা কৌপীন-কমণ্ডলু ধারণ করে বনে যেতেন, তার প্রকৃত মর্ম্ম উপলব্ধি না করতে পারায় এ কালের অদ্বৈতবাদীরা চোগা-চাপকান পরে আপিসে যান। উভয়ের ভিতর মিল এইটুকু যে, একজন হচ্ছেন উদাসী, আর একজন শুধু উদাসীন,—পরের সম্বন্ধে।

রাধাকুমুদবাবুর প্রবন্ধের প্রধান মর্য্যাদা এই যে, তিনি ভারতের আত্মজ্ঞানের ভিত্তি অতীতের জীবন-ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠা করতে প্রয়াসী হয়েছেন। তবে কতদূর কৃতকার্য্য হয়েছেন সেইটেই বিচার্য্য। ভবিষ্যতের শূন্যদেশে যা-খুসি-তাই স্থাপনা করবার যে স্বাধীনতা মানুষের আছে, অতীতসম্বন্ধে তা নেই। ভবিষ্যতে সবই সম্ভব হতে পারে, কিন্তু অতীতে যা হয়ে গেছে তার আর একচুলও বদল হতে পারে না। কল্পনার প্রকৃত লীলাভূমি ভূত নয়, ভবিষ্যৎ। আকাশে আশার গোলাপ ফুল অথবা নৈরাশ্যের সরষের ফুল দেখবার অধিকার আমাদের সকলেরই

আছে; কিন্তু অতীত ফুলের নয়, মূলের দেশ। যে মূল আমরা খুঁজে বার কর্‌তে চাই তা সেখানে পাই ত ভালই; না পাই ত, না পাই।

(৩)

জীবের অহং-জ্ঞান যেমন একটি দেহ আশ্রয় করে থাকে, জাতির অহং-জ্ঞানও তেমনি একটি দেশ আশ্রয় করে থাকে। মানুষের যেমন দেহাত্ম-জ্ঞান তার সকল বিশিষ্টতার মূল, জাতির পক্ষেও তেমনি দেশাত্ম-জ্ঞান তার সকল বিশিষ্টতার মূল। ভারতবাসীর মনে এই দেশাত্ম-জ্ঞান যে অতি প্রাচীনকালে জন্মলাভ করেছিল, রাধাকুমুদবাবু নানারূপ প্রমাণপ্রয়োগের বলে তাই প্রতিপন্ন করতে চেষ্টা করেছেন।

ভারতবর্ষ মহাদেশ হ'লেও যে একদেশ, এবং ভারতবাসীদের যে সেটি স্বদেশ, এ সত্যটি অন্ততঃ দু'হাজার বৎসর পূর্ব্বে আবিষ্কৃত হয়েছিল।

উত্তরে অলঙ্ঘ্য পর্ব্বতের প্রাকার, এবং পশ্চিম, দক্ষিণ ও পূর্ব্বে দুর্লঙ্ঘ্য সাগরের পরিখা যে ভারতবর্ষকে অন্যান্য সকল ভূভাগ হতে বিশেষরূপে পৃথক ও স্বতন্ত্র করে রেখেছে, এ হচ্ছে প্রত্যক্ষ সত্য। তারপর, এদেশ অসংখ্য যোজন বিস্তৃত হলেও সমতল; এত সমতল যে, সমগ্র ভারতবর্ষকে এক-ক্ষেত্র বল্লে অত্যুক্তি হয় না। বিন্ধ্যাচল সম্ভবতঃ এ মহাদেশকে দুটি চিরবিচ্ছিন্ন খণ্ডদেশে বিভক্ত করতে পারত, যদি অগস্ত্যের আদেশে সে চিরদিনের জন্য নতশির হয়ে থাকতে বাধ্য না হত। রাধাকুমুদবাবু দেখিয়েছেন

যে, এই স্বদেশ-জ্ঞান ভারতবাসীর পক্ষে কেবলমাত্র শুষ্ক জ্ঞান নয়, কিন্তু তাদের আত্যন্তিক প্রীতি ও ভক্তির সঙ্গে জড়িত। ভারতবাসীর পক্ষে ভারতবর্ষ হচ্ছে পুণ্যভূমি ;—সে দেশের প্রতি ক্ষেত্র—ধর্ম্মক্ষেত্র, প্রতি নদী—তীর্থ, প্রতি পর্ব্বত—দেবতাত্মা। কিন্তু এই ভক্তি-ভাব আর্য্য মনোভাব কি না, সে বিষয়ে সন্দেহ আছে। বেদ হতে পঞ্চ নদের আবাহনস্বরূপ একটিমাত্র শ্লোক উদ্ধৃত করে রাধাকুমুদ বাবু প্রমাণ করতে চান যে, ঋষিদের মনে এই একদেশীয়তার ভাব সর্ব্বপ্রথমে উদয় হয়েছিল। কিন্তু সেই বৈদিক মনোভাব যে ক্রমে বৃদ্ধি এবং বিস্তার লাভ করে শেষে লৌকিক মনোভাবে পরিণত হয়েছিল, তার কোন প্রমাণ নেই। আমার বিশ্বাস, বৈদিক ধর্ম্ম নয়, লৌকিক ধর্ম্মই ভারতবর্ষকে পুণ্যভূমি করে তুলেছে। ভারতবর্ষের আদিম অধিবাসীদের ধর্ম্ম হচ্ছে লৌকিক ধর্ম্ম ; বিদেশী বিজেতা আর্য্যদের ধর্ম্ম হচ্ছে বৈদিক ধর্ম্ম। ভারতবর্ষের মাটি ও ভারতবর্ষের জলই হচ্ছে লৌকিক ধর্ম্মের প্রধান উপাদান। সে ধর্ম্ম আকাশ থেকে পড়েনি, মাটি থেকে উঠেছে। ভারতবর্ষের জনগণ চিরদিন কৃষিজীবী। যে ত্রিকোণ পৃথিবী তাদের চিরদিন অন্নদান করে, সেই হচ্ছে অন্নদা, এবং যে জল তাদের শস্যক্ষেত্রে রস-সঞ্চার করে, সেই হচ্ছে প্রাণদা। তাই ভারতবর্ষের অসংখ্য লৌকিক দেবতা সেই অন্নদার বিকাশ। সীতার মত এ সকল দেবতা হলমুখে ধরণী হতে উত্থিত হয়েছে। তাই এ দেশের প্রতিমা মাটির দেহ ধারণ করে এবং জলে তার বিসর্জ্জন হয়। "তোমারি প্রতিমা গড়ি মন্দিরে. মন্দিরে" একথা মোটেই বৈদিক মনোভাবের পরিচায়ক নয়। কেননা, পঞ্চনদবাসী আর্য্যেরা মন্দিরও

গড়াতেন না, প্রতিমাও পূজা করতেন না। এই দেশভক্তি পৌরাণিক সাহিত্যে অতি পরিস্ফুট হয়ে উঠেছে। তার কারণ, বৈদিক যুগ ও পৌরাণিক যুগের মধ্যে যে বৌদ্ধযুগ ছিল, সেই যুগেই এই স্বদেশ-জ্ঞান ও স্বদেশ-প্রীতি ভারতবর্ষময় ব্যাপ্ত হয়ে পড়েছিল। বৌদ্ধধর্ম্ম অবৈদিক ধর্ম্ম, এবং সার্ব্বজনীন বলে' তা সার্ব্বভৌম ধর্ম্ম। অপর পক্ষে বৈদিক ধর্ম্ম আর্য্যদের গৃহধর্ম্ম, বড়-জোর কুলধর্ম্ম। সমগ্র দেশকে একাত্ম করবার ক্ষমতা সে ধর্ম্মের ছিল না। যেমন অসুরদের সঙ্গে যুদ্ধে সুরেরা এক ঈশানকোণ ব্যতীত আর সকল-দিকেই পরাস্ত হয়েছিলেন, তেমনি সম্ভবতঃ ইন্দ্র-চন্দ্র-বায়ু-বরুণ-প্রভৃতি সংস্কৃত দেবতারা দেশজ দেবতাদের সঙ্গে যুদ্ধে এক গৃহকোণ ব্যতীত আর সর্ব্বত্রই পরাস্ত হয়েছিলেন। অন্ততঃ আকাশের দেবতারা যে, মাটির দেবতাদের সঙ্গে সন্ধিস্থাপন করতে বাধ্য হয়েছিলেন, তার প্রমাণ পৌরাণিক হিন্দুধর্ম্ম। বৈদিক ও লৌকিক মনোভাবের মিশ্রণে এই নবধর্ম্মভাবের জন্ম। আর্য্যেরা যে কস্মিনকালেও সমগ্র ভারতবর্ষকে একদেশ বলে স্বীকার করতে চাননি, তার প্রমাণ স্মৃতিশাস্ত্রে পাওয়া যায়। বৌদ্ধধর্ম্মের অধঃপতন এবং ব্রাহ্মণ্যধর্ম্মের পুনরভ্যুদয়ের সময় মনুসংহিতা লিখিত হয়। এই সংহিতাকারের মতে ব্রহ্মাবর্ত্ত-এবং-আর্য্যাবর্ত্ত-বহির্ভূত সমগ্র ভারতবর্ষ হচ্ছে ঘৃণ্য ম্লেচ্ছদেশ। মনুর টীকাকার মেধাতিথি বলেন যে, দেশের ম্লেচ্ছত্বদোষ কিম্বা আর্য্যত্বগুণ নেই। যে দেশে বেদবিহিত ক্রিয়াকর্ম্মনিরত আর্য্যেরা বাস করেন, সেই হচ্ছে আর্য্যভূমি,—বাদবাকি সব ম্লেচ্ছদেশ। আর্য্যদের এই স্বজাতি-জ্ঞান সমগ্র ভারতবর্ষের স্বদেশ-জ্ঞানের প্রতিকূল ছিল। পঞ্চনদের

পঞ্চনদীর উল্লেখ করে তর্পণের মন্ত্র উচ্চারণপূর্ব্বক বৈদিক ঋষিরা যে গণ্ডুষ করতেন, সে কতকটা সেই ভাবে, যে ভাবে একালে বিলাতী-আর্য্যেরা মহোৎসবের ভোজনান্তে "The Land we live in"-এর নামোচ্চারণ করে সুরার আচমন করেন। প্রাচীন আর্য্যজাতির মনে দেশ-প্রীতির চাইতে আত্ম-প্রীতি ঢের বেশি প্রবল ছিল। দেশের স্বাতন্ত্র্য রক্ষা নয়, নিজেদের স্বাতন্ত্র্য রক্ষাই ছিল তাঁদের স্বধর্ম্ম। রাধাকুমুদবাবু এমন কোন বিরুদ্ধপ্রমাণ দেখাতে পারেন নি, যা'তে করে আমার এই ধারণা পরিবর্ত্তিত হতে পারে।

(৪)

ইংরাজ যে সর্ব্বপ্রথমে ভারতবর্ষের মানচিত্র লালবর্ণে চিত্রিত করেছেন তা নয়; আজ দু-হাজার বৎসরেরও পূর্ব্বে অশোকও একবার ঐ মানচিত্র গেরুয়া-রঙে রঞ্জিত করেছিলেন। একথা শিক্ষিত লোক-মাত্রেরই জানা না থাক্, শোনা আছে। যা সুপরিচিত তার আর নূতন আবিষ্কার করা চলে না, সুতরাং রাধাকুমুদবাবু প্রাচীন ভারতের এক-রাষ্ট্রীয়তার মূল বৈদিক সাহিত্যে অনুসন্ধান করেছেন,—তাঁর পুস্তিকার মৌলিকতা এইখানেই। সুতরাং তিনি অনুসন্ধানের ফলে যে নূতন সত্য আবিষ্কার করেছেন, তা বিনা পরীক্ষায় গ্রাহ্য করা যায় না।

শাস্ত্রকারেরা বেদকে স্মৃতির মূল বলে' উল্লেখ করেছেন,—কিন্তু বেদ যে শূদ্ররীতি কিম্বা বৌদ্ধনীতির মূল, এ কথা তাঁরা কখন মুখে আনেননি; বরং বৌদ্ধাচার্য্যেরা যখন বেদের কোন উৎসন্ন শাখা থেকে বৌদ্ধধর্ম্ম উদ্ভূত হয়েছে এই দাবী করতেন, তখন বৈদিক ব্রাহ্মণেরা

কানে হাত দিতেন। অথচ এ কথা অস্বীকার কর্‌বার যো নেই যে, ইতিহাস যে প্রাচীন সাম্রাজ্যের পরিচয় দেয়, তা বৌদ্ধযুগে ব্রাত্যদেশে শূদ্র-ভূপতিকর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। মগধের নন্দবংশও শূদ্রবংশ, মৌর্য্যবংশও শূদ্রবংশ ছিল। এবং অশোক, সমগ্র ভারতবর্ষে শুধু রাজচক্র নয়, ধর্ম্মচক্রেরও স্থাপনা করে, সসাগরা বসুন্ধরার সার্ব্বভৌম চক্রবর্ত্তীর পদে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিলেন। সুতরাং এক-রাষ্ট্রীয়তার মূল বৈদিক-মনে পাওয়া যাবে কি না—সে বিষয়ে স্বতঃই সন্দেহ উপস্থিত হয়।

বৌদ্ধযুগের পূর্ব্বে কোন একরাটের পরিচয় ইতিহাস দেয় না। কিন্তু ইতিহাসের পশ্চাতে কিম্বদন্তী আছে,—সেই কিম্বদন্তীর সাহায্যে, দেশের বিশেষ-কোন ঘটনা না হোক্, জাতির বিশেষ মনোভাবের পরিচয় আমরা পেতে পারি। রাধাকুমুদবাবু ব্রাহ্মণ এবং শ্রৌতসূত্র প্রভৃতি নানা বৈদিক গ্রন্থ থেকে রাজনীতিসম্বন্ধে আর্য্যজাতির মনোভাব উদ্ধার কর্‌বার চেষ্টা করেছেন।

রাধাকুমুদবাবুর দাখিলি বৈদিক-দলিলগুলির কোন তারিখ নেই—সুতরাং তার সবগুলি যে মাগধ-সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠার পূর্ব্বে লিখিত হয়েছিল, তা বলা যায় না; অতএব কোন বিশেষ ব্রাহ্মণগ্রন্থ বৈদিক-সাহিত্যের অন্তর্ভূত হলেও তার প্রতি বাক্য যে বৈদিক মনোভাবের পরিচয় দেয় এ কথা নিঃসন্দেহে বলা চলে না। ওরূপ দলিলের বলে, তর্কিত বিষয়ের চূড়ান্ত নিষ্পত্তি করা অসম্ভব। বিশেষতঃ যখন তাঁর সংগৃহীত দলিল তাঁর মতের বিরুদ্ধেই সাক্ষ্য দেয়। রাধাকুমুদবাবুর প্রধান দলিল হচ্ছে ঐতরেয় ব্রাহ্মণ। ঐ গ্রন্থেই তিনি সাম্রাজ্য শব্দের সাক্ষাৎ পেয়েছেন, এবং সেই শব্দই হচ্ছে তাঁর

মতের মূলভিত্তি। উক্ত ব্রাহ্মণের একখানি বাঙ্গলা অনুবাদ আছে; তারি সাহায্যে রাধাকুমুদবাবুর মত যাচাই 'করে নেওয়া যেতে পারে। "সম্রাট" কাকে বলে' তার পরিচয় ঐ ব্রাহ্মণে এইরূপ আছে ঃ—

"পূর্ব্বদিকে প্রাচ্যগণের যে সকল রাজা আছেন, তাঁহারা দেবগণের ঐ বিধান-অনুসারে সাম্রাজ্যের জন্য অভিষিক্ত হন, অভিষেকের পর তাঁহারা "সম্রাট" নামে অভিহিত হন।"—(ঐতরেয় ব্রাহ্মণ ৩৮শ অধ্যায়।)

রাধাকুমুদবাবু বলেন যে, এস্থলে মাগধ-সাম্রাজ্যের উল্লেখ করা হয়েছে। যদি তাঁর উক্ত অনুমান গ্রাহ্য হয়, তাহলে প্রাচীন ভারত-সাম্রাজ্যের বৈদিক ভিত্তি ঐ এক কথাতেই নষ্ট হয়ে যায়।

ঐতরেয় ব্রাহ্মণে নানারূপ রাজ্যের উল্লেখ আছে, যথা—রাজ্য, সাম্রাজ্য, ভৌজ্য, স্বারাজ্য, বৈরাজ্য, পারমেষ্ঠ্য রাজ্য, মাহারাজ্য ইত্যাদি। রাধাকুমুদবাবু প্রমাণ করতে চান্ যে, ঐ সকল নাম উচ্চ-নীচ-হিসাবে একরাটের অধীন ভিন্ন ভিন্ন রাজপদ নির্দ্দেশ করে। কিন্তু ঐ ব্রাহ্মণ-গ্রন্থেই প্রমাণ আছে যে, ঐ সকল নাম হচ্ছে পৃথক পৃথক দেশের ভিন্ন ভিন্ন রাজ্যের নাম। তার সকল-দেশই পঞ্চনদের বহির্ভূত, কোন কোন দেশ ভারতবর্ষের বহির্ভূত, এবং বিশেষ করে একটি দেশ পৃথিবীর বহির্ভূত। যথা—

"পূর্ব্বদিকে প্রাচ্যগণের রাজা—সম্রাট। দক্ষিণদিকে সত্বৎগণের রাজা—ভোজী। পশ্চিমদিকে নীচ্য ও অপাচ্যদিগের রাজা স্বরাট্। উত্তরদিকে হিমবানের ওপারে যে উত্তরকুরু ও উত্তরমদ্র জনপদ আছে, তাহারা দেবগণের ঐ বিধানানুসারে বৈরাজ্যের জন্য অভিষিক্ত হয়, অভিষেকের পরে তাহারা বিরাট নামে অভিহিত হয়। মধ্যমদেশে সবশ উশীনরগণের ও কুরুপাঞ্চালগণের যে সকল রাজা আছেন তাঁহারা রাজা নামে অভিহিত হন। এবং উর্দ্ধদেশে (অন্তরীক্ষে) ইন্দ্র পারমেষ্ঠ্য লাভ করিয়াছিলেন।"

উপরোক্ত উদ্ধৃত বাক্যগুলি থেকে দেখা যায় যে, দেশ-ভেদ-অনুসারে সে যুগের রাজাদের নামভেদ হয়েছিল,—পদমর্য্যাদা-অনুসারে নয়। উক্ত ব্রাহ্মণে একরাট শব্দও ব্যবহৃত হয়েছে। কিন্তু সে একরাট, একসঙ্গে স্বরাট, বিরাট, সম্রাট, সব রাট হতে পার্‌তেন,—অর্থাৎ তিনি স্বদেশ বিদেশ এবং আকাশ-দেশের রাজা হতে পার্‌তেন। বলা বাহুল্য, এরূপ একরাটের নিকট ভারতবর্ষের একরাষ্ট্রীয়তার সন্ধান নিতে যাওয়া বৃথা।

আসল কথা এই যে, রাজনীতি অর্থে আমরা যা বুঝি ও চাণক্য যা বুঝতেন—ব্রাহ্মণ-গ্রন্থে তার নামগন্ধও নেই। রাজপেয়, রাজসূয়, অশ্বমেধ, পুনরভিষেক, ঐন্দ্র মহাভিষেক,—এসব হচ্ছে যজ্ঞ। এবং এ সকল যজ্ঞের উদ্দেশ্য রাজ্যস্থাপনা নয়, পুরোহিতকে ভূরি দান করানো এবং ঐরূপ যজ্ঞ দ্বারা যজমানের অভ্যুদয় সাধিত হতে পারে, তাই প্রমাণ করা। রাধাকুমুদবাবু তাঁর পুস্তিকাতে, পুরাকালে যাঁরা একরাট পদে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিলেন, তাঁদের নামের একটি লম্বা ফর্দ্দ ঐতরেয় ব্রাহ্মণ হতে তুলে দিয়েছেন। সম্ভবতঃ তিনি উক্ত রাজাগণের সার্ব্বভৌম সাম্রাজ্য লাভ ঐতিহাসিক ঘটনা বলে মনে করেন, কিন্তু আমরা তা পারিনে,—কারণ উক্ত ব্রাহ্মণের মতে, ঐন্দ্র মহাভিষেকের বলেই প্রাচীন রাজারা ঐ ইন্দ্র-বাঞ্ছিত পদলাভ করেছিলেন। মন্ত্রবলে এবং যজ্ঞফলে তাদৃশ বিশ্বাস না থাকার দরুণ আমরা উক্ত রাজযজমানদের ঐরূপ আত্যন্তিক অভ্যুদয়, এবং রাজপুরোহিতদের তদনুরূপ দক্ষিণালাভের ইতিহাসে যথেষ্ট আস্থা স্থাপন করতে পারিনে। রাধাকুমুদবাবু নামের ফর্দ্দের পাশাপাশি যদি দানের ফর্দ্দটি তুলে দিতেন, তাহলে পাঠকমাত্রেই ঐতরেয়

ব্রাহ্মণের কথা কতদূর প্রামাণ্য তাহা সহজেই বুঝতে পারতেন। ঐন্দ্র মহাভিষেক উপলক্ষে নিম্নলিখিতরূপ দান করা হত :—

বদ্ধ শতকোটী গাভীর মধ্যে প্রতিদিন মাধ্যন্দিন সবনে দুই দুই সহস্র। আটাশী হাজার পৃষ্ঠবাহনযোগ্য শ্বেত অশ্ব। এদেশ ওদেশ হইতে আনীত নিষ্ককণ্ঠী আঢ্য দুহিতার মধ্যে দশ সহস্র।

এরূপ দানের দাতা দুর্লভ হলেও, গ্রহীতা আরও বেশি দুর্লভ। এত গরু ঘোড়া ও বনিতা রাখি কোথায় আর খাওয়াই কি, এ প্রশ্ন বোধহয় দরিদ্র ব্রাহ্মণের মনে উদয় হত। ব্রাহ্মণগ্রন্থ এই সত্যেরই পরিচয় দেয় যে, সে যুগে এমন বহু ক্ষত্রিয় ছিলেন যাঁদের নিজেদের কোষ-বৃদ্ধি, এবং অধিকার-বৃদ্ধির প্রতি লোভ ছিল, এবং তাঁরা ব্রাহ্মণদের তন্তর-মন্তর-যাদুতে বিশ্বাস করতেন। ঐতরেয় ব্রাহ্মণে যে সাম্রাজ্যের উল্লেখ আছে তা ক্ষত্রিয়ের বাহুবল, বুদ্ধিবল ও চরিত্রবল দ্বারা নয়—ব্রাহ্মণের মন্ত্রবলের দ্বারা লাভ করবার বস্তু। কারণ শত্রু নাশের জন্য তাঁদের যুদ্ধ করা আবশ্যক হত না, ব্রহ্ম-পরিমর-কর্ম্ম প্রভৃতি অভিচারের দ্বারাই সে কামনা সিদ্ধ হত। এই অতীত সাহিত্যের ভিত্তির উপর যদি ভারতবর্ষের ভবিষ্যৎ ঐক্যের প্রতিষ্ঠা করতে হয়, তাহলে আমাদের মনোজগতের গন্ধর্ব্বপুরী চিরকাল আকাশেই ঝুলবে।

আমরা ইউরোপীয় সভ্যতার নূতন মদ নিত্যই সংস্কৃত সাহিত্যের পুরোনো বোতলে ঢালছি। আমরা Spencer-এর বিলেতি মদ শঙ্করের বোতলে ঢালি, Comte-এর ফরাসি মদ মনুর বোতলে ঢালি, এবং তাই যুগসঞ্চিত সোমরস বলে পান করে, তৃপ্তিও লাভ করি, মোহও প্রাপ্ত হই। কিন্তু এই ঢালাঢালি এবং ঢলাঢলিরও একটা সীমা আছে। Bismarck-এর জর্ম্মান মদ ব্রাহ্মণের যজ্ঞের চমসে ঢালতে

গেলে আমরা সে সীমা পেরিয়ে যাই। ও হাতায় এ জিনিষ কিছুতেই ধর্‌বে না। ইংরাজি শিক্ষার প্রসাদে আমরা ব্রাহ্মণ-সাহিত্যের আধিদৈবিক ব্যাপারসকলের আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যার চেষ্টা কর্‌তে পারি, এবং চাই কি তাতে কৃতকার্য্যও হতে পারি,—কিন্তু শুধু ইংরাজি শিক্ষা নয়, তদুপরি ইংরাজি ভাষার সাহায্যেও তার "আধিরাষ্ট্রিক" ব্যাখ্যা কর্‌তে পারিনে।

(৫)

এতদিন, প্রাচীন ভারতের নাম উল্লেখ কর্‌বামাত্রই, বর্ণাশ্রম ধর্ম্ম, ধ্যানধারণা নিদিধ্যাসন, এই সকল কথাই আমাদের স্মরণপথে উদিত হত, এবং বঙ্গসাহিত্যে তারি গুণকীর্ত্তন করে আমরা যশ ও খ্যাতি লাভ কর্‌তুম। Imperialism-নামক আহেল-বিলাতি পদার্থ পুরাকালে এদেশে ছিল, এরূপ কথা পূর্ব্বে কেউ বল্‌লে তার উপর আমরা খড়গহস্ত হয়ে উঠতুম, কেননা ওরূপ কথা আমাদের দেশ-ভক্তিতে আঘাত কর্‌ত। বৈরাগ্যের দেশ ঐহিক ঐশ্বর্য্যের স্পর্শে কলুষিত হয়ে ওঠে। কিন্তু আজ যে নব দেশভক্তি ঐ Imperial-ism-এর উপর এত ঝুঁকেছে, তার একমাত্র কারণ কৌটিল্যের অর্থ-শাস্ত্রের আবিষ্কার। উক্ত গ্রন্থ থেকেই আমরা এই জ্ঞান লাভ করেছি যে, ইউরোপীয় রাজনীতির যা শেষ কথা ভারতবর্ষের রাজনীতির তাই প্রথম কথা। এই সত্যের সাক্ষাৎকার লাভ করে আমাদের চোখ এতই ঝল্‌সে গেছে যে, আমরা সকল তন্ত্রে, সকল মন্ত্রে ঐ সাম্রাজ্যেরই প্রতিরূপ দেখছি। এরূপ হওয়া স্বাভাবিক, কিন্তু আমাদের চোখ যখন আবার প্রকৃতিস্থ হবে, তখন আমরা এই প্রাচীন

Imperialism-কেও খুঁটিয়ে দেখ্‌তে পার্‌ব, এবং কৌটিল্যকেও জেরা কর্‌তে শিখব। ইতিমধ্যে এই কথাটি আমি স্মরণ করিয়ে দিতে চাই যে, চন্দ্রগুপ্ত রাজনীতির ক্ষেত্রে যে মহাভারত রচনা করেছিলেন,—কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্র শুধু তারি ভাষ্য। যে মনোভাবের উপর সে সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল, সে মনোভাব বৈদিক নয়, সম্ভবতঃ আর্য্যও নয়। মনু প্রভৃতি ধর্ম্মশাস্ত্রের সঙ্গে তুলনা করে দেখলে দেখতে পাওয়া যায় যে, উক্ত অর্থশাস্ত্রকারের মানসিক প্রকৃতি এবং ধর্ম্মশাস্ত্র-কারদের প্রকৃতি এক নয়। সে পার্থক্য যে কোথায় ও কতখানি তা আমি একটিমাত্র উদাহরণের সাহায্যে দেখিয়ে দেব।

সংস্কৃত ভাষায় ধর্ম্ম শব্দের অর্থ Law, এবং শাস্ত্রকারদের মতে এই lawএর মূল হচ্ছে বেদ, স্মৃতি, সদাচার ও আত্মতুষ্টি। রাজশাসন অর্থাৎ legislation যে ধর্ম্মের মূল হতে পারে, এ কথা ধর্ম্মশাস্ত্রে স্বীকৃত হয় নি। রাজা ধর্ম্মের রক্ষক, স্রষ্টা নন্। অপরপক্ষে কৌটিল্যের মতে রাজশাসন সকল-ধর্ম্মের উপরে। এ কথা বৈদিক ব্রাহ্মণ কখনই মেনে নেন্ নি,—কেননা তাঁদের মতে ধর্ম্মের মূল হচ্ছে বেদ; অতএব ধর্ম্ম অপৌরুষেয়। তার পরে আসে স্মৃতি, অর্থাৎ আর্য্য ঋষিদের স্মৃতি,—তার পর সদাচার, অর্থাৎ আর্য্যদের কুলাচার,—তার পর আত্মতুষ্টি, অর্থাৎ বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণের আত্মতুষ্টি। এক কথায় ধর্ম্মশাস্ত্রের মতে—"পারম্পর্য্যক্রমাগত" আর্য্য-আচারই একমাত্র এবং সমগ্র Law। যাঁরা এরূপ মনোভাব পোষণ কর্‌তেন, তাঁরা চন্দ্রগুপ্ত কর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত এবং চাণক্যকর্ত্তৃক ব্যাখ্যাত রাজনীতি কখনই স্বচ্ছন্দ মনে গ্রাহ্য কর্‌তেন না। সম্ভবতঃ এই কারণেই, চাণক্য নিজে ব্রাহ্মণ হলেও, সংস্কৃত সাহিত্যে হিংসা প্রতিহিংসা ক্রোধ দ্বেষ ক্রূরতা ও

কুটিলতার অবতার-স্বরূপ বর্ণিত হয়েছেন, এবং একই কারণে ব্রাহ্মণ-সমাজে তাঁর অনাদৃত গ্রন্থ লুপ্ত হয়ে গিয়েছিল। বৌদ্ধধর্ম্ম এবং সেই সঙ্গে মৌর্য্য-সাম্রাজ্যের অধঃপতনের সকল কারণ আমরা অবগত নই। যখন সে ইতিহাস আবিষ্কৃত হবে, তখন সম্ভবতঃ আমরা দেখতে পাব যে, এ ধ্বংস-ব্যাপারে বৈদিক ব্রাহ্মণের যথেষ্ট হাত ছিল।

এ কথা বোধহয় নির্ভয়ে বলা যেতে পারে যে, ভারতবাসী আর্য্যদের কৃতিত্ব সাম্রাজ্য-গঠনে নয়—সমাজ-গঠনে; এবং তাঁদের শ্রেষ্ঠত্বের পরিচয় শিল্পে বাণিজ্যে নয়—চিন্তার রাজ্যে। শাস্ত্রের ভাষায় বল্‌তে হলে "পৃথিবীর সর্ব্ব-মানবকে" আর্য্য-আচার শিক্ষা দেওয়া, এবং সেই আচারের সাহায্যে সমগ্র ভারতবাসীকে এক-সমাজভুক্ত করাই ছিল তাঁদের জীবনের ব্রত। তার ফলে, হিন্দু সমাজের যা-কিছু গঠন আছে তা আর্য্যদের গুণে, এবং যা-কিছু জড়তা আছে তাও তাঁদের দোষে। এই বিরাট সমাজের ভিতর নিজেদের স্বাতন্ত্র্য ও প্রভুত্ব রক্ষা কর্‌বার জন্য তাঁরা যে দুর্গ-গঠন করেছিলেন, তাই আজ আমাদের কারাগার হয়েছে। দর্শনে, বিজ্ঞানে, কাব্যে, অলঙ্কারে, অভিধানে, ব্যাকরণে তাঁদের অপূর্ব্ব কীর্ত্তি,—যে ভাষার তুলনা জগতে নেই, সেই সংস্কৃত ভাষায় অক্ষয় হয়ে রয়েছে। এ দেশের প্রাচীন আর্য্যেরা যে, সাম্রাজ্যের চাইতে সমাজকে, এবং সমাজের চাইতেও মানুষের আত্মাকে প্রাধান্য দিয়েছিলেন, তার জন্য সমাজের লজ্জিত হবার কোনও কারণ নেই; কারণ বর্ত্তমানে ইউরোপের মনেও এ ধারণা হয়েছে যে, Political problems-এর অপেক্ষা Social problems-এর মূল্য কিছু কম নয়। এবং শাসনযন্ত্রের চাইতে মানুষের মূল্য ঢের বেশি।

শ্রীপ্রমথ চৌধুরী।

বর্ষার কথা

আমি যদি কবি হতুম, তাহলে আর যে বিষয়ই হো'ক বর্ষার সম্বন্ধে কখনো কবিতা লিখতুম না। কেন? তার কারণগুলি ক্রমান্বয়ে উল্লেখ কর্‌ছি।

প্রথমতঃ কবিতা হচ্ছে আর্ট। পাশ্চাত্য পণ্ডিতদের মতে আর্ট জিনিসটি দেশকালের বহির্ভূত। এ মতের সার্থকতা তাঁরা উদাহরণের সাহায্যে প্রমাণ কর্‌তে চান। Hamlet, তাঁদের মতে, কালেতে ক্ষয় প্রাপ্ত হবে না, এবং তার জন্মস্থানেও তাকে আবদ্ধ করে রাখবার যো নেই। কিন্তু, সঙ্গীতের উদাহরণ থেকে দেখানো যেতে পারে যে এদেশে আর্ট, কালের সম্পূর্ণ অধীন। প্রতি রাগ-রাগিণীর স্ফূর্ত্তির ঋতু, মাস, দিন, ক্ষণ নির্দ্দিষ্ট আছে। যাঁর সুরের দৌড় শুধু ঋষভ পর্য্যন্ত পৌঁছায়, তিনিও জানেন যে ভৈরবীর সময় হচ্ছে সকাল, আর পূরবীর বিকাল। যেহেতু কবিতা গান থেকেই উৎপন্ন হয়েছে—সে কারণ সাহিত্যে সময়োচিত কবিতা লেখবারও ব্যবস্থা আছে। মাসিক-পত্রে পয়লা বৈশাখে নববর্ষের কবিতা, পয়লা আষাঢ়ে বর্ষার, পয়লা আশ্বিনে পূজার, আর পয়লা ফাল্গুনে প্রেমের কবিতা বেরোনো চাইই চাই। এই কারণে আমার পক্ষে বর্ষার কবিতা লেখা অসম্ভব। যে কবিতা আষাঢ়স্য প্রথম দিবসে প্রকাশিত হবে, তা অন্ততঃ জ্যৈষ্ঠ মাসের মাঝামাঝি রচনা করতে হবে। আমার মনে কল্পনার এত বাষ্প নেই যা নিদাঘের মধ্যাহ্নকে মেঘাচ্ছন্ন করে তুল্‌তে পারে। তা ছাড়া যখন বাইরে অহরহ আগুন জ্বলছে, তখন মনে বিরহের আগুন জ্বালিয়ে

রাখ্‌তে কালিদাসের যক্ষও সক্ষম হতেন কি না, সে বিষয়ে আমার সন্দেহ আছে। আর বিরহ বাদ দিয়ে বর্ষার কাব্য লেখাও যা, হ্যামলেটকে বাদ দিয়ে হ্যামলেট নাটক লেখাও তাই।

দ্বিতীয়তঃ, বর্ষার কবিতা লিখ্‌তে আমার ভর্সা হয় না এই কারণ যে, এক ভরসা ছাড়া বরষা আর কোনও শব্দের সঙ্গে মেলে না। বাঙ্গলা কবিতায় মিল চাই, এ ধারণা আমার আজও যে আছে, এ কথা আমি অস্বীকার কর্‌তে পারিনে। যখন ভাবের সঙ্গে ভাব না মিল্‌লে কবিতা হয় না, তখন কথার সঙ্গে কথা মিল্‌লে কেন যে তা কবিতা না হয়ে পদ্য হবে, তা আমি বুঝতে পারিনে। তা ছাড়া বাস্তব জীবনে যখন আমাদের কোন কথাই মেলে না, তখন অন্ততঃ একটা জায়গা থাকা চাই যেখানে তা মিলবে, এবং সে দেশ হচ্ছে কল্পনার রাজ্য, অর্থাৎ কবিতার জন্মভূমি। আর এক কথা, অমিত্রাক্ষরের কবিতা যদি শ্রাবণের নদীর মত দুকূল ছাপিয়ে না বয়ে যায়, তাহলে তা নিতান্ত অচল হয়ে পড়ে। মিল অর্থাৎ অন্তঃ-অনুপ্রাস বাদ দিয়ে, পদ্যকে হিল্লোলে ও কল্লোলে ভরপূর করে তুল্‌তে হলে, মধ্য-অনুপ্রাসের ঘনঘটা আবশ্যক। সে কবিতার সঙ্গে সতত সঞ্চরমান নবজলধরপটলের সংযোগ করিয়ে দিতে হয়, এবং তার চলোর্ম্মির গতি যাদঃপতিরোধ ব্যতীত অন্য কোনরূপ রোধ মানে না। আমার সরস্বতী হচ্ছেন প্রাচীন সরস্বতী,—শুষ্কা না হলেও ক্ষীণা; দামোদর নন্ যে, শব্দের বন্যায় বাঙ্গলার সকল ছাঁদবাঁধ ভেঙ্গে বেরিয়ে যাবেন। অতএব মিলের অভাববশতঃই আমাকে ক্ষান্ত থাক্‌তে হচ্ছে। অবশ্য দরশ, পরশ, সরস, হরষ প্রভৃতি শব্দকে আকার দিয়ে বরষার সঙ্গে মেলান যায়। কিন্তু সে কাজ রবীন্দ্রনাথ আগেই করে বসে

আছেন। আমি যদি ঐ সকল শব্দকে সাকার করে ব্যবহার করি, তাহলে আমার চুরিবিদ্যে ঐ আকারেই ধরা পড়ে যাবে।

ঐরূপ শব্দসমূহ আত্মসাৎ করা চৌর্য্যবৃত্তি কিনা—সে বিষয়ে অবশ্য প্রচণ্ড মতভেদ আছে। নব্য কবিদের মতে, মাতৃভাষা যখন কারও পৈতৃক-সম্পত্তি নয়, তখন তা নিজের কার্য্যোপযোগী করে ব্যবহার কর্‌বার সকলেরই সমান অধিকার আছে। ঈষৎ বদল-সদল করেছেন বলে' রবীন্দ্রনাথ ও-সব কথার আর কিছু পেটেণ্ট নেন নি যে, আমরা তা ব্যবহার কর্‌লে চোর-দায়ে ধরা পড়্‌ব, বিশেষতঃ যখন তাদের কোনও বদ্‌লি পাওয়া যায় না। যে কথা একবার ছাপা হয়ে গেছে তাকে আর চাপা দিয়ে রাখ্‌বার যো নেই; সে যার-তার কবিতায় নিজেকে ব্যক্ত কর্‌বে। নব্য কবিদের আর একটি কথা বলবার আছে, যা বিশেষ প্রণিধানযোগ্য। সে হচ্ছে এই যে, রবীন্দ্রনাথ যদি অনেক কথা আগে না ব্যবহার করে ফেলতেন, তাহলে পরবর্ত্তী কবিরা তা ব্যবহার কর্‌তেন। পরে জন্মগ্রহণ করার দরুণ সে সুযোগ হারিয়েছি বলে, আমাদের যে চুপ করে থাকতে হবে, সাহিত্য-জগতের এমন কোনও নিয়ম নেই। এ মত গ্রাহ্য কর্‌লেও বর্ষার বিষয়ে কবিতা লেখার আর একটি বাধা আছে। কলম ধর্‌লেই মনে হয় মেঘের সম্বন্ধে লিখব আর কি ছাই?

বর্ষার রূপগুণ সম্বন্ধে যা কিছু বক্তব্য ছিল তা কালিদাস সবই বলে গেছেন;—বাকী যা ছিল তা রবীন্দ্রনাথ বলেছেন। এ বিষয়ে একটি নূতন উপমা কিম্বা নূতন অনুপ্রাস খুঁজে পাওয়া ভার। যদি পরিচিত সকল বসন-ভূষণ বাদ দিয়ে বর্ষার নগ্নমূর্ত্তির বর্ণনা কর্‌তে উদ্যত হই, তাহলেও বড় সুবিধে কর্‌তে পারা যায় না। কারণ, বর্ষার রূপ কালো,

রস জোলো, গন্ধ পঙ্কজের নয়—পঙ্কের, স্পর্শ ভিজে এবং শব্দ বেজায়। সুতরাং যে বর্ষা আমাদের ইন্দ্রিয়ের বিষয়ীভূত, তার যথাযথ বর্ণনাতে বস্তুতন্ত্রতা থাক্‌তে পারে, কিন্তু কবিত্ব থাক্‌বে কিনা তা বলা কঠিন।

কবিতার যা দরকার, এবং যা নিয়ে কবিতার কারবার, সেই সব আনুষঙ্গিক উপকরণও এ ঋতুতে বড়-একটা পাওয়া যায় না। এ ঋতু পাখী-ছুট। বর্ষায় কোকিল মৌন, কেননা দর্দ্দুর বক্তা,—চকোর আকাশ-দেশত্যাগী, আর চাতক ঢের হয়েছে বলে' ফটিকজল শব্দ আর মুখেও আনে না। যে সকল চরণ ও চঞ্চুসার পাখী—যথা বক, হাঁস, সারস, হাড়গিলে ইত্যাদি—এ ঋতুতে স্বেচ্ছামত জলে স্থলে ও নভোমণ্ডলে স্বচ্ছন্দে বিচরণ করে, তাদের গঠন এতই অদ্ভুত এবং তাদের প্রকৃতি এতই তামসিক যে, এরা যে বিশ্বামিত্রের সৃষ্টি সে বিষয়ে আর কোনও সন্দেহ নেই। বস্তুতন্ত্রতার খাতিরে আমরা অনেক দূর অগ্রসর হতে রাজি আছি, কিন্তু বিশ্বামিত্রের জগৎ পর্য্যন্ত নয়। তারপর কাব্যের উপযোগী ফুল, ফল, লতা, পাতা, গাছ, বর্ষায় এতই দুর্লভ যে, মহাকবি কালিদাসও ব্যাঙের ছাতার বর্ণনা কর্‌তে বাধ্য হয়েছেন। সংস্কৃত ভাষার ঐশ্বর্য্যের মধ্যে এ দৈন্য ধরা পড়ে না—তাই কালিদাসের কবিতা বেঁচে গেছে। বর্ষার দুটি নিজস্ব ফুল হচ্ছে কদম আর কেয়া। অপূর্ব্বতায় পুষ্প-জগতে এ দুটির আর তুলনা নেই। অপরাপর সকল ফুল অর্দ্ধ-বিকশিত ও অর্দ্ধ-নিমীলিত। রূপের যে অর্দ্ধ-প্রকাশ ও অর্দ্ধ-গোপনেই তার মোহিনীশক্তি নিহিত, এ সত্য, স্বর্গের অপ্সরারা জান্‌তেন। মুনি ঋষিদের তপোভঙ্গ করবার জন্য তাঁরা উক্ত উপায়ই অবলম্বন কর্‌তেন। কারণ ব্যক্ত-দ্বারা ইন্দ্রিয় এবং অব্যক্ত-দ্বারা কল্পনাকে অভিভূত না

করতে পারলে, দেহ ও মনের সমষ্টিকে সম্পূর্ণ মোহিত করা যায় না। কদম কিন্তু একেবারেই খোলা—আর কেয়া একেবারেই বোজা। একের ব্যক্তরূপ নেই—অপরের গুপ্তগন্ধ নেই; অথচ উভয়েই কণ্টকিত। এ ফুল দিয়ে কবিতা সাজানো যায় না। এ দুটি ফুল বর্ষার ভূষণ নয়,—অস্ত্র। গোলা এবং সঙ্গীনের সঙ্গে এদের সাদৃশ্য স্পষ্ট।

পূর্ব্বে যা দেখানো গেল, সে সব ত অঙ্গহীনতার পরিচয়। কিন্তু এ ঋতুর প্রধান দোষ হচ্ছে আর পাঁচটি ঋতুর সঙ্গে এর কোনও মিল নেই। আর পাঁচটি ঋতুর সঙ্গে এ ঋতু খাপ খায় না। এ ঋতু বিজাতীয় এবং বিদেশী, অতএব অস্পৃশ্য। এই প্রক্ষিপ্ত ঋতু আকাশ থেকে পড়ে;—দেশের মাটির ভিতর থেকে আবির্ভূত হয় না। বসন্তের নবীনতা, সজীবতা ও সরসতার মূল হচ্ছে ধরণী। বসন্তের ঐশ্বর্য্য হচ্ছে দেশের ফুলে, দেশের কিশলয়ে। বসন্তের দক্ষিণ-পবনের জন্মস্থান যে ভারতবর্ষের মলয়-পর্ব্বত তার পরিচয় তার স্পর্শেই পাওয়া যায়;—সে পবন আমাদের দেহে চন্দনের প্রলেপ দিয়ে দেয়। বসন্তের আলো,—সূর্য্য ও চন্দ্রের আলো। ও দুটি দেবতা ত সম্পূর্ণ আমাদেরই আত্মীয়; কেননা আমরা হয় সূর্য্যবংশীয়,নয় চন্দ্রবংশীয়—এবং ভবলীলা-সম্বরণ করে আমরা হয় সূর্য্যলোকে, নয় চন্দ্রলোকে ফিরে যাই। অপর পক্ষে মেঘ যে কোন্ দেশ থেকে আসে তার কোনও ঠিকানা নেই। বর্ষা যে জল বর্ষণ করে সে কালাপানির জল। বর্ষার হাওয়া এতই দুরন্ত, এতই অশিষ্ট, এতই প্রচণ্ড এবং এতই স্বাধীন যে, সে যে কোনও অসভ্য দেশ থেকে আসে, সে বিষয়ে কোনও সন্দেহ নেই। তার পর, বর্ষার নিজস্ব আলো হচ্ছে বিদ্যুৎ। বিদ্যুতের আলো এতই হাস্যোজ্জ্বল, এতই চঞ্চল, এতই বক্র এবং এতই তীক্ষ্ণ যে, এই প্রশান্ত মহাদেশের

এই প্রশান্ত মহাকাশে সে কখনই জন্মলাভ করে নি। আর এক কথা—বসন্ত হচ্ছে কলকণ্ঠ কোকিলের পঞ্চম সুরে মুখরিত। আর বর্ষার নিনাদ? তা শুনে শুধু যে কানে হাত দিতে হয় তা নয়, চোখও বুজতে হয়।

বর্ষার প্রকৃতি যে আমাদের প্রকৃতির সম্পূর্ণ বিপরীত তার বিশেষ পরিচয় পাওয়া যায় ও-ঋতুর ব্যবহারে। এ ঋতু শুধু বেখাপ্পা নয়,—অতি বেয়াড়া। বসন্ত যখন আসে, সে এত অলক্ষিতভাবে আসে যে, পঞ্জিকার সাহায্য ব্যতীত কবে মাঘের শেষ হয়, আর কবে ফাল্গুনের আরম্ভ হয় তা কেউ বল্‌তে পারেন না। বসন্ত, বঙ্কিমের রজনীর মত, ধীরে ধীরে অতি ধীরে, ফুলের ডালা হাতে করে, দেশের হৃদয়-মন্দিরে এসে প্রবেশ করে। তার চরণ-স্পর্শে ধরণীর মুখে, শব-সাধকের শবের ন্যায়, প্রথমে বর্ণ দেখা দেয়, তার পরে ভ্রূকম্পিত হয়, তার পরে চক্ষু উন্মীলিত হয়; তার পর তার নিশ্বাস পড়ে, তার পর তার সর্ব্বাঙ্গ শিহরিত হয়ে ওঠে। এ সকল জীবনের লক্ষণ শুধু পর্য্যায়ক্রমে নয়,—ধীরে ধীরে, অতি ধীরে প্রকটিত হয়। কিন্তু বর্ষা ভয়ঙ্কর মূর্ত্তি ধারণ করে একেবারে ঝাঁপিয়ে এসে পড়ে। আকাশে তার চুল ওড়ে, চোখে তার বিদ্যুৎ খেলে, মুখে তার প্রচণ্ড হুঙ্কার;—সে যেন একেবারে প্রমত্ত, উন্মত্ত। ইংরাজেরা বলেন, কে কার সঙ্গ রাখে তার থেকে তার চরিত্রের পরিচয় পাওয়া যায়। বসন্তের সখা মদন। আর বর্ষার সখা?—পবননন্দন নন, কিন্তু তাঁর বাবা! ইনি এক লম্ফে আমাদের অশোকবনে উত্তীর্ণ হয়ে ফুল ছেঁড়েন, ডাল ভাঙ্গেন, গাছ ওপ্‌ড়ান। আমাদের সোনার লঙ্কা একদিনেই লণ্ডভণ্ড করে দেন, এবং যে সূর্য্য আমাদের ঘরে বাঁধা রয়েছে তাকে বগলদাবা করেন।

আর চন্দ্রের দেহ ভয়ে সঙ্কুচিত হয়ে তার কলঙ্কের ভিতর প্রবিষ্ট হয়ে যায়। এক কথায়, বর্ষার ধর্ম্ম হচ্ছে জল-স্থল-আকাশ সব বিপর্য্যস্ত করে ফেলা। এ ঋতু কেবল পৃথিবী নয়, দিবারাত্রেরও সাজানো তাস ভেস্তে দেয়। তা ছাড়া বর্ষা কখন হাসেন, কখন কাঁদেন;—ইনি ক্ষণে রুষ্ট, ক্ষণে তুষ্ট! এমন অব্যবস্থিতচিত্ত ঋতুকে ছন্দবন্ধের ভিতর সুব্যবস্থিত করা আমার সাধ্যাতীত।

এস্থলে এই আপত্তি উঠতে পারে যে, বর্ষার চরিত্র যদি এতই উদ্ভট হয়, তাহলে কালিদাস প্রভৃতি মহাকবিরা কেন ও-ঋতুকে তাঁদের কাব্যে অতখানি স্থান দিয়েছেন? তার উত্তর হচ্ছে যে, সে কালের বর্ষা আর একালের বর্ষা এক জিনিষ নয়;—নাম ছাড়া এ উভয়ের ভিতর আর কোনও মিল নেই। মেঘদূতের মেঘ,—শান্ত দান্ত। সে বন্ধুর কথা শোনে এবং যে পথে যেতে বল সেই পথে যায়। সে যে কতদূর রসজ্ঞ তা তার উজ্জয়িনী-প্রয়াণ থেকেই জানা যায়। সে রমণীর হৃদয়জ্ঞ,—স্ত্রীজাতির নিকট কোন্ ক্ষেত্রে হুঙ্কার করতে হয় এবং কোন্ ক্ষেত্রে অল্পভাষে জল্পনা করতে হয়, তা তার বিলক্ষণ জানা আছে। সে করুণ,—সে কনকনিকষস্নিগ্ধ বিজুলির বাতি জ্বেলে সূচিভেদ্য অন্ধকারের মধ্যে অভিসারিকাদের পথ দেখায়,—কিন্তু তাদের গায়ে জলবর্ষণ করে না। সে সঙ্গীতজ্ঞ;—তার সখা অনিল যখন কীচক-রন্ধ্রে মুখ দিয়ে বংশীবাদন করেন, তখন সে মৃদঙ্গের সঙ্গত করে। এক কথায় ধীরোদাত্ত নায়কের সকল গুণই তাতে বর্ত্তমান। সে মেঘ ত মেঘ নয়,—পুষ্পকরথে আরূঢ় স্বয়ং বরুণদেব। সে রথ অলকার প্রাসাদের মত ইন্দ্রচাপে সচিত্র, ললিতবনিতাসনাথ, মুরজ-ধ্বনিতে মুখরিত। সে মেঘ কখনো শীলাবৃষ্টি করে না,—মধ্যে মধ্যে

পুষ্পবৃষ্টি করে। এহেন মেঘ যদি কবিতার বিষয় না হয়, তাহলে সে বিষয় আর কি হতে পারে ?

কিন্তু যেহেতু আমাদের পরিচিত বর্ষা নিতান্ত উদ্‌ভ্রান্ত, উচ্ছৃঙ্খল; সেই কারণেই তার বিষয় কবিত্ব করা সম্ভব হলেও অনুচিত। পৃথিবীতে মানুষের সব কাজের ভিতর একটা উদ্দেশ্য আছে। আমার বিশ্বাস, প্রকৃতির রূপ-বর্ণনার উদ্দেশ্য হচ্ছে তার সৌন্দর্য্যের সাহায্যে মানব-মনকে শিক্ষাদান করা। যদি তাই হয়, তাহলে কবিরা কি বর্ষার চরিত্রকে মানুষের মনের কাছে আদর্শস্বরূপ ধরে দিতে চান ? আমাদের মত শান্ত, সমাহিত, সুসভ্য জাতির পক্ষে বর্ষা নয়—হেমন্ত হচ্ছে আদর্শ ঋতু। এ মত আমার নয় কিন্তু শাস্ত্রের; নিম্নে উদ্ধৃত বাক্যগুলির দ্বারাই প্রমাণিত হবে ঃ—

"ঋতুগণের মধ্যে হেমন্তই স্বাহাকার, কেননা হেমন্ত এই প্রজাসমূহকে নিজেব বশীভূত করিয়া রাখে, এবং সেইজন্য হেমন্তে ওষধিসমূহ ম্লান হয়, বনস্পতিসমূহের পত্রনিচয় নিপতিত হয়, পক্ষিসমূহ যেন অধিকতরভাবে স্থির হইয়া থাকে ও অধিকতর নীচে উড়িয়া বেড়ায়, এবং নিকৃষ্টব্যক্তিদের লোমসমূহ যেন (শীতপ্রভাবে) নিপতিত হইয়া যায়, কেননা, হেমন্ত এই সমস্ত প্রজাকে নিজের বশীভূত করিয়া থাকে। যে ব্যক্তি ইহা এইরূপ জানেন, তিনি যে (ভূমি) ভাগে থাকেন তাহাকেই শ্রী ও শ্রেষ্ঠ অন্নের জন্য নিজের করিয়া তোলেন।" (শতপথ ব্রাহ্মণ।)

আমরা যে শ্রীভ্রষ্ট এবং শ্রেষ্ঠ-অন্নহীন, তার কারণ আমরা হেমন্তকে এইরূপে জানিনে; এবং জানিনে যে তার কারণ, কবিরা হেমন্তের স্বরূপের বর্ণনা করেন না, বর্ণনা করেন শুধু বর্ষার—যে বর্ষা ওষধিসমূহকে ম্লান না করে, সবুজ করে তোলে।

বীরবল।

আষাঢ়ের গান

কোথাকার ঘোর লেগেছে
আজি ঐ গগন পরে,
ধোঁয়া-ধার ঢেউ ভেঙেছে
মেঘের থরে।
গেছে চোখ জুড়িয়ে গেছে,
দিনে আজ রাত নেমেছে,
সাগরের নীল এনেছে
কাজল করে।

ঝড়ে আজ ঝুল্‌নো ঝুলে
তমাল তালে পাতায় শাখায়,
বিজুলী ঘোমটা তুলে
দিনের আলোয় চমকে তাকায়।
বেজেছে তাল মাদলে
নটেশের নূতন দলে ;
আষাঢ়ের মীড় বাদলে
লীলায় সরে।

ঘরে আজ নয় রে থাকা,
নয় রে থাকা, নয় রে কভু ;
পোড়ে তো পুড়বে পাখা,
উড়বে চাতক, উড়বে তবু।
বাহিরে কদম ফুটে
নূতনের পরশ লুটে
হরষের তুফান উঠে
প্রাণ সায়রে।

শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ দত্ত।

চতুর্থ সংখ্যা] শ্রাবণ ১৩২১ [প্রথম বর্ষ

সবুজ পত্র

সম্পাদক—শ্রীপ্রমথ চৌধুরী

সবুজ পত্র

সর্ব্বনেশে

এবার যে ঐ এল সর্ব্বনেশে গো !
বেদনায় যে বান ডেকেছে
রোদনে যায় ভেসে গো !
রক্ত-মেঘে ঝিলিক মারে,
বজ্র বাজে গহন-পারে,
কোন্ পাগল ঐ বারে বারে
উঠ্‌চে অট্ট হেসে গো !
এবার যে ঐ এল সর্ব্বনেশে গো !

জীবন এবার মাতল মরণ-বিহারে !
এই বেলা নে বরণ করে
সব দিয়ে তোর ইহারে !
চাহিস্‌নে আর আগু-পিছু,
রাখিস্‌নে তুই লুকিয়ে কিছু,
চরণে কর্ মাথা নীচু
সিক্ত আকুল কেশে গো !
এবার যে.ঐ এল সর্ব্বনেশে গো !

পথটাকে আজ আপন করে নিয়ো রে !
গৃহ আঁধার হল, প্রদীপ
নিবল শয়ন-শিয়রে।
ঝড় এসে তোর ঘর ভরেছে,
এবার যে তোর ভিত নড়েছে,
শুনিস্ নি কি ডাক পড়েছে
নিরুদ্দেশের দেশে গো !
এবার যে ঐ এল সর্ব্বনেশে গো !

ছি ছি রে ঐ চোখের জল আর ফেলিস্‌নে !
ঢাকিস্ নে মুখ ভয়ে ভয়ে
কোণে আঁচল মেলিস্ নে !

কিসের তরে চিত্ত বিকল,
ভাঙুক না তোর দ্বারের শিকল,
বাহির পানে ছোট্‌ না, সকল
দুঃখ সুখের শেষে গো!
এবার যে ঐ এল সর্ব্বনেশে গো!

কণ্ঠে কি তোর জয়ধ্বনি ফুট্‌বে না?
চরণে তোর রুদ্র তালে
নূপুর বেজে উঠ্‌বে না?
এই লীলা তোর কপালে যে
লেখা ছিল,—সকল ত্যেজে
রক্তবাসে আয়রে সেজে
আয় না বধূর বেশে গো!
ঐ বুঝি তোর এল সর্ব্বনেশে গো!

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

বাস্তব

লোকেরা কিছুই ঠিক-মত করিতেছে না, সংসারে যেমন হওয়া উচিত ছিল তেমন হইতেছে না, সময় খারাপ পড়িয়াছে, এই সমস্ত দুশ্চিন্তা প্রকাশ করিয়া মানুষ দিব্য আরামে থাকে, তাহার আহার-নিদ্রার কিছুমাত্র ব্যাঘাত হয় না, এটা প্রায়ই দেখিতে পাওয়া যায়। দুশ্চিন্তা-আগুনটা শীতের আগুনের মত উপাদেয়, যদি সেটা পাশে থাকে কিন্তু নিজের গায়ে না লাগে।

অতএব যদি এমন কথা কেহ বলিত যে আজকাল বাংলা দেশে কবিরা যে সাহিত্যের সৃষ্টি করিতেছে তাহাতে বাস্তবতা নাই, তাহা জনসাধারণের উপযোগী নহে, তাহাতে লোক-শিক্ষার কাজ চলিবে না, তবে খুব সম্ভব আমিও দেশের অবস্থাসম্বন্ধে উদ্বেগ প্রকাশ করিয়া বলিতাম, কথাটা ঠিক বটে; এবং নিজেকে এই দলের বাহিরে ফেলিতাম।

কিন্তু একেবারে আমারি নাম ধরিয়া এই কথাগুলি প্রয়োগ করিলে অন্যের তাহাতে যতই আমোদ হোক আমি সে আমোদে খোলা মনে যোগ দিতে পারি না।

তবে কিনা, বাসর-ঘরে বর এবং পাঠক-সভায় লেখকের প্রায় একই দশা। কর্ণমূলে অনেক কঠিন কৌতুক উভয়কে নিঃশব্দে সহ্য করিতে হয়। সহ্য যে করে তাহার কারণ এই, একটা জায়গায় তাহাদের জিত আছে। যে যতই উৎপীড়ন করুক, যে বর, তাহার কনেটিকে কেহ হরণ করিবে না; এবং যে লেখক, তাহার লেখাটা ত রইলই।

অতএব নিজের সম্বন্ধে কিছু বলিব না। কিন্তু এই অবকাশে সাধারণভাবে সাহিত্যসম্বন্ধে কিছু বলা যাইতে পারে। তাহা নিতান্ত অপ্রাসঙ্গিক হইবে না। কেননা যদিচ প্রথম নম্বরেই আমার লেখাটাকেই সেসনে সোপরদ্দ করা হইয়াছে তবু এ খবরটারও আভাস আছে যে আজকালকার প্রায় সকল লেখকেরই এই একই অপরাধ।

বাস্তবতা না থাকা নিশ্চয়ই একটা মস্ত ফাঁকি। বস্তু কিছুই পাইল না অথচ দাম দিল এবং খুসি হইয়া হাসিতে হাসিতে গেল এমন সব হতবুদ্ধি লোকের জন্য পাকা অভিভাবক নিযুক্ত হওয়া উচিত। সেই লোকেই অভিভাবকের উপযুক্ত, কবিরা ফস্ করিয়া যাহাদিগকে কলাকৌশলে ঠকাইতে না পারে,—কটাক্ষে যাহারা বুঝিতে পারে বস্তু কোথায় আছে এবং কোথায় নাই। অতএব যাঁহারা অবাস্তব-সাহিত্যসম্বন্ধে দেশকে সতর্ক করিয়া দিতেছেন, তাঁহারা নাবালক ও নালায়েক পাঠকদের জন্য কোর্ট্ অফ্ ওয়ার্ডস্ খুলিবার কাজ করিতেছেন।

কিন্তু সমালোচক যত বড় বিচক্ষণ হোন না কেন চিরকালই তাঁহারা পাঠকদের কোলে তুলিয়া সাম্লাইবেন সেটা ত ধাত্রী এবং ধৃত কাহারো পক্ষে ভালো নয়। পাঠকদিগকে স্পষ্ট করিয়া সমজাইয়া দেওয়া উচিত কোন্‌টা বস্তু এবং কোন্‌টা বস্তু নয়।

মুস্কিল এই যে, বস্তু একটা নহে এবং সব জায়গায় আমরা একই বস্তুর তত্ত্ব করি না। মানুষের বহুধা প্রকৃতি, তাহার প্রয়োজন নানা, এবং বিচিত্র বস্তুর সন্ধানে তাহাকে ফিরিতে হয়।

এখন কথা এই, সাহিত্যের মধ্যে কোন্ বস্তুকে আমরা খুঁজি। ওস্তাদেরা বলিয়া থাকেন সেটা রস-বস্তু। বলা বাহুল্য এখানে রস-

সাহিত্যের কথাই হইতেছে। এই রসটা এমন জিনিষ, যাহার বাস্তবতা সম্বন্ধে তর্ক উঠিলে হাতাহাতি পর্য্যন্ত গড়ায় এবং একপক্ষ অথবা উভয়পক্ষ ভূমিসাৎ হইলেও কোনো মীমাংসা হয় না।

রস জিনিষটা রসিকের অপেক্ষা রাখে, কেবলমাত্র নিজের জোরে নিজেকে সে সপ্রমাণ করিতে পারে না। সংসারে বিদ্বান, বুদ্ধিমান, দেশহিতৈষী, লোকহিতৈষী প্রভৃতি নানা প্রকারের ভালো ভালো লোক আছেন কিন্তু দময়ন্তী যেমন সকল দেবতাকে ছাড়িয়া নলের গলায় মালা দিয়াছিলেন তেমনি রস-ভারতী স্বয়ম্বর-সভায় আর সকলকেই বাদ দিয়া কেবল রসিকের সন্ধান করিয়া থাকেন।

সমালোচক বুক ফুলাইয়া তাল ঠুকিয়া বলেন, আমিই সেই রসিক। প্রতিবাদ করিতে সাহস হয় না কিন্তু অরসিক আপনাকে অরসিক বলিয়া জানিয়াছে সংসারে এই অভিজ্ঞতাটা দেখা যায় না। আমার কোন্‌টা ভালো লাগিল এবং আমার কোন্‌টা ভালো লাগিল না সেইটেই যে রসপরীক্ষার চূড়ান্ত মীমাংসা, পনেরো আনা লোক সে সম্বন্ধে নিঃসংশয়। এই জন্যই সাহিত্য-সমালোচনায় বিনয় নাই। মূলধন না থাকিলেও দালালীর কাজে নামিতে কাহারো বাধে না তেমনি সাহিত্যসমালোচনায় কোনো প্রকার পুঁজির জন্য কেহ সবুর করে না। কেননা সমালোচকের পদটা সম্পূর্ণ নিরাপদ।

সাহিত্যের যাচাই-ব্যাপারটা এতই যদি অনিশ্চিত, তবে সাহিত্য যাহারা রচনা করে তাহাদের উপায় কি? আশু উপায় দেখি না। অর্থাৎ তাহারা যদি নিশ্চিত ফল জানিতে চায় তবে সেই জানিবার বরাৎ তাহাদের প্রপৌত্রের উপর দিতে হয়। নগদ-বিদায় যেটা তাহাদের ভাগ্যে জোটে সেটার উপর অত্যন্ত ভর দেওয়া চলিবে না।

রস-বিচারে ব্যক্তিগত এবং কালগত ভুল সংশোধন করিয়া লইবার জন্য বহু ব্যক্তি ও দীর্ঘ সময়ের ভিতর দিয়া বিচার্য্য পদার্থটিকে বহিয়া লইয়া গেলে তবে সন্দেহ মেটে।

কোনো কবির রচনার মধ্যে সাহিত্য-বস্তুটা আছে কি না তাহার উপযুক্ত সমজদার, কবির সমসাময়িকদের মধ্যে নিশ্চয়ই অনেক আছে কিন্তু তাহারাই উপযুক্ত কি না তাহার চূড়ান্ত নিষ্পত্তি দাবী করিলে ঠকা অসম্ভব নয়।

এমন অবস্থায় লেখকের একটা সুবিধা আছে এই যে, তাঁহার লেখা যে-লোক পছন্দ করে সেই যে সমজদার তাহা ধরিয়া লইতে বাধা নাই। অপরপক্ষকে তিনি যদি উপযুক্ত বলিয়া গণ্যই না করেন তবে এমন বিচারালয় হাতের কাছে নাই যেখানে তাহারা নালিশ রুজু করিতে পারে। অবশ্য কালের আদালতে ইহার বিচার চলিতেছে কিন্তু সেই দেওয়ানী আদালতের মত দীর্ঘসূত্রী আদালত ইংরেজের মুল্লুকেও নাই। এস্থলে কবিরই জিত রহিল, কেননা আপাতত দখল যে তাহারই। কালের পেয়াদা যেদিন তাহার খ্যাতি-সীমানার খুঁটি উপড়াইতে আসিবে সেদিন সমালোচক সেই তামাসা দেখিবার জন্য সবুর করিতে পারিবে না।

যাঁহারা আধুনিক বঙ্গসাহিত্যে বাস্তবতার তল্লাস করিয়া একেবারে হতাশ্বাস হইয়া পড়িয়াছেন তাঁহারা আমার কথার উত্তরে বলিবেন— "দাঁড়িপাল্লায় চড়াইয়া রস-জিনিষটার বস্তু-পরিমাণ করা যায় না একথা সত্য কিন্তু রস-পদার্থ কোনো একটা বস্তুকে আশ্রয় করিয়া ত প্রকাশ পায়। সেইখানেই আমরা বাস্তবতার বিচার করিবার সুযোগ পাইয়া থাকি।"

নিশ্চয়ই রসের একটা আধার আছে। সেটা মাপকাঠির আয়ত্তাধীন সন্দেহ নাই। কিন্তু সেইটেরই বস্তু-পিণ্ড ওজন করিয়া কি সাহিত্যের দর যাচাই হয়?

রসের মধ্যে একটা নিত্যতা আছে। মান্ধাতার আমলে মানুষ যে রসটি উপভোগ করিয়াছে আজও তাহা বাতিল হয় নাই। কিন্তু বস্তুর দর বাজার-অনুসারে এবেলা ওবেলা বদল হইতে থাকে।

আচ্ছা মনে করা যাক কবিতাকে বাস্তব করিবার লোভ আমি আর সামলাইতে পারিতেছি না। খুঁজিতে লাগিলাম দেশে সব চেয়ে কোন্ ব্যাপারটা বাস্তব হইয়া উঠিয়াছে। দেখিলাম ব্রাহ্মণ-সভাটা দেশের মধ্যে রেলোয়ে-সিগ্নালের স্তম্ভটার মত চক্ষু রক্তবর্ণ করিয়া আপনার একটিমাত্র পায়ে ভর দিয়া খুব উঁচু হইয়া দাঁড়াইয়াছে। কায়স্থেরা পৈতা লইবেই আর ব্রাহ্মণ-সভা তাহার পৈতা কাড়িবে এই ঘটনাটা বাংলা দেশে বিশ্ব-ব্যাপারের মধ্যে সব চেয়ে বড়। অতএব বাঙালী কবি যদি ইহাকে তাহার রচনায় আমল না দেয় তবে বুঝিতে হইবে বাস্তবতা সম্বন্ধে তাহার বোধ-শক্তি অত্যন্ত ক্ষীণ। এই বুঝিয়া লিখিলাম পৈতা-সংহার-কাব্য। তাহার বস্তু-পিণ্ডটা ওজনে কম হইল না কিন্তু হায়রে, সরস্বতী কি বস্তু-পিণ্ডের উপরে তাঁহার আসন রাখিয়াছেন, না পদ্মের উপরে?

এই দৃষ্টান্তটি দিবার একটু হেতু আছে। বিচারকদের মতে বাস্তবতা জিনিষটা কি, তাহার একটা সূত্র ধরিতে পারিয়াছি। আমার বিরুদ্ধে একজন ফরিয়াদী বলিয়াছেন, আমার সমস্ত রচনার মধ্যে বাস্তবতার উপকরণ একটু যেখানে জমা হইয়াছে সে কেবল "গোরা" উপন্যাসে।

গোরা উপন্যাসে কি বস্তু আছে না আছে উক্ত উপন্যাসের লেখক

তাহা সব চেয়ে কম বোঝে। লোকমুখে শুনিয়াছি প্রচলিত হিঁদুয়ানির ভালো ব্যাখ্যা তাহার মধ্যে পাওয়া যায়। ইহা হইতে আন্দাজ করিতেছি ওটাই একটা বাস্তবতার লক্ষণ।

বর্ত্তমান সময়ে কতকগুলি বিশেষ কারণে হিন্দু আপনার হিন্দুত্ব লইয়া ভয়ঙ্কর রুখিয়া উঠিয়াছে। সেটা সম্বন্ধে তাহার মনের ভাব বেশ সহজ অবস্থায় নাই। বিশ্ব-রচনায় এই হিন্দুত্বই বিধাতার চরম কীর্ত্তি এবং এই সৃষ্টিতেই তিনি তাঁহার সমস্ত শক্তি নিঃশেষ করিয়া আর কিছুতেই অগ্রসর হইতে পারিতেছেন না এইটে আমাদের বুলি। সাহিত্যের বাস্তবতা ওজনের সময়ে এই বুলিটা হয় বাটখারা। কালিদাসকে আমরা ভালো বলি, কেননা, তাঁহার কাব্যে হিন্দুত্ব আছে। বঙ্কিমকে আমরা ভালো বলি, কেননা, স্বামীর প্রতি হিন্দু রমণীর যেরূপ মনোভাব হিন্দুশাস্ত্রসম্মত তাহা তাঁহার নায়িকাদের মধ্যে দেখা যায়, অথবা নিন্দা করি সেটা যথেষ্ট পরিমাণে নাই বলিয়া।

অন্য দেশেও এমন ঘটে। ইংলণ্ডে ইম্পীরিয়ালিজমের জ্বরোত্তাপ যখন ঘণ্টায় ঘণ্টায় চড়িয়া উঠিতেছিল তখন একদল ইংরেজ কবির কাব্যে তাহারই রক্তবর্ণ বাস্তবতা প্রলাপ বকিতেছিল।

তাহার সঙ্গে যদি তুলনা করা যায় তবে ওয়ার্ডস্বার্থের কবিতায় বাস্তবতা কোথায়? তিনি বিশ্ব-প্রকৃতির মধ্যে যে একটি আনন্দময় আবির্ভাব দেখিতে পাইয়াছিলেন তাহার সঙ্গে ব্রিটিশ জনসাধারণের শিক্ষা-দীক্ষা-অভ্যাস-আচার-বিচারের যোগ ছিল কোথায়? তাঁহার ভাবের রাগিণীটি নির্জ্জনবাসী একলা-কবির চিত্ত-বাঁশীতে বাজিয়াছিল—ইংরেজের স্বদেশী হাটে ওজন-দরে যাহা বিক্রি হয় এমনতর বস্তু-পিণ্ড তাহার মধ্যে কি আছে জানিতে চাই।

আর কীট্‌স্‌, শেলি,—ইঁহাদের কাব্যের বাস্তবতা কি দিয়া নির্দ্ধারণ করিব? ইংরেজের জাতীয় চিত্তের সুরের সঙ্গে সুর মিলাইয়া কি ইঁহারা বক্‌শিষ ও বাহবা পাইয়াছিলেন? যে সমস্ত সমালোচক সাহিত্যের হাটে বাস্তবতার দালালী করিয়া থাকেন তাঁহারা ওয়ার্ডস্বার্থের কবিতার কিরূপ সমাদর করিয়াছিলেন তাহা ইতিহাসে আছে। শেলিকে অস্পৃশ্য অন্ত্যজের মত তাঁহার দেশ সেদিন ঘরে ঢুকিতে দেয় নাই এবং কীট্‌স্‌কে মৃত্যুবাণ মারিয়াছিল।

আরো আধুনিক দৃষ্টান্ত টেনিসন্‌। তিনি ভিক্টোরীয় যুগের প্রচলিত লোকধর্ম্মের কবি। তাই তাঁহার প্রভাব দেশের মধ্যে সর্ব্বব্যাপী ছিল। কিন্তু ভিক্টোরীয় যুগের বাস্তবতা যত ক্ষীণ হইতেছে টেনিসনের আসনও তত সঙ্কীর্ণ হইয়া আসিতেছে। তাঁহার কাব্য যে গুণে টিঁকিবে তাহা নিত্য-রসের গুণে, তাহাতে ভিক্টোরীয় ব্রিটিশ-বস্তু বহুল পরিমাণে আছে বলিয়া নহে;—সেই স্থূল বস্তুটাই প্রতিদিন ধসিয়া পড়িতেছে।

আমাদের কালের লেখকদের মোটা অপরাধটা এই যে, আমরা ইংরেজি পড়িয়াছি। ইংরেজি শিক্ষা বাঙালীর পক্ষে বাস্তব নহে অতএব তাহা বাস্তবতার কারণও নহে, আর সেই জন্যই এখনকার সাহিত্য, দেশের লোকসাধারণকে শিক্ষা ও আনন্দ দিতে পারে না।

উত্তম কথা—কিন্তু দেশের যে-সব লোক ইংরেজি শেখে নাই তাহাদের তুলনায় আমাদের সংখ্যা ত নগণ্য। কেহ তাহাদের ত কলম কাড়িয়া লয় নাই। আমরা কেবল আমাদের অবাস্তবতার জোরে দেশের সমস্ত বাস্তবিকদের চেয়ে জিতিয়া যাইব ইহা স্বভাবের নিয়ম নহে।

হয় ত উত্তরে শুনিব আমরা হারিতেছি। ইংরেজি যাহারা শেখে নাই তাহারাই দেশের বাস্তব-সাহিত্য সৃষ্টি করিতেছে, তাহাই টিঁকিবে এবং তাহাতেই লোকশিক্ষা হইবে।

তাই যদি হয় তবে আর ভাবনা কিসের? বাস্তব-সাহিত্যের বিপুল ক্ষেত্র ও আয়োজন দেশ জুড়িয়া রহিয়াছে তাহার মধ্যে ছিটাফোঁটা অবাস্তব মুহূর্ত্তকালও টিঁকিতে পারিবে না।

কিন্তু সেই বৃহৎ বাস্তব-সাহিত্যকে চোখে দেখিলে কাজে লাগিত, একটা আদর্শ পাওয়া যাইত। যতক্ষণ তাহার পরিচয় নাই ততক্ষণ যদি গায়ের জোরে তাহাকে মানিয়া লই তবে সেটা বাস্তবিক হইবে না, কাল্পনিক হইবে।

অথচ এদিকে ইংরেজি-পোড়োরা যে সাহিত্য সৃষ্টি করিল, রাগিয়া তাহাকে গালি দিলেও সে বাড়িয়া উঠিতেছে; নিন্দা করিলেও তাহাকে অস্বীকার করিবার জো নাই। ইহাই বাস্তবের প্রকৃত লক্ষণ। এই যে কোনো কোনো মানুষ খামখা রাগিয়া ইহাকে উড়াইয়া দিবার চেষ্টা করিতেছে তাহারও কারণ, এ স্বপ্ন নয়, মায়া নয়, এ বাস্তব। দেখ নাই কি, এংলো-ইণ্ডিয়ান কাগজরা কথায় কথায় বলিয়া থাকে ভারতবর্ষের মধ্যে বাঙালী জাতটা গণ্যই নহে? তাহাদের কথার ঝাঁজ দেখিলেই বুঝা যায় তাহারা বাঙালীকেই বিশেষভাবে গণ্য করিয়াছে, কোনো মতেই ভুলিতে পারিতেছে না।

ইংরেজি শিক্ষা সোনার কাঠির মত আমাদের জীবনকে স্পর্শ করিয়াছে, সে আমাদের ভিতরকার বাস্তবকেই জাগাইল। এই বাস্তবকে যে লোক ভয় করে, যে লোক বাঁধা-নিয়মের শিকলটাকেই শ্রেয় বলিয়া জানে তাহারা, ইংরেজই হউক্ আর বাঙালীই হউক,

এই শিক্ষাকে ভ্রম এবং এই জাগরণকে অবাস্তব বলিয়া উড়াইয়া দিবার ভান করিতে থাকে। তাহাদের বাঁধা তর্ক এই যে, এক দেশের আঘাত আর-এক দেশকে সচেতন করে না। কিন্তু দূর দেশের দক্ষিণে হাওয়ায় দেশান্তরে সাহিত্যকুঞ্জে ফুলের উৎসব জাগাইয়াছে ইতিহাসে তাহার প্রমাণ আছে। যেখান হইতে যেমন করিয়াই হউক জীবনের আঘাতে জীবন জাগিয়া উঠে, মানব-চিত্ত-তত্ত্বে ইহা একটি চিরকালের বাস্তব ব্যাপার।

কিন্তু লোকশিক্ষার কি হইবে ?

সে কথার জবাবদিহি সাহিত্যের নহে।

লোক যদি সাহিত্য হইতে শিক্ষা পাইতে চেষ্টা করে তবে পাইতেও পারে কিন্তু সাহিত্য লোককে শিক্ষা দিবার জন্য কোনো চিন্তাই করে না। কোনো দেশেই সাহিত্য ইস্কুল-মাষ্টারির ভার লয় নাই। রামায়ণ মহাভারত দেশের সকল লোকে পড়ে তাহার কারণ এ নয় যে তাহা কৃষাণের ভাষায় লেখা বা তাহাতে দুঃখি-কাঙালের ঘরকর্নার কথা বর্ণিত। তাহাতে বড় বড় রাজা, বড় বড় রাক্ষস, বড় বড় বীর এবং বড় বড় বানরের বড় বড় ল্যাজের কথাই আছে। আগাগোড়া সমস্তই অসাধারণ। সাধারণ লোক আপনার গরজে এই সাহিত্যকে পড়িতে শিখিয়াছে।

সাধারণ লোক মেঘদূত, কুমারসম্ভব, শকুন্তলা পড়ে না। খুব সম্ভব দিঙ্‌নাগাচার্য্য এই ক'টা বইয়ের মধ্যে বাস্তবের অভাব দেখিয়াছিলেন। মেঘদূতের ত কথাই নাই। কালিদাস স্বয়ং এই বাস্তব-বাদীদের ভয়ে এক জায়গায় নিতান্ত অকবিজনোচিত কৈফিয়ৎ দিতে বাধ্য হইয়াছিলেন—কামার্ত্তা হি প্রকৃতিকৃপণাশ্চেতনাচেতনেষু।

আমি অকবিজনোচিত এইজন্য বলিতেছি যে, কবিমাত্রই চেতন-অচেতনের মিল ঘটাইয়া থাকেন, কেননা তাঁহারা বিশ্বের মিত্র, তাঁহারা ন্যায়ের অধ্যাপক নহেন; শকুন্তলার চতুর্থ অঙ্ক পড়িলেই সেটা বুঝিতে বাকি থাকিবে না।

কিন্তু আমি বলিতেছি যদি কালিদাসের কাব্য ভালো হয় তবে সমস্ত মানুষের জন্যই তাহা সকল-কালের ভাণ্ডারে সঞ্চিত রহিল, —আজকের সাধারণ মানুষ যাহা বুঝিল না কালকের সাধারণ মানুষ হয় ত তাহা বুঝিবে, অন্তত সেইরূপ আশা করি। কিন্তু কালিদাস যদি কবি না হইয়া লোক-হিতৈষী হইতেন তবে সেই পঞ্চম শতাব্দীর উজ্জয়িনীর কৃষাণদের জন্য হয় ত প্রাথমিক শিক্ষার উপযোগী কয়েকখানা বই লিখিতেন,—তাহা হইলে তারপর হইতে এতগুলা শতাব্দীর কি দশা হইত?

তুমি কি মনে কর লোক-হিতৈষী তখন কেহ ছিল না? লোক-সাধারণের নৈতিক ও জাঠরিক উন্নতি কি করিয়া হইতে পারে সে কথা ভাবিয়া কেহ কি তখন কোনো বই লেখে নাই? কিন্তু সে কি সাহিত্য? ক্লাসের পড়া শেষ হইলেই বৎসর-অন্তর ইস্কুলের বইয়ের যে দশা হয় তাহাদেরও সেই দশা হইয়াছে, অর্থাৎ স্বেদ-কম্প-রোমাঞ্চর ভিতর দিয়া একেবারেই দশম দশা।

যাহা ভালো তাহাকে পাইবার জন্য সাধনা করিতেই হইবে—রাজার ছেলেকেও করিতে হইবে, কৃষাণের ছেলেকেও। রাজার ছেলের সুবিধা এই যে তাহার সাধনা করিবার সময় আছে কৃষাণের ছেলের নাই। কিন্তু সেটা সামাজিক ব্যবস্থার তর্ক,—যদি প্রতিকার

করিতে পার, করিয়া দাও কাহারো আপত্তি হইবে না। তানসেন তাই বলিয়া মেঠো-সুর তৈরি করিতে বসিবেন না। তাঁহার সৃষ্টি আনন্দের সৃষ্টি, সে যাহা তাহাই; আর-কোনো মৎলবে সে আর-কিছু হইতে পারেই না। যাহারা রসপিপাসু তাহারা যত্ন করিয়া শিক্ষা করিয়া সেই ধ্রুপদগুলির নিগূঢ় মধুকোষের মধ্যে প্রবেশ করিবে। অবশ্য লোক-সাধারণ যতক্ষণ সেই মধুকোষের পথ না জানিবে ততক্ষণ তানসেনের গান তাহাদের কাছে সম্পূর্ণ অবাস্তব একথা মানিতেই হইবে। তাই বলিতেছিলাম কোথায় কোন্ বস্তুর খোঁজ করিতে হইবে, কেমন করিয়া খোঁজ করিতে হইবে, কে তাহার খোঁজ পাইবার অধিকারী, সেটা ত নিজের খেয়াল-মত এককথায় প্রমাণ বা অপ্রমাণ করা যায় না।

তবে কবিদের অবলম্বনটা কি? একটা-কিছুর পরে জোর করিয়া তাঁহারা ত ভর দিয়াছেন। নিশ্চয়ই দিয়াছেন। সেটা অন্তরের অনুভূতি এবং আত্মপ্রসাদ। কবি যদি একটি বেদনাময় চৈতন্য লইয়া জন্মিয়া থাকেন, যদি তিনি নিজের প্রকৃতি দিয়াই বিশ্ব-প্রকৃতি ও মানব-প্রকৃতির সহিত আত্মীয়তা করিয়া থাকেন, যদি শিক্ষা, অভ্যাস, প্রথা, শাস্ত্র প্রভৃতি জড় আবরণের ভিতর দিয়া কেবলমাত্র দশের নিয়মে তিনি বিশ্বের সঙ্গে ব্যবহার না করেন তবে তিনি নিখিলের সংস্রবে যাহা অনুভব করিবেন তাহার একান্ত বাস্তবতাসম্বন্ধে তাঁহার মনে কোনো সন্দেহ থাকিবে না। বিশ্ব-বস্তু ও বিশ্ব-রসকে একেবারে অব্যবহিত ভাবে তিনি নিজের জীবনে উপলব্ধি করিয়াছেন, এইখানেই তাঁহার জোর। পূর্ব্বেই বলিয়াছি বাহিরের হাটে বস্তুর দর কেবলই উঠা-নামা করিতেছে—সেখানে

নানা মুনির নানা মত, নানা লোকের নানা ফরমাস, নানা কালের নানা ফেশান্। বাস্তবের সেই হট্টগোলের মধ্যে পড়িলে কবির কাব্য হাটের কাব্য হইবে। তাঁহার অন্তরের মধ্যে যে ধ্রুব আদর্শ আছে তাহারই পরে নির্ভর করা ছাড়া অন্য উপায় নাই। সে আদর্শ হিন্দুর আদর্শ বা ইংরেজের আদর্শ নয়, তাহা লোকহিতের এবং ইস্কুল-মাষ্টারীর আদর্শ নহে। তাহা আনন্দময় সুতরাং অনির্ব্বচনীয়। কবি জানেন যেটা তাঁহার কাছে এতই সত্য সেটা কাহারো কাছে মিথ্যা নহে। যদি কাহারো কাছে তাহা মিথ্যা হয় তবে সেই মিথ্যাটাই মিথ্যা ;—যে লোক চোখ বুজিয়া আছে তাহার কাছে আলোক যেমন মিথ্যা, এও তেমনি মিথ্যা। কাব্যের বাস্তবতা সম্বন্ধে কবির নিজের মধ্যে যে প্রমাণ, তিনি জানেন বিশ্বের মধ্যেই সেই প্রমাণ আছে। সেই প্রমাণের অনুভূতি সকলের নাই— সুতরাং বিচারকের আসনে যে-খুসি বসিয়া যেমন-খুসি রায় দিতে পারেন কিন্তু ডিক্রিজারির বেলায় যে তাহা খাটিবেই এমন কোনো কথা নাই।

কবির আত্মানুভূতির যে উপাদানটার কথা বলিলাম এটা সকল কবির সকল সময়েই যে বিশুদ্ধ থাকে তাহা নহে। তাহা নানা কারণে কখনো আবৃত হয়, কখনো বিকৃত হয়, নগদ মূল্যের প্রলোভনে কখনো তাহার উপর বাজারে-চলিত-আদর্শের নকলে কৃত্রিম নক্সা কাটা হয়—এই জন্য তাহার সকল অংশ নিত্য নহে এবং সকল অংশের সমান আদর হইতেই পারে না। অতএব কবি রাগই করুন আর খুসিই হউন তাঁহার কাব্যের একটা বিচার করিতেই হইবে —এবং যে-কেহ তাঁহার কাব্য পড়িবে সকলেই তাঁহার বিচার

করিবে—সে বিচারে সকলে একমত হইবে না। মোটের উপরে যদি নিজের মনে তিনি যথার্থ আত্মপ্রসাদ পাইয়া থাকেন তবে তাঁহার প্রাপ্যটি হাতে হাতে চুকাইয়া লইয়াছেন। অবশ্য পাওনার চেয়ে উপরি-পাওনায় মানুষের লোভ বেশি। সেইজন্যই বাহিরে আশে-পাশে আড়ালে-আবডালে এত করিয়া হাত পাতিতে হয়। ঐখানেই বিপদ। কেননা লোভে পাপ, পাপে মৃত্যু।

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

বাংলা ছন্দ*

শান্তিনিকেতন
বোলপুর

প্রিয়বরেষু

এতদিন গ্রীষ্মের ছুটি ছিল; এখন আবার কাজে লাগিয়াছি। বাংলা ছন্দসম্বন্ধে আপনাকে আরো কিছু লিখিব আশা দিয়াছিলাম। কিন্তু যাহারা খাঁটি কুঁড়ে মানুষ, ফুরসৎ পাইলেই তাহারা কোনো কাজ করিতে পারে না। সেই জন্য এতদিন ছুটির ভিড়ে আপনাকে লিখিতে পারি নাই। যখন নিয়মিত কাজের তাড়া পড়ে তখন কুঁড়ে মানুষরা একটা অনিয়মিত কাজ পাইলে বাঁচিয়া যায়—তাই আমার ইস্কুল পালাইয়া আপনাকে বাংলা ছন্দসম্বন্ধে চিঠি লিখিতে বসিয়া গেলাম।

"সম্মুখ সমরে পড়ি বীরচূড়ামণি
বীরবাহু,—"

এই বাক্যটি আবৃত্তি করিবার সময়ে আমরা "সম্মুখ" শব্দটার উপরে ঝোঁক দিয়া সেই এক-ঝোঁকে একেবারে "বীরবাহু" পর্য্যন্ত গড়গড় করিয়া চলিয়া যাইতে পারি। আমরা নিশ্বাসটার বাজে-খরচ করিতে নারাজ,—এক নিশ্বাসে যতগুলা শব্দ সারিয়া লইতে পারি ছাড়ি না।

আপনাদের ইংরাজি বাক্যে সেটা সম্ভব হয় না—কেননা আপনাদের শব্দগুলা বেজায় রোখা মেজাজের। তাহারা প্রত্যেকেই ঢুঁ মারিয়া

* এই পত্র কেম্ব্রিজের বাংলা-অধ্যাপক শ্রীযুক্ত এণ্ডার্সন সাহেবকে লিখিত।

নিশ্বাসের শাসন ঠেলিয়া বাহির হইতে চায়। She was absolutely authentic, new, and inexpressible,—এই বাক্যে যতগুলি বিশেষণপদ আছে সব কটাই উঁচু হইয়া উঠিয়া নিশ্বাসের বাতাসটাকে ফুটবলের গোলার মত এক মাথা হইতে আর এক মাথায় ছুঁড়িয়া ছুঁড়িয়া চালান করিয়া দিতেছে।

প্রত্যেক ভাষারই একটা স্বাভাবিক চলিবার ভঙ্গী আছে। সেই ভঙ্গীটারই অনুসরণ করিয়া সেই ভাষার নৃত্য অর্থাৎ তাহার ছন্দ রচনা করিতে হয়। এখন দেখা যাক্ আমাদের ভাষার চাল-চলনটা কি রকম।

আপনি বলিয়াছেন, বাংলা-বাক্য উচ্চারণে বাক্যের আরম্ভে আমরা ঝোঁক দিয়া থাকি। এই ঝোঁকের দৌড়টা যে কতদূর পর্য্যন্ত হইবে তাহার কোনো বাঁধা নিয়ম নাই,—সেটা আমাদের ইচ্ছা। যদি জোর দিতে না চাই তবে সমস্ত বাক্যটা একটানা বলিতে পারি—যদি জোর দিতে চাই তবে বাক্যের পর্ব্বে পর্ব্বেই ঝোঁক দিয়া থাকি। "আদিম মানবের তুমুল পাশবতা মনে করিয়া দেখ"—এই বাক্যটা আমরা এমনি করিয়া পড়িতে পারি যাহাতে উহার সকল শব্দই একেবারে মাথায় মাথায় সমান হইয়া থাকে। আবার উত্তেজনার বেগে নিম্নলিখিত মত করিয়াও পড়া যাইতে পারে,—আদিম মানবের তুমুল পাশবতা মনে করিয়া দেখ। এই বাংলা-শব্দগুলির নিজের কোনো বিশেষ দাবী নাই—আমাদের মর্জ্জির উপরেই নির্ভর। কিন্তু "Realize the riotous animality of primitive man"—এই বাক্যে প্রায় প্রত্যেক শব্দই নিজ-নিজ একসেণ্টের ধ্বজা গাড়িয়া বসিয়া আছে বলিয়া নিশ্বাস তাহাদিগকে খাতির করিয়া চলিতে বাধ্য।

বাংলা ছন্দে যে পদবিভাগ হয় সেই প্রত্যেক পদের গোড়াতেই একটি করিয়া ঝোঁকালো শব্দ কাপ্তেনি করে এবং তাহার পিছন পিছন কয়েকটি অনুগত শব্দ সমান-তালে পা ফেলিয়া কুচ করিয়া চলিয়া যায়। এইরূপ একএকটি ঝোঁক-কাপ্তেনের অধীনে কয়টা করিয়া মাত্রা-সিপাই থাকিবে ছন্দের নিয়ম-অনুসারে তাহার বরাদ্দ হইয়া থাকে।

পয়ারের রীতিটা দেখা যাক্। পয়ারটা চতুষ্পাদ ছন্দ। আমার বিশ্বাস, পয়ার শব্দটা পদ-চার শব্দের বিকার। ইহার এক-একটি পদ এক একটি ঝোঁকের শাসনে চলে।

মহাভারতের কথা ॥ অমৃত সমান ।
কাশিরামদাস কহে । শুনে পুণ্যবান ।

"অমৃত সমান" ও "শুনে পুণ্যবান" এই দুই অংশে ছয়টি অক্ষর দেখা যাইতেছে বটে কিন্তু মাত্রাগণনায় ইহারা আট। ঐখানে লাইন শেষ হয় বলিয়া দুটি মাত্রা-পরিমাণ জায়গা ফাঁক থাকে। যাহারা সুর করিয়া পড়ে তাহারা "মান" এবং "বান" শব্দের আকারটিকে দীর্ঘাকার করিয়া ঐ ফাঁক ভরাইয়া দেয়।

একএকটি ঝোঁকে কয়টি করিয়া মাত্রা আগলাইতেছে তাহা দেখিয়াই ছন্দের বিচার করিতে হয়। নতুবা যদি মোটা করিয়া বলি যে, একএক লাইনে চোদ্দটা করিয়া অক্ষর থাকিলে তাহাকে পয়ার বলে তবে নানা ভিন্ন প্রকারের ছন্দকে পয়ার বলিতে হয়। নিম্নলিখিত ছন্দে প্রত্যেক লাইনে চোদ্দটা অক্ষর আছে ঃ—

ফাগুন যামিনী, প্রদীপ জ্বলিছে ঘরে।
দখিন বাতাস মরিছে বুকের পরে।

ইহাকে যে পয়ার বলিনা তাহার কারণ ইহার একএকটি ঝোঁকের দখলে ছয়টি করিয়া মাত্রা। ইহার ভাগ নীচে লিখিলাম :—

ফাগুন-যামিনী ॥ প্রদীপ জ্বলিছে ॥ ঘরে— ॥

চোদ্দ-অক্ষরী লাইনের আরো দৃষ্টান্ত আছে —

পূরব মেঘমুখে ॥ পড়েছে রবি-রেখা ॥
অরুণ-রথচূড়া ॥ আধেক গেল দেখা ॥

এখানে স্পষ্টই একএক ঝোঁকে সাতটি করিয়া মাত্রা। সুতরাং পয়ারের তুলনায় প্রত্যেক পদে ইহার একমাত্রা কম।

তবেই দেখা যাইতেছে, আটমাত্রার ছন্দকেই পয়ার বলে। আট মাত্রাকে দুখানা করিয়া চারমাত্রায় ভাগ করা চলে কিন্তু সেটাতে পয়ারের চাল খাটো করা হয়। বস্তুত লম্বা নিশ্বাসের মন্দগতি চালেই পয়ারের পদমর্য্যাদা। চার চার মাত্রায় পা ফেলিয়া পয়ার যখন দুল্‌কি চালে চলে তখন তাহার পায়ে পায়ে মিল থাকে। যেমন—

বাজে তীর, পড়ে বীর ধরণীর পরে।

এরূপ ছন্দ হাল্‌কা কাজে চলে, ইহা যুক্ত-অক্ষরের ভার সয় না এবং সাতকাণ্ড বা অষ্টাদশ পর্ব্ব জুড়িয়া লম্বা দৌড় ইহার পক্ষে অসাধ্য। চৌপদীটা পয়ারের সহোদর বোন্। আটমাত্রায় তাহার পা পড়ে—কেবল তাহার পায়ে মিলের মল-জোড়ার ঝঙ্কারটা কিছু বেশি।

বাহিরের চেহারা দেখিয়া ছন্দের জাতিনির্ণয় করায় যে প্রমাদ ঘটিতে পারে তাহার একটা দৃষ্টান্ত এইখানে দিই।

একদিন আমার মাথায় একটা ছয়মাত্রার ছন্দ আসিয়া হাজির হইয়াছিল। তাহার চেহারাটা এই রকম—

প্রথম শীতের মাসে, শিশির লাগিল ঘাসে,
হুহু করে হাওয়া আসে, হিহি করে কাঁপে গাত্র।

গোটাকয়েক শ্লোক যখন লেখা হইয়া গেছে তখন হঠাৎ হুঁস হইল যে আকারে আয়তনে চৌপদীর সঙ্গে ইহার কোনো তফাৎ নাই অতএব পাঠকেরা আটমাত্রার ঝোঁক দিয়াই ইহা পড়িবে—তখন আমি হাল ছাড়িয়া দিয়া চৌপদীর দস্তুরেই লিখিতে লাগিলাম। এই ছন্দটিকে ছয়মাত্রার কায়দায় পড়িতে হইলে নিম্নলিখিত মত ভাগ হয়ঃ—

প্রথম শীতের ।। মাসে— ।।
শিশির লাগিল ।। ঘাসে— ।।

আমাদের দেশের সঙ্গীতের তাল যদি আপনার জানা থাকে তবে এককথায় বলিলেই বুঝিবেন চৌপদীতে কাওয়ালির লয়ে ঝোঁক দিতে হয় এবং আমি যে ছন্দটা লক্ষ্য করিয়া লিখিতেছিলাম তাহার তাল একতালা। কাওয়ালি দুইবর্গ মাত্রার তাল, এবং একতালা তিনবর্গ মাত্রার।

ত্রিপদীরও মোটের উপর আটমাত্রার চাল। যথা—

ভবানীর কটুভাষে | লজ্জা হৈল কৃত্তিবাসে |
ক্ষুধানলে কলেবর | দহে |

তৃতীয় পদে দুটামাত্রা বেশি আছে, তাহার কারণ, যে চতুর্থ পদটি থাকিলে এই ছন্দের ভার-সামঞ্জস্য থাকিত সেটি নাই। "ক্ষুধানলে

কলেবর" পর্য্যন্ত আসিয়া থামিতে গেলে ছন্দটা কাৎ হইয়া পড়ে এই জন্য "দহে" একটা যোগ করিয়া ছোট একটি ঠেকা দিয়া উহাকে খাড়া রাখা হইয়াছে। চতুষ্পদ জন্তুর পায়ের তেলোটা চওড়া হয় না, কিন্তু মানুষের খাড়া শরীরের টল-টলে ভারটা দুই পায়ের পক্ষে বেশি হওয়াতেই তাহার পদতলটা গোড়ালি ছাড়াইয়া সাম্নের দিকে খানিক্টা বিস্তীর্ণ; সেইটুকুই ত্রিপদীর ঐ শেষ দুটো অতিরিক্ত মাত্রা।

এইরূপ অনেকগুলি ছন্দ দেখা যায় যাহাতে খানিকটাকরিয়া বড় মাত্রাকে একটিকরিয়া ছোট মাত্রা দিয়া বাধা দিবার কায়দা দেখা যায়। দশ মাত্রার ছন্দ তাহার দৃষ্টান্ত—ইহার ভাগ আট + দুই, অথবা, চার + চার + দুই।

মোর পানে | চাহ মুখ | তুলি |
পরশিব | চরণের | ধুলি |

ছয়মাত্রার ছন্দেও এরূপ বড়-ছোটোর ভাগ চলে। সেই ভাগ ছয় + দুই, অথবা, তিন + তিন + দুই। যেমন—

আঁখিতে | মিলিল | আঁখি |
হাসিল | বদন | ঢাকি |
মরম-বারতা সরমে মরিল
কিছু না রহিল বাকি।

উক্ত ছন্দে তিনের দল বুক ফুলাইয়া জুড়ি মিলাইয়া চলিতেছিল, —হঠাৎ মাঝে মাঝে একটা খাপছাড়া দুই আসিয়া তাহাদিগকে বাধা দিয়াছে। এইরূপে গতি ও বাধার মিলনে ছন্দের সঙ্গীত একটু বিশেষভাবে রাজিয়া উঠিয়াছে। এই বাধাটি গতির অনুপাতে ছোট

হওয়া চাই। কারণ, বড় হইলে সে বাধা সত্য হয় এবং গতিকে আবদ্ধ করে, সেটা ছন্দের পক্ষে দুর্ঘটনা। তাই উপরের দুইটি দৃষ্টান্তে দেখিয়াছি চারের দল ও তিনের দলকে দুই আসিয়া রোধ করিয়াছে,—সেই জন্য ইহা বন্ধনের অবরোধ নহে, ইহা লীলার উপরোধ। দুইয়ের পরিবর্ত্তে এক হইলেও ক্ষতি হয় না।

যেমন—

প্রতিদিন হায় | এসে ফিরে যায় | কে ?

অথবা,

মুখে তার | নাহি আর | রা।
লাজে লীন | কাঁপে ক্ষীণ | গা।

বাংলা ছন্দকে তিন প্রধান শ্রেণীতে ভাগ করা যায়। দুই বর্গের মাত্রা, তিন বর্গের মাত্রা এবং অসমান মাত্রার ছন্দ।

দুই বর্গ মাত্রার ছন্দ, যেমন পয়ার, ত্রিপদী, চৌপদী। এই সমস্ত ছন্দ বড় বড় বোঝা বহিতে পারে, কেননা দুই, চার, আট মাত্রাগুলি বেশ চৌকা। এই জন্য পৃথিবীতে পা-ওয়ালা জীবমাত্রেরই, হয় দুই, নয় চার, নয় আট পা। বাংলা-সাহিত্যে ইহারাই মহাকাব্যের বাহন।

চাকার গুণ এই যে একবার ধাক্কা পাইলে সেই ঝোঁকে সে গড়াইয়া চলে, থামিতে চায় না। তিন মাত্রার ছন্দ সেই চাকার মত। দুই সংখ্যাটা স্থিতিপ্রবণ, তিন সংখ্যাটা গতিপ্রবণ।

নবীন | কিশোরী | মেঘের | বিজুরী | চমকি | চলিয়া | গেল ॥

এখানে তিন মাত্রার শব্দগুলি একটা আর-একটার গায়ের উপর

গড়াইয়া পড়িয়া ঠেলা দিয়া চলিয়াছে—থামানো দায়। অবশেষে একটি দুইমাত্রা আসিয়া তাহাকে ক্ষণকালের জন্য ঠেকাইয়াছে।

দুই মাত্রার সঙ্গে তিনমাত্রার মিলনে অসম-মাত্রার ছন্দের উৎপত্তি। ৩+২, ৩+৪, ৫+৪ মাত্রার ছন্দ তাহার দৃষ্টান্ত।

৩+২, যথা,—

কাঁপিলে পাতা, নড়িলে পাখী
চমকি উঠে চকিত আঁখি।

৩+৪

তরল জলধর বরিখে ঝরঝর
অশনি গরগর হাঁকে।

৫+৪

বচন বলে আধো-আধো,
চরণ চলে বাধো-বাধো,
নয়ন তলে কাঁদো-কাঁদো চাহনী।

তিন মাত্রার ছন্দের ন্যায় অসম-মাত্রার ছন্দও স্বভাবত চঞ্চল। মাত্রার অসমানতাই তাহাকে কেবল টলাইতে থাকে। প্রত্যেক পদ পরবর্ত্তী পদের উপর ঠেস দিয়া আপনাকে সামলাইতে চেষ্টা করে। বস্তুত তিনমাত্রাও অসম-মাত্রা, তাহার উপাদান দুই+এক।

কারণ ছন্দের মূল মাত্রা দুই, তাহা এক নহে। নিয়মিত গতিমাত্রই দুই সংখ্যাকে অবলম্বন করিয়া। তাই স্তম্ভ, যাহা থামিয়া থাকে, তাহা এক হইতে পারে, কিন্তু জন্তুর পা বল, পাখীর পাখা বল, মাছের পাখনা বল, দুইয়ের যোগে তবে চলে। সেই দুইয়ের নিয়মিত গতির উপরে যদি একটা একের অতিরিক্ত ভার চাপানো যায় তবে সেই গতিতে একটা অনিয়মের বেগ পড়ে—সেই

অনিয়মের ঠেলায় নিয়মিত গতির বেগ বাড়িয়া যায় এবং তাহার বৈচিত্র্য ঘটে। মানুষের শরীর তাহার দৃষ্টান্ত। চারপেয়ে মানুষ যখন সোজা হইয়া দাঁড়াইল তখন তাহার কোমর হইতে মাথা পর্য্যন্ত টলমলে এবং কোমর হইতে পদতল পর্য্যন্ত মজবুৎ হওয়াতে এই দুইভাগের মধ্যে অসামঞ্জস্য ঘটিয়াছে। এই অসামঞ্জস্যকে ছন্দে সামলাইবার জন্য মানুষের গতিতে মাথা হাত কোমর পা বিচিত্র হিল্লোলে হিল্লোলিত হইতেছে। চার পায়ের ছন্দ ইহার চেয়ে অনেক সরল।

অতএব বাংলা ছন্দকে সমমাত্রা, অসমমাত্রা এবং বিষমমাত্রায় শ্রেণীবদ্ধ করা যাইতে পারে। শুধু বাংলা কেন, কোনো ভাষার ছন্দের আর কোনো প্রকার ভাগ হইতে পারে বলিয়া মনে করিতে পারিনা। তবে প্রভেদ হয় কিসে? মাত্রাগুলির চেহারায়।

সংস্কৃত ভাষায় অসমান স্বর ও ব্যঞ্জনগুলিকে কৌশলে মিলাইয়া সমান মাত্রায় ভাগ করিতে হয়, তাহাতে ধ্বনির বৈচিত্র্য ও গাম্ভীর্য্য ঘটে। যথা—

বদসি যদি | কিঞ্চিদপি | দন্তরুচি | কৌমুদী।
হরতি দর | তিমির মতি | ঘোরং।

ইহা পাঁচমাত্রা অর্থাৎ বিষমমাত্রার ছন্দ। বাঙালি জয়দেব তাঁহার গানে সংস্কৃত ভাষার যুক্তবর্ণের বেণী যথাসম্ভব এলাইয়া দিতে ভালবাসিতেন এই জন্য উপরের উদ্ধৃত শ্লোকাংশটি যথেষ্ট ভালো দৃষ্টান্ত নহে—তবু ইহাতে আমার কথাটি বুঝা যাইবে। ইহার প্রত্যেক ঝোঁকে যে পাঁচমাত্রা পড়িয়াছে তাহার ভাগ এইরূপ :—

১+১+১+১+১ | ২+১+১+১ | ২+১+১+১ | ২+১+২ |
১+১+১+১+১ | ১+১+১+১+১ | ২+২+ – |

বাংলাভাষার সাধুছন্দে একের মাঝে মাঝে দুই বসিবার জায়গা পায় না একথা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। উপরের কবিতাটুকু বাংলায় তর্জ্জমা করিতে হইলে নিম্নলিখিত মত হইবে :—

বচন যদি | কহগো দুটি।
দশন রুচি | উঠিবে ফুটি।
ঘুচাবে মোর | মনের ঘোর | তামসী।

একটি ইংরাজি দৃষ্টান্ত দেওয়া যাক্—

Ah distinctly | I remember |
It was in the | bleak December, | —

এটি চৌপদী ছন্দ। ইহার মাত্রাগুলিকে ছাড়াইয়া দেখা যাক্—

১	২	৩	৪
Ah	dis	tinct	ly
১	২	৩	৪
I	re	mem	ber

ইহার একএকটা ঝোঁকে চারিটি করিয়া মাত্রা,—কিন্তু অসমান শব্দগুলিকে ভাগ করিয়া এই মাত্রাগুলি তৈরি হইয়াছে এবং distinct শব্দের tinct এবং remember শব্দের mem অংশটি নিজের এক্‌সেণ্টের সড়্‌কি আস্ফালন করিতেছে।

ইহাই সাধুবাংলায় হইবে—

আহা মোর মনে আসে
দারুণ শীতের মাসে—

ইংরেজ কবি ইচ্ছা করিলেও এমনতর নখদন্তহীন মাত্রায় ছন্দ রচিতেই পারেন না কারণ তাঁহাদের শব্দগুলি কোণ-ওয়ালা।

ইচ্ছা করিলে যুক্ত-অক্ষরের আমদানি করিয়া আমরা ঐ শ্লোকটাকে শক্ত করিয়া তুলিতে পারি। যেমন—

স্পষ্ট স্মৃতি চিত্তে ভাসে
দুরন্ত অঘ্রাণ মাসে
অগ্নিকুণ্ড নিবে আসে
নাচে তারি উপচ্ছায়া।

এখানে বাংলার সঙ্গে ইংরাজির প্রধান প্রভেদ এই যে, বাংলা শব্দগুলিতে স্বরবর্ণের টান ইংরাজির চেয়ে বেশি। কিন্তু আমার প্রথম পত্রেই লিখিয়াছি সেটা কেবল সাধুভাষায়;—বাংলার চল্‌তি ভাষায় ঠিক ইহার উল্টা। চল্‌তি ভাষার কথাগুলি শুচিভাবে পরস্পরের স্পর্শ বাঁচাইয়া চলে না—ইংরাজি শব্দেরই মত চলিবার সময় কে কাহার গায়ে পড়ে তাহার ঠিক নাই।

পূর্ব্বপত্রেই লিখিয়াছি বাংলা চল্‌তি ভাষার ধ্বনিটা হসন্তের সংঘাতধ্বনি—এই জন্য ধ্বনিহিসাবে সংস্কৃতের চেয়ে ইংরাজির সঙ্গে তাহার মিল বেশি। তাই এই চল্‌তি ভাষার ছন্দে মাত্রাবিভাগ বিচিত্র। বাংলা প্রাকৃতের একটা চৌপদী নীচে লিখিলাম:—

কই পালঙ্ক, কইরে কম্বল,
কপ্‌নি-টুক্‌রো রইল সম্বল,
একলা পাগলা ফির্‌বে জঙ্গল
মিট্‌বে সঙ্কট ঘুচ্‌বে ধন্দ।

ইহার সঙ্গে Ah distinctly I remember শ্লোকটি মিলাইয়া দেখিলে দেখা যাইবে ধ্বনির বিশেষ কোনো তফাৎ নাই।

ইহার সাধু পাঠ এইরূপ :—

শয্যা কই বস্ত্র কই
কি আছে কৌপীন বই
একা বনে ফিরে ঐ
নাহি মনে ভয় চিন্তা।

সাধু ও অসাধুর মাত্রাভাগ নীচেনীচে লিখিলাম মিলাইয়া দেখিবেন :—

১ ২ ৩ ৪ ১ ২ ৩ ৪
কই | পা | লঙ্ | ক ‖ কই | রে | কম্ | বল্ ‖
শ | য্যা | ক | ই ‖ বস্ | ত্র | ক | ই ‖

১ ২ ৩ ৪ ১ ২ ৩ ৪
কপ্ | নি | টুক্ | রো ‖ রই | ল | সম্ | বল্ ‖
কি | আ | ছে | কৌ ‖ পী | ন | ব | ই ‖

১ ২ ৩ ৪ ১ ২ ৩ ৪
এক্ | লা | পাগ্ | লা ‖ ফির্ | বে | জঙ্ | গল্ ‖
এ | কা | ব | নে ‖ ফি | রে | ও | ই ‖

সাধুভাষার ছন্দটি যেন মোটা মোটা ফাঁকওয়ালা জালের মত—আর অসাধুটির একেবারে ঠাসবুনানি।

ইংরাজিতে সমমাত্রার ছন্দ অনেক আছে তাহার একটি দৃষ্টান্ত পূর্ব্বেই দিয়াছি। অসমমাত্রা অর্থাৎ তিনমাত্রার দৃষ্টান্ত, যথা :—

১ ২ ৩ ১ ২ ৩
One | more | un ‖ for | tu | nate ‖

১ ২ ৩ ১ ২ ৩
Wea | ry | of ‖ breath— — ‖

ইংরেজিতে বিষমমাত্রার একটি উদাহরণ দিতে পারিলেই আপাতত আমার পালা শেষ হয়। একটি মনে পড়িতেছে :—

১ ২ ৩ ৪ ৫
When | we | two | par | ted |

১ ২ ৩ ৪ ৫
(In) si | lence | and | tears | — |

১ ২ ৩ ৪ ৫
Half | bro | ken | heart | ed

১ ২ ৩ ৪ ৫
(To) se | ver | for | years | — |

এই শ্লোকটির দুই লাইনকে মিলাইয়া এক লাইন করিয়া পড়িলে ইহার ছন্দকে তিন মাত্রায় ভাগ করিয়া পড়া সহজ হয়। কিন্তু বিষমমাত্রার লয়ে ইহাকে পড়িলে চলে বলিয়াই এই দৃষ্টান্তটি প্রয়োগ করিয়াছি—বোধ করি এরূপ দৃষ্টান্ত ইংরেজি ছন্দে দুর্লভ।

দেখা গিয়াছে ইংরেজি ছন্দে ঝোঁক পদের আরম্ভেও পড়িতে পারে, পদের শেষেও পড়িতে পারে। আরম্ভে যেমন—

O the dreary | dreary moorland |

O the barren | barren shore |

পদের শেষে, যেমন,

And are ye sure || the news is true ||

And are ye sure || he's well ||

বাংলায় আরম্ভে ছাড়া পদের আর কোথাও ঝোঁক পড়িতে পারে না।

একলা পাগলা ফিরবে জঙ্গল

কিম্বা

একলা পাগলা ফিরবে জঙ্গল

এমনটি হইবার জো নাই।

আমার কথাটি ফুরালো। ইংরেজি ছন্দকে আমি বাংলা ছন্দের রীতি-অনুসারে ভাগ করিয়া দেখিয়াছি, সেটা ভালো হইল কিনা জানি না। ইংরেজি ছন্দতত্ত্ব আমার একদম জানা নাই বলিয়াই বোধ করি এরূপ দুঃসাহস আমার পক্ষে সহজ হইয়াছে—কারণ চাণক্য যাহাদিগকে কথা কহিতে বারণ করেন তাহারাই আগেভাগে কথা কহিয়া বসে,—আপনারাও জানেন angelরা প্রবেশ করিতে ভয় পান এমন জায়গা আছে কিন্তু foolদের কোথাও বাধা নাই। এরূপ সতর্কতায় সকল সময়েই যে এঞ্জেলরা জেতেন তাহা নহে অনেক সময়েই ঠকিয়া থাকেন; অবুঝ হঠকারিতায় অপর পক্ষের কখন কখন জিত হইবার সম্ভাবনা আছে এই আমার ভরসা। আপনার পক্ষে বোঝা সহজ হইতে পারে বলিয়াই আমি ইংরেজি দৃষ্টান্তগুলি ব্যবহার করিয়াছি ইহাতে আমার বিদ্যা প্রকাশ না হইয়া বিদ্যা ফাঁস হইয়া যাইতে পারে। যাহা হউক আমার প্রতিশ্রুতি রক্ষা করিলাম।

চিঠির মধ্যে কাটাকুটি অনেক রহিয়াছে সেই সমস্ত ক্ষতচিহ্নসমেত এটা আপনার কাছে চালান করিয়া দিলাম—এই ত্রুটিকে বেয়াদবি বলিয়া গণ্য করিবেন না। চিন্তার সঙ্গে লড়াই করিতে হইয়াছে—তবু রণে ভঙ্গ না দিয়া বক্ষের উপর তলোয়ারের দাগ বহিয়া এই পত্র আপনার সভায় হাজির হইয়া আপনাকে সেলাম জানাইতেছে। ইতি

১৮ আষাঢ়, ১৩২১

ভবদীয়

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

স্ত্রীর পত্র

শ্রীচরণকমলেষু—

আজ পনেরো বছর আমাদের বিবাহ হয়েছে আজ পর্য্যন্ত তোমাকে চিঠি লিখিনি। চিরদিন কাছেই পড়ে আছি—মুখের কথা অনেক শুনেছ, আমিও শুনেছি; চিঠি লেখবার মত ফাঁকটুকু পাওয়া যায়নি।

আজ আমি এসেছি তীর্থ করতে শ্রীক্ষেত্রে, তুমি আছ তোমার আপিসের কাজে। শামুকের সঙ্গে খোলসের যে সম্বন্ধ, কলকাতার সঙ্গে তোমার তাই; সে তোমার দেহমনের সঙ্গে এঁটে গিয়েছে। তাই তুমি আপিসে ছুটির দরখাস্ত করলে না। বিধাতার তাই অভিপ্রায় ছিল; তিনি আমার ছুটির দরখাস্ত মঞ্জুর করেছেন।

আমি তোমাদের মেজ বৌ। আজ পনেরো বছরের পরে এই সমুদ্রের ধারে দাঁড়িয়ে জান্‌তে পেরেছি আমার জগৎ এবং জগদীশ্বরের সঙ্গে আমার অন্য সম্বন্ধও আছে। তাই আজ সাহস করে এই চিঠিখানি লিখ্‌চি, এ তোমাদের মেজ-বৌয়ের চিঠি নয়।

তোমাদের সঙ্গে আমার সম্বন্ধ কপালে যিনি লিখেছিলেন তিনি ছাড়া যখন সেই সম্ভাবনার কথা আর কেউ জান্‌তনা সেই শিশু-বয়সে আমি আর আমার ভাই একসঙ্গেই সান্নিপাতিক জ্বরে পড়ি। আমার ভাইটি মারা গেল, আমি বেঁচে উঠ্‌লুম। পাড়ার সব মেয়েরাই বল্‌তে লাগ্‌ল, মৃণাল মেয়ে কিনা তাই ও বাঁচল, বেটাছেলে হলে কি আর রক্ষা পেত?—চুরিবিদ্যাতে যম পাকা; দামী জিনিষের পরেই তার লোভ।

আমার মরণ নেই। সেই কথাটাই ভালো করে বুঝিয়ে বলবার জন্যে এই চিঠিখানি লিখ্‌তে বসেছি।

যেদিন তোমাদের দূর-সম্পর্কের মামা তোমার বন্ধু নীরদকে নিয়ে কনে দেখ্‌তে এলেন তখন আমার বয়স বারো। দুর্গম পাড়াগাঁয়ে আমাদের বাড়ি, সেখানে দিনের-বেলা শেয়াল ডাকে। ষ্টেশন থেকে সাত ক্রোশ শ্যাকড়া গাড়িতে এসে বাকি তিন মাইল কাঁচা রাস্তায় পাল্কী করে তবে আমাদের গাঁয়ে পৌঁছন যায়। সেদিন তোমাদের কি হয়রানী! তার উপরে আমাদের বাঙাল-দেশের রান্না,—সেই রান্নার প্রহসন আজও মামা ভোলেননি।

তোমাদের বড়-বৌয়ের রূপের অভাব মেজ-বৌকে দিয়ে পূরণ করবার জন্যে তোমার মায়ের একান্ত জিদ ছিল। নইলে এত কষ্ট করে আমাদের সে গাঁয়ে তোমরা যাবে কেন? বাংলা দেশে পিলে যকৃৎ অম্লশূল এবং কনের জন্যে ত কাউকে খোঁজ করতে হয় না— তারা আপনি এসে চেপে ধরে, কিছুতে ছাড়তে চায় না।

বাবার বুক দুরদুর করতে লাগ্‌ল, মা দুর্গানাম জপ করতে লাগ্‌লেন। সহরের দেবতাকে পাড়াগাঁয়ের পূজারী কি দিয়ে সন্তুষ্ট করবে? মেয়ের রূপের উপর ভরসা; কিন্তু সেই রূপের গুমর ত মেয়ের মধ্যে নেই—যে ব্যক্তি দেখতে এসেছে সে তাকে যে দামই দেবে সেই তার দাম। তাই ত হাজার রূপে গুণেও মেয়েমানুষের সঙ্কোচ কিছুতে ঘোচে না।

সমস্ত বাড়ির, এমন কি, সমস্ত পাড়ার এই আতঙ্ক আমার বুকের মধ্যে পাথরের মত চেপে বস্‌ল। সেদিনকার আকাশের যত আলো এবং জগতের সকল শক্তি যেন বারো বছরের একটি পাড়াগেঁয়ে

মেয়েকে দুইজন পরীক্ষকের দুই-জোড়া চোখের সামনে শক্ত করে তুলে ধরবার জন্যে পেয়াদাগিরি করছিল—আমার কোথাও লুকোবার জায়গা ছিল না।

সমস্ত আকাশকে কাঁদিয়ে দিয়ে বাঁশি বাজ্‌তে লাগল—তোমাদের বাড়িতে এসে উঠ্‌লুম। আমার খুঁৎগুলি সবিস্তারে খতিয়ে দেখেও গিন্নির দল সকলে স্বীকার করলেন মোটের উপর আমি সুন্দরী বটে। সে কথা শুনে আমার বড় জায়ের মুখ গম্ভীর হয়ে গেল। কিন্তু আমার রূপের দরকার কি ছিল তাই ভাবি! রূপ জিনিষটাকে যদি কোনো সেকেলে পণ্ডিত গঙ্গামৃত্তিকা দিয়ে গড়তেন তাহলে ওর আদর থাক্‌ত—কিন্তু ওটা যে কেবল বিধাতা নিজের আনন্দে গড়েছেন তাই তোমাদের ধর্ম্মের সংসারে ওর দাম নেই।

আমার যে রূপ আছে সে কথা ভুলতে তোমার বেশিদিন লাগেনি—কিন্তু আমার যে বুদ্ধি আছে সেটা তোমাদের পদে পদে স্মরণ করতে হয়েছে। ঐ বুদ্ধিটা আমার এতই স্বাভাবিক যে তোমাদের ঘরকন্নার মধ্যে এতকাল কাটিয়েও আজও সে টিঁকে আছে। মা আমার এই বুদ্ধিটার জন্যে বিষম উদ্বিগ্ন ছিলেন, মেয়েমানুষের পক্ষে এ এক বালাই। যাকে বাধা মেনে চল্‌তে হবে সে যদি বুদ্ধিকে মেনে চল্‌তে চায় তবে ঠোকর খেয়ে খেয়ে তার কপাল ভাঙবেই। কিন্তু কি করব বল? তোমাদের ঘরের বৌয়ের যতটা বুদ্ধির দরকার বিধাতা অসতর্ক হয়ে আমাকে তার চেয়ে অনেকটা বেশি দিয়ে ফেলেছেন, সে আমি এখন ফিরিয়ে দিই কাকে? তোমরা আমাকে মেয়ে-জ্যাঠা বলে দুবেলা গাল দিয়েছ। কটু কথাই হচ্চে অক্ষমের সান্ত্বনা—অতএব সে আমি ক্ষমা করলুম।

৫

আমার একটা জিনিষ তোমাদের ঘরকন্নার বাইরে ছিল সেটা কেউ তোমরা জাননি। আমি লুকিয়ে কবিতা লিখ্‌তুম। সে ছাই পাঁশ যাই হোক্ না সেখানে তোমাদের অন্দরমহলের পাঁচিল ওঠেনি। সেইখানে আমার মুক্তি—সেইখানে আমি আমি। আমার মধ্যে যা কিছু তোমাদের মেজ-বৌকে ছাড়িয়ে রয়েছে সে তোমরা পছন্দ করনি চিন্‌তেও পারনি ;—আমি যে কবি সে এই পনেরো বছরেও তোমাদের কাছে ধরা পড়েনি।

তোমাদের ঘরের প্রথম স্মৃতির মধ্যে সব চেয়ে যেটা আমার মনে জাগচে সে, তোমাদের গোয়াল-ঘর। অন্দরমহলের সিঁড়িতে ওঠবার ঠিক পাশের ঘরেই তোমাদের গোরু থাকে, সাম্‌নের উঠোনটুকু ছাড়া তাদের আর নড়বার জায়গা নেই। সেই উঠোনের কোণে তাদের জাবনা দেবার কাঠের গামলা। সকালে বেহারার নানা কাজ—উপবাসী গোরুগুলো ততক্ষণ সেই গামলার ধারগুলো চেটে চেটে চিবিয়ে চিবিয়ে খাব্‌লা করে দিত। আমার প্রাণ কাঁদত। আমি পাড়াগাঁয়ের মেয়ে—তোমাদের বাড়িতে যেদিন নতুন এলুম সেদিন সেই দুটি গোরু এবং তিনটি বাছুরই সমস্ত সহরের মধ্যে আমার চিরপরিচিত আত্মীয়ের মত আমার চোখে ঠেকল। যতদিন নতুন বৌ ছিলুম নিজে না খেয়ে লুকিয়ে ওদের খাওয়াতুম—যখন বড় হলুম তখন গোরুর প্রতি আমার প্রকাশ্য মমতা লক্ষ্য করে আমার ঠাট্টার সম্পর্কীয়েরা আমার গোত্রসম্বন্ধে সন্দেহ প্রকাশ করতে লাগ্‌লেন।

আমার মেয়েটি জন্ম নিয়েই মারা গেল। আমাকেও সে সঙ্গে যাবার সময় ডাক দিয়েছিল। সে যদি বেঁচে থাক্‌ত তাহলে সেই

আমার জীবনে, যা কিছু বড়, যা কিছু সত্য, সমস্ত এনে দিত; তখন মেজ-বৌ থেকে একেবারে মা হয়ে বস্‌তুম। মা যে এক-সংসারের মধ্যে থেকেও বিশ্বসংসারের। মা-হবার দুঃখটুকু পেলুম কিন্তু মা-হবার মুক্তিটুকু পেলুম না।

মনে আছে ইংরেজ ডাক্তার এসে আমাদের অন্দর দেখে আশ্চর্য্য হয়েছিল এবং আঁতুড়ঘর দেখে বিরক্ত হয়ে বকাবকি করেছিল। সদরে তোমাদের একটুখানি বাগান আছে। ঘরে সাজসজ্জা আসবাবের অভাব নেই। আর অন্দরটা যেন পশমের কাজের উল্টো পিঠ—সেদিকে কোনো লজ্জা নেই, শ্রী নেই, সজ্জা নেই। সেদিকে আলো মিটমিট্ করে জ্বলে; হাওয়া চোরের মত প্রবেশ করে, উঠোনের আবর্জ্জনা নড়তে চায় না; দেয়ালের এবং মেজের সমস্ত কলঙ্ক অক্ষয় হয়ে বিরাজ করে। কিন্তু ডাক্তার একটা ভুল করেছিল, সে ভেবেছিল এটা বুঝি আমাদের অহোরাত্র দুঃখ দেয়। ঠিক উল্টো; অনাদর জিনিষটা ছাইয়ের মত; সে ছাই আগুনকে হয়ত ভিতরে ভিতরে জমিয়ে রাখে কিন্তু বাইরে থেকে তার তাপটাকে বুঝতে দেয় না। আত্মসম্মান যখন কমে যায় তখন অনাদরকে ত অন্যায্য বলে মনে হয় না। সেই জন্যে তার বেদনা নেই। তাই ত মেয়েমানুষ দুঃখ বোধ করতেই লজ্জা পায়। আমি তাই বলি মেয়েমানুষকে দুঃখ পেতেই হবে এইটে যদি তোমাদের ব্যবস্থা হয়—তাহলে যতদূর সম্ভব তাকে অনাদরে রেখে দেওয়াই ভালো। আদরে দুঃখের ব্যথাটা কেবল বেড়ে ওঠে।

যেমন করেই রাখ দুঃখ যে আছে এ কথা মনে করবার কথাও

কোনোদিন মনে আসেনি। আঁতুড়ঘরে মরণ মাথার কাছে এসে দাঁড়াল, মনে ভয়ই হল না। জীবন আমাদের কিইবা, যে মরণকে ভয় করতে হবে? আদরে যত্নে যাদের প্রাণের বাঁধন শক্ত করেছে, মরতে তাদেরই বাধে। সেদিন যম যদি আমাকে ধরে টান দিত তাহলে আলগা মাটি থেকে যেমন অতি সহজে ঘাসের চাপ্‌ড়া উঠে আসে সমস্ত শিকড়সুদ্ধ আমি তেমনি করে উঠে আস্‌তুম। বাঙালীর মেয়ে ত কথায় কথায় মরতে যায়। কিন্তু এমন মরায় বাহাদুরিটা কি! মরতে লজ্জা হয়,—আমাদের পক্ষে ওটা এতই সহজ।

আমার মেয়েটি ত সন্ধ্যাতারার মত ক্ষণকালের জন্যে উদয় হয়েই অস্ত গেল। আবার আমার নিত্যকর্ম্ম এবং গোরুবাছুর নিয়ে পড়লুম। জীবন তেমনি করেই গড়াতে গড়াতে শেষ পর্য্যন্ত কেটে যেত আজকে তোমাকে এই চিঠি লেখবার দরকারই হত না। কিন্তু বাতাসে সামান্য একটা বীজ উড়িয়ে নিয়ে এসে পাকা দালানের মধ্যে অশথগাছের অঙ্কুর বের করে; শেষকালে সেইটুকু থেকে ইঁটকাঠের বুকের পাঁজর বিদীর্ণ হয়ে যায়। আমার সংসারের পাকা বন্দোবস্তের মাঝখানে ছোট একটুখানি জীবনের কণা কোথা থেকে উড়ে এসে পড়ল, তার পর থেকে ফাটল সুরু হল।

বিধবা মার মৃত্যুর পরে আমার বড় জায়ের বোন বিন্দু তার খুড়তত ভাইদের অত্যাচারে আমাদের বাড়িতে তার দিদির কাছে এসে যেদিন আশ্রয় নিলে তোমরা সেদিন ভাবলে এ আবার কোথাকার আপদ! আমার পোড়া স্বভাব, কি করব বল, দেখ্‌লুম তোমরা সুকলেই মনে মনে বিরক্ত হয়ে উঠেছ সেইজন্যেই এই

নিরাশ্রয় মেয়েটির পাশে আমার সমস্ত মন যেন একেবারে কোমর বেঁধে দাঁড়াল। পরের বাড়িতে পরের অনিচ্ছাতে এসে আশ্রয় নেওয়া—সে কত বড় অপমান! দায়ে পড়ে সেও যাকে স্বীকার করতে হল তাকে কি একপাশে ঠেলে রাখা যায়?

তার পরে দেখলুম আমার বড় জায়ের দশা। তিনি নিতান্ত দরদে পড়ে বোনটিকে নিজের কাছে এনেছেন। কিন্তু যখন দেখ্‌লেন স্বামীর অনিচ্ছা, তখন এমনি ভাব করতে লাগ্‌লেন যেন এ তাঁর এক বিষম বালাই—যেন এ'কে দূর করতে পারলেই তিনি বাঁচেন। এই অনাথা বোনটিকে মন খুলে প্রকাশ্যে স্নেহ দেখাবেন সে সাহস তাঁর হল না। তিনি পতিব্রতা।

তাঁর এই সঙ্কট দেখে আমার মন আরো ব্যথিত হয়ে উঠ্‌ল। দেখলুম বড় জা সকলকে একটু বিশেষ করে দেখিয়ে দেখিয়ে বিন্দুর খাওয়া-পরার এম্‌নি মোটা রকমের ব্যবস্থা করলেন, এবং বাড়ির সর্ব্বপ্রকার দাসীবৃত্তিতে তাকে এমন ভাবে নিযুক্ত করলেন যে আমার, কেবল দুঃখ নয়, লজ্জা বোধ হল। তিনি সকলের কাছে প্রমাণ করবার জন্যে ব্যস্ত যে আমাদের সংসারে ফাঁকি দিয়ে বিন্দুকে ভারি সুবিধাদরে পাওয়া গেছে। ও কাজ দেয় বিস্তর অথচ খরচের হিসাবে বেজায় শস্তা।

আমাদের বড় জায়ের বাপের বংশে কুল ছাড়া আর বড় কিছু ছিল না। রূপও না টাকাও না। আমার শ্বশুরের হাতে পায়ে ধরে কেমন করে তোমাদের ঘরে তাঁর বিবাহ হল সে ত সমস্তই জান। তিনি নিজের বিবাহটাকে এ বংশের প্রতি বিষম একটা অপরাধ বলেই চিরকাল মনে জেনেছেন। সেইজন্যে সকল বিষয়েই নিজেকে

যতদূর সম্ভব সঙ্কুচিত করে তোমাদের ঘরে তিনি অতি অল্প জায়গা জুড়ে থাকেন।

কিন্তু তাঁর এই সাধু দৃষ্টান্তে আমাদের বড় মুস্কিল হয়েছে। আমি সকল দিকে আপনাকে অত অসম্ভব খাটো করতে পারিনে। আমি যেটাকে ভালো বলে বুঝি আর-কারো খাতিরে সেটাকে মন্দ বলে মেনে নেওয়া আমার কর্ম্ম নয়—তুমিও তার অনেক প্রমাণ পেয়েছ।

বিন্দুকে আমি আমার ঘরে টেনে নিলুম। দিদি বল্লেন, "মেজ-বৌ গরীবের ঘরের মেয়ের মাথাটি খেতে বস্‌লেন।" আমি যেন বিষম একটা বিপদ ঘটালুম এমনি ভাবে তিনি সকলের কাছে নালিশ করে বেড়ালেন। কিন্তু আমি নিশ্চয় জানি তিনি মনে মনে বেঁচে গেলেন। এখন দোষের বোঝা আমার উপরেই পড়ল। তিনি বোনকে নিজে যে স্নেহ দেখাতে পারতেন না আমাকে দিয়ে সেই স্নেহটুকু করিয়ে নিয়ে তাঁর মনটা হাল্‌কা হল। আমার বড় জা বিন্দুর বয়স থেকে দুচারটে অঙ্ক বাদ দিতে চেষ্টা করতেন। কিন্তু তার বয়স যে চোদ্দর চেয়ে কম ছিল না একথা লুকিয়ে বল্‌লে অন্যায় হত না। তুমি ত জান সে দেখ্‌তে এতই মন্দ ছিল যে, পড়ে গিয়ে সে যদি মাথা ভাঙত তবে ঘরের মেজেটার জন্যেই লোকে উদ্বিগ্ন হত। কাজেই পিতামাতার অভাবে কেউ তাকে বিয়ে দেবার ছিল না, এবং তাকে বিয়ে করবার মত মনের জোরই বা ক'জন লোকের ছিল।

বিন্দু বড় ভয়ে ভয়ে আমার কাছে এল। যেন আমার গায়ে তার ছোঁয়াচ লাগ্‌লে আমি সইতে পারব না। বিশ্বসংসারে তার

যেন জন্মাবার কোনো সর্ত্ত ছিল না—তাই সে কেবলি পাশ কাটিয়ে চোখ এড়িয়ে চল্‌ত। তার বাপের বাড়িতে তার খুড়তত ভাইরা তাকে এমন একটু কোণও ছেড়ে দিতে চায়নি যে কোণে একটা অনাবশ্যক জিনিষ পড়ে থাকতে পারে। অনাবশ্যক আবর্জ্জনা ঘরের আশেপাশে অনায়াসে স্থান পায় কেননা মানুষ তাকে ভুলে যায়, কিন্তু অনাবশ্যক মেয়েমানুষ যে একে অনাবশ্যক আবার তার উপরে তাকে ভোলাও শক্ত সেইজন্যে আঁস্তাকুঁড়েও তার স্থান নেই। অথচ বিন্দুর খুড়তত ভাইরা যে জগতে পরমাবশ্যক পদার্থ তা বলবার জো নেই। কিন্তু তারা বেশ আছে।

তাই বিন্দুকে যখন আমার ঘরে ডেকে আন্‌লুম তার বুকের মধ্যে কাঁপতে লাগ্‌ল। তার ভয় দেখে আমার বড় দুঃখ হল। আমার ঘরে যে তার একটুখানি জায়গা আছে সেই কথাটি আমি অনেক আদর করে তাকে বুঝিয়ে দিলুম।

কিন্তু আমার ঘর শুধু ত আমারই ঘর নয়। কাজেই আমার কাজটি সহজ হল না। দুচার দিন আমার কাছে থাক্‌তেই তার গায়ে লাল-লাল কি উঠ্‌ল—হয় ত সে ঘামাচি, নয় ত আর কিছু হবে। তোমরা বল্‌লে বসন্ত। কেননা, ওযে বিন্দু। তোমাদের পাড়ার এক আনাড়ি ডাক্তার এসে বল্‌লে, আর দুই একদিন না গেলে ঠিক বলা যায় না। কিন্তু সেই দুই একদিনের সবুর সইবে কে? বিন্দু ত তার ব্যামোর লজ্জাতেই মরবার জো হল। আমি বল্‌লুম, বসন্ত হয় ত হোক্‌—আমি আমাদের সেই আঁতুড়ঘরে ওকে নিয়ে থাক্‌ব, আর কাউকে কিছু করতে হবে না। এই নিয়ে আমার উপরে তোমরা যখন সকলে মারমূর্ত্তি ধরেছ, এমন কি বিন্দুর দিদিও যখন

অত্যন্ত বিরক্তির ভান করে পোড়াকপালি মেয়েটাকে হাঁসপাতালে পাঠাবার প্রস্তাব করচেন এমন সময় ওর গায়ের সমস্ত লাল দাগ একদম মিলিয়ে গেল। তোমরা দেখি তাতে আরো ব্যস্ত হয়ে উঠ্‌লে। বল্‌লে, নিশ্চয়ই বসন্ত বসে গিয়েছে। কেননা, ওযে বিন্দু।

অনাদরে মানুষ হবার একটা মস্ত গুণ, শরীরটাকে তাতে একেবারে অজর অমর করে তোলে। ব্যামো হতেই চায় না—মরার সদর রাস্তাগুলো একেবারেই বন্ধ। রোগ তাই ওকে ঠাট্টা করে গেল, কিছুই হল না। কিন্তু এটা বেশ বোঝা গেল পৃথিবীর মধ্যে সব চেয়ে অকিঞ্চিৎকর মানুষকে আশ্রয় দেওয়াই সব চেয়ে কঠিন! আশ্রয়ের দরকার তার যত বেশি আশ্রয়ের বাধাও তার তেমনি বিষম।

আমার সম্বন্ধে বিন্দুর ভয় যখন ভাঙল তখন ওকে আর-এক গেরোয় ধরল। আমাকে এমনি ভালবাস্‌তে সুরু কর্‌লে যে আমাকে ভয় ধরিয়ে দিলে। ভালবাসার এ রকম মূর্ত্তি সংসারে ত কোনোদিন দেখিনি। বইয়েতে পড়েছি বটে, সেও মেয়ে পুরুষের মধ্যে। আমার যে রূপ ছিল সে কথা আমার মনে করবার কোনো কারণ বহুকাল ঘটেনি—এতদিন পরে সেই রূপটা নিয়ে পড়ল এই কুশ্রী মেয়েটি। আমার মুখ দেখে তার চোখের আশ আর মিটত না। বল্‌ত, "দিদি তোমার এই মুখখানি আমি-ছাড়া আর কেউ দেখ্‌তে পায়নি।" যেদিন আমি নিজের চুল নিজে বাঁধতুম সেদিন তার ভারি অভিমান। আমার চুলের বোঝা দুই হাত দিয়ে নাড়তে চাড়তে তার ভারি ভালো লাগ্‌ত। কোথাও নিমন্ত্রণে যাওয়া ছাড়া আমার সাজগোজের ত দরকার ছিল না—কিন্তু বিন্দু আমাকে অস্থির করে

রোজই কিছু-না-কিছু সাজ করাত। মেয়েটা আমাকে নিয়ে একেবারে পাগল হয়ে উঠ্‌ল।

তোমাদের অন্দরমহলে কোথাও জমি এক ছটাক নেই। উত্তর দিকের পাঁচিলের গায়ে নর্দ্দমার ধারে কোনোগতিকে একটা গাব গাছ জন্মেছে। যেদিন দেখ্‌তুম সেই গাবের গাছের নতুন পাতাগুলি রাঙা টক্‌টকে হয়ে উঠেছে সেইদিন জান্‌তুম ধরাতলে বসন্ত এসেছে বটে। আমার ঘরকন্নার মধ্যে ঐ অনাদৃত মেয়েটার চিত্ত যেদিন আগাগোড়া এমন রঙীন হয়ে উঠ্‌ল সেদিন আমি বুঝলুম হৃদয়ের জগতেও একটা বসন্তের হাওয়া আছে—সে কোন্ স্বর্গ থেকে আসে, গলির মোড় থেকে আসে না।

বিন্দুর ভালবাসার দুঃসহবেগে আমাকে অস্থির করে তুলেছিল—একএকবার তার উপর রাগ হত সে কথা স্বীকার করি—কিন্তু তার এই ভালবাসার ভিতর দিয়ে আমি আপনার একটি স্বরূপ দেখলুম যা আমি জীবনে আর কোনোদিন দেখিনি। সেই আমার মুক্ত স্বরূপ।

এদিকে, বিন্দুর মত মেয়েকে আমি যে এতটা আদর যত্ন করচি এ তোমাদের অত্যন্ত বাড়াবাড়ি বলে ঠেকল। এর জন্যে খুঁৎ-খুঁৎ খিটখিটের অন্ত ছিল না। যেদিন আমার ঘর থেকে বাজুবন্ধ চুরি গেল সেদিন সেই চুরিতে বিন্দুর যে কোনোরকমের হাত ছিল এ কথার আভাস দিতে তোমাদের লজ্জা হল না। যখন স্বদেশী হাঙ্গামায় লোকের বাড়িতল্লাসী হতে লাগ্‌ল তখন তোমরা অনায়াসে সন্দেহ করে বস্‌লে যে, বিন্দু পুলিষের পোষা মেয়ে-চর। তার আর কোনো প্রমাণ ছিল না কেবল এই প্রমাণ যে, ও বিন্দু।

তোমাদের বাড়ির দাসীরা ওর কোনোরকম কাজ করতে আপত্তি

করত,—তাদের কাউকে ওর কাজ করবার ফরমাস করলে ও মেয়েও একেবারে সঙ্কোচে যেন আড়ষ্ট হয়ে উঠ্‌ত। এই সকল কারণেই ওর জন্যে আমার খরচ বেড়ে গেল। আমি বিশেষ করে একজন আলাদা দাসী রাখ্‌লুম। সেটা তোমাদের ভালো লাগেনি। বিন্দুকে আমি যে সব কাপড় পরতে দিতুম তা দেখে তুমি এত রাগ করেছিলে যে আমার হাত-খরচের টাকা বন্ধ করে দিলে। তার পরদিন থেকে আমি পাঁচশিকে দামের জোড়া মোটা কোরা কলের ধুতি পরতে আরম্ভ করে দিলুম। আর মতির মা যখন আমার এঁটো ভাতের থালা নিয়ে যেতে এল তাকে বারণ করে দিলুম। আমি নিজে উঠোনের কলতলায় গিয়ে এঁটো ভাত বাছুরকে খাইয়ে বাসন মেজেছি। একদিন হঠাৎ সেই দৃশ্যটি দেখে তুমি খুব খুসি হওনি। আমাকে খুসি না করলেও চলে আর তোমাদের খুসি না করলেই নয় এই সুবুদ্ধিটা আজ পর্য্যন্ত আমার ঘটে এল না।

এদিকে তোমাদের রাগও যেমন বেড়ে উঠেছে বিন্দুর বয়সও তেমনি বেড়ে চলেছে। সেই স্বাভাবিক ব্যাপারে তোমরা অস্বাভাবিক রকমে বিব্রত হয়ে উঠেছিলে। একটা কথা মনে করে আমি আশ্চর্য্য হই তোমরা জোর করে কেন বিন্দুকে তোমাদের বাড়ি থেকে বিদায় করে দাওনি। আমি বেশ বুঝি তোমরা আমাকে মনে মনে ভয় কর। বিধাতা যে আমাকে বুদ্ধি দিয়েছিলেন ভিতরে ভিতরে তার খাতির না করে তোমরা বাঁচ না।

অবশেষে বিন্দুকে নিজের শক্তিতে বিদায় করতে না পেরে তোমরা প্রজাপতি-দেবতার শরণাপন্ন হলে। বিন্দুর বর ঠিক হল। বড় জা বল্‌লেন, বাঁচ্‌লুম, মা কালী আমাদের বংশের মুখ রক্ষা করলেন।

বর কেমন তা জানিনে ; তোমাদের কাছে শুন্‌লুম সকল বিষয়েই ভালো। বিন্দু আমার পা জড়িয়ে ধরে কাঁদতে লাগ্‌ল—বল্লে, "দিদি, আমার আবার বিয়ে করা কেন ?"

আমি তাকে অনেক বুঝিয়ে বল্‌লুম,—"বিন্দু, তুই ভয় করিস্‌নে—শুনেছি তোর বর ভালো।"

বিন্দু বল্‌লে,—"বর যদি ভালো হয় আমার কি আছে যে আমাকে তার পছন্দ হবে ?"

বরপক্ষেরা বিন্দুকে ত দেখ্‌তে আসবার নামও কর্‌লে না। বড় দিদি তাতে বড় নিশ্চিন্ত হলেন।

কিন্তু দিনরাত্রে বিন্দুর কান্না আর থাম্‌তে চায় না। সে তার কি কষ্ট সে আমি জানি। বিন্দুর জন্যে আমি সংসারে অনেক লড়াই করেছি কিন্তু ওর বিবাহ বন্ধ হোক্ এ কথা বলবার সাহস আমার হল না। কিসের জোরেই বা বল্‌ব ? আমি যদি মারা যাই ত ওর কি দশা হবে ?

একে ত মেয়ে, তাতে কালো মেয়ে—কার ঘরে চল্‌ল, ওর কি দশা হবে—সে কথা না ভাবাই ভালো। ভাবতে গেলে প্রাণ কেঁপে ওঠে।

বিন্দু বল্লে,—"দিদি, বিয়ের আর পাঁচদিন আছে, এর মধ্যে আমার মরণ হবে না কি ?"

আমি তাকে খুব ধম্‌কে দিলুম কিন্তু অন্তর্যামী জানেন যদি কোনো সহজভাবে বিন্দুর মৃত্যু হতে পারত তাহলে আমি আরাম বোধ করতুম।

বিবাহের আগের দিন বিন্দু তার দিদিকে গিয়ে বল্লে,—"দিদি,

আমি তোমাদের গোয়ালঘরে পড়ে থাক্‌ব, আমাকে যা বল্‌বে তাই করব, তোমার পায়ে পড়ি আমাকে এমন করে ফেলে দিয়ো না।”

কিছুকাল থেকে লুকিয়ে লুকিয়ে দিদির চোখ দিয়ে জল পড়ছিল, সেদিনও পড়ল। কিন্তু শুধু হৃদয় ত নয় শাস্ত্রও আছে; তিনি বল্লেন,—“জানিস্‌ ত, বিন্দী, পতিই হচ্চে স্ত্রীলোকের গতিমুক্তি সব। কপালে যদি দুঃখ থাকে ত কেউ খণ্ডাতে পারবে না।”

আসল কথা হচ্চে কোনো দিকে কোনো রাস্তাই নেই—বিন্দুকে বিবাহ করতেই হবে—তার পরে যা হয় তা হোক্‌।

আমি চেয়েছিলুম বিবাহটা যাতে আমাদের বাড়িতেই হয়। কিন্তু তোমরা বলে বস্‌লে বরের বাড়িতেই হওয়া চাই—সেটা তাদের কৌলিক প্রথা।

আমি বুঝলুম বিন্দুর বিবাহের জন্যে যদি তোমাদের খরচ করতে হয় তবে সেটা তোমাদের গৃহদেবতার কিছুতেই সইবে না। কাজেই চুপ করে যেতে হল। কিন্তু একটি কথা তোমরা কেউ জানো না। দিদিকে জানাবার ইচ্ছে ছিল কিন্তু জানাইনি কেননা তাহলে তিনি ভয়েই মরে যেতেন,—আমার কিছু কিছু গয়না দিয়ে আমি লুকিয়ে বিন্দুকে সাজিয়ে দিয়েছিলুম। বোধ করি দিদির চোখে সেটা পড়ে থাক্‌বে কিন্তু সেটা তিনি দেখেও দেখেননি। দোহাই ধর্ম্মের, সেজন্যে তোমরা তাঁকে ক্ষমা কোরো।

যাবার আগে বিন্দু আমাকে জড়িয়ে ধরে বল্লে,—“দিদি, আমাকে তোমরা তাহলে নিতান্তই ত্যাগ করলে?”

আমি বল্লুম,—“না বিন্দী, তোর যেমন দশাই হোকনা কেন আমি তোকে শেষ পর্য্যন্ত ত্যাগ করব না।”

তিন দিন গেল। তোমাদের তালুকের প্রজা খাবার জন্যে তোমাকে যে ভেড়া দিয়েছিল তাকে তোমার জঠরাগ্নি থেকে বাঁচিয়ে আমি আমাদের একতলায় কয়লা-রাখবার ঘরের একপাশে বাস করতে দিয়েছিলুম। সকালে উঠেই আমি নিজে তাকে দানা খাইয়ে আস্‌তুম ;—তোমার চাকরদের প্রতি দুই একদিন নির্ভর করে দেখেছি তাকে খাওয়ানোর চেয়ে তাকে খাওয়ার প্রতিই তাদের বেশি ঝোঁক।

সেদিন সকালে সেই ঘরে ঢুকে দেখি বিন্দু এককোণে জড়সড় হয়ে বসে আছে। আমাকে দেখেই আমার পা জড়িয়ে ধরে লুটিয়ে পড়ে নিঃশব্দে কাঁদতে লাগ্‌ল।

বিন্দুর স্বামী পাগল।

"সত্যি বলছিস্ বিন্দী ?"

"এত বড় মিথ্যা কথা তোমার কাছে বল্‌তে পারি দিদি ? তিনি পাগল। শ্বশুরের এই বিবাহে মত ছিল না—কিন্তু তিনি আমার শাশুড়িকে যমের মত ভয় করেন। তিনি বিবাহের পূর্ব্বেই কাশী চলে গেছেন। শাশুড়ি জেদ করে তাঁর ছেলের বিয়ে দিয়েছেন।"

আমি সেই রাশ-করা কয়লার উপর বসে পড়লুম। মেয়েমানুষকে মেয়েমানুষ দয়া করে না। বলে, ও ত মেয়েমানুষ বই ত নয়। ছেলে হোক্‌না পাগল, সে ত পুরুষ বটে।

বিন্দুর স্বামীকে হঠাৎ পাগল বলে বোঝা যায় না—কিন্তু এক-একদিন সে এমন উন্মাদ হয়ে ওঠে যে তাকে ঘরে তালাবন্ধ করে রাখ্‌তে হয়। বিবাহের রাত্রে সে ভালো ছিল কিন্তু রাত-জাগা প্রভৃতি উৎপাতে দ্বিতীয় দিন থেকে তার মাথা একেবারে খারাপ

হয়ে উঠ্‌ল। বিন্দু দুপুরবেলা পিতলের থালায় ভাত খেতে বসেছিল হঠাৎ তার স্বামী থালাসুদ্ধ ভাত টেনে উঠোনে ফেলে দিলে। হঠাৎ কেমন তার মনে হয়েছে, বিন্দু স্বয়ং রাণীরাসমণি; বেহারাটা নিশ্চয় সোনার থালা চুরি করে রাণীকে তার নিজের থালায় ভাত খেতে দিয়েছে। এই তার রাগ। বিন্দু ত ভয়ে মরে গেল। তৃতীয় রাত্রে শাশুড়ি তাকে যখন স্বামীর ঘরে শুতে বল্‌লে বিন্দুর প্রাণ শুকিয়ে গেল। শাশুড়ি তার প্রচণ্ড, রাগলে জ্ঞান থাকে না। সেও পাগল, কিন্তু পূরো নয় বলেই আরো ভয়ানক। বিন্দুকে ঘরে ঢুক্‌তে হল। স্বামী সে রাত্রে ঠাণ্ডা ছিল। কিন্তু ভয়ে বিন্দুর শরীর যেন কাঠ হয়ে গেল। স্বামী যখন ঘুমিয়েছে অনেক রাত্রে সে অনেক কৌশলে পালিয়ে চলে এসেছে তার বিস্তারিত বিবরণ লেখবার দরকার নেই।

ঘৃণায় রাগে আমার সকল শরীর জ্বলতে লাগল। আমি বল্লুম, এমন ফাঁকির বিয়ে বিয়েই নয়। বিন্দু তুই যেমন ছিলি তেমনি আমার কাছে থাক, দেখি তোকে কে নিয়ে যেতে পারে।

তোমরা বল্লে, বিন্দু মিথ্যা কথা বল্‌চে।

আমি বল্লুম, ও কখনো মিথ্যা বলেনি।

তোমরা বল্লে, কেমন করে জান্‌লে ?

আমি বল্লুম, আমি নিশ্চয় জানি।

তোমরা ভয় দেখালে বিন্দুর শ্বশুরবাড়ির লোকে পুলিস্‌-কেস্‌ করলে মুস্কিলে পড়তে হবে।

আমি বল্লুম, ফাঁকি দিয়ে পাগল বরের সঙ্গে ওর বিয়ে দিয়েছে এ কথা কি আদালত শুন্‌বে না ?

তোমরা বল্লে, তবে কি এই নিয়ে আদালত কর্ত্তে হবে নাকি? কেন আমাদের দায় কিসের?

আমি বল্লুম, আমি নিজের গয়না বেচে যা করতে পারি করব।

তোমরা বল্লে, উকীলবাড়ি ছুটবে না কি?

এ কথার জবাব নেই। কপালে করাঘাত করতে পারি, তার বেশি আর কি করব?

ওদিকে বিন্দুর শ্বশুরবাড়ি থেকে ওর ভাসুর এসে বাইরে বিষম গোল বাধিয়েছে। সে বল্‌চে সে থানায় খবর দেবে।

আমার যে কি জোর আছে জানিনে—কিন্তু কশাইয়ের হাত থেকে যে গোরু প্রাণভয়ে পালিয়ে এসে আমার আশ্রয় নিয়েছে তাকে পুলিসের তাড়ায় আবার সেই কশাইয়ের হাতে ফিরিয়ে দিতেই হবে একথা কোনোমতেই আমার মন মানতে পারল না। আমি স্পর্দ্ধা করে বল্লুম, তা দিক্ থানায় খবর!

এই বলে মনে করলুম, বিন্দুকে এইবেলা আমার শোবার ঘরে এনে তাকে নিয়ে ঘরে তালাবন্ধ করে বসে থাকি। খোঁজ করে দেখি, বিন্দু নেই। তোমাদের সঙ্গে আমার বাদ প্রতিবাদ যখন চলছিল তখন বিন্দু আপনি বাইরে গিয়ে তার ভাসুরের কাছে ধরা দিয়েছে। বুঝেছে এ বাড়িতে যদি সে থাকে তবে আমাকে সে বিষম বিপদে ফেল্‌বে।

মাঝখানে পালিয়ে এসে বিন্দু আপন দুঃখ আরো বাড়ালে। তার শাশুড়ির তর্ক এই যে, তার ছেলে ত ওকে খেয়ে ফেল্‌ছিল না। মন্দ স্বামীর দৃষ্টান্ত সংসারে দুর্লভ নয় তাদের সঙ্গে তুলনা করলে তার ছেলে যে সোনার চাঁদ।

আমার বড় জা বল্লেন, ওর পোড়াকপাল, তা নিয়ে দুঃখ করে কি করব ? তা পাগল হোক্ ছাগল হোক্ স্বামী ত বটে।

কুষ্ঠ রোগীকে কোলে করে তার স্ত্রী বেশ্যার বাড়িতে নিজে পৌঁছে দিয়েছে সতী সাধ্বীর সেই দৃষ্টান্ত তোমাদের মনে জাগছিল; জগতের মধ্যে অধমতম কাপুরুষতার এই গল্পটা প্রচার করে আস্‌তে তোমাদের পুরুষের মনে আজ পর্য্যন্ত একটুও সঙ্কোচ বোধ হয়নি, সেইজন্যই মানবজন্ম নিয়েও বিন্দুর ব্যবহারে তোমরা রাগ করতে পেরেছ, তোমাদের মাথা হেঁট হয়নি। বিন্দুর জন্যে আমার বুক ফেটে গেল কিন্তু তোমাদের জন্যে আমার লজ্জার সীমা ছিলনা। আমি ত পাড়াগেঁয়ে মেয়ে, তার উপরে তোমাদের ঘরে পড়েছি, ভগবান কোন্ ফাঁক দিয়ে আমার মধ্যে এমন বুদ্ধি দিলেন ? তোমাদের এই সব ধর্ম্মের কথা আমি যে কিছুতেই সইতে পারলুম না!

আমি নিশ্চয় জানতুম, মরে গেলেও বিন্দু আমাদের ঘরে আর আস্‌বে না। কিন্তু আমি যে তাকে বিয়ের আগের দিন আশা দিয়েছিলুম যে, তাকে শেষ পর্য্যন্ত ত্যাগ করব না। আমার ছোট ভাই শরৎ কলকাতায় কলেজে পড়ছিল; তোমরা জানই ত যত-রকমের ভলণ্টিয়ারি করা, প্লেগের পাড়ার ইঁদুর মারা, দামোদরের বন্যায় ছোটা, এতেই তার এত উৎসাহ যে উপরি উপরি দুবার সে এফ,এ, পরীক্ষায় ফেল করেও কিছুমাত্র দমে যায়নি। তাকে আমি ডেকে বল্লুম, বিন্দুর খবর যাতে আমি পাই তোকে সেই বন্দোবস্ত করে দিতে হবে শরৎ। বিন্দু আমাকে চিঠি লিখতে সাহস করবে না—লিখ্‌লেও আমি পাব না।

এ রকম কাজের চেয়ে যদি তাকে বলতুম বিন্দুকে ডাকাতি

করে আন্‌তে কিম্বা তার পাগল স্বামীর মাথা ভেঙে দিতে তাহলে সে বেশি খুসি হত।

শরতের সঙ্গে আলোচনা করচি এমন সময় তুমি ঘরে এসে বল্লে আবার কি হাঙ্গামা বাধিয়েছ ?

আমি বল্লুম, সেই যা সব গোড়ায় বাধিয়েছিলুম, তোমাদের ঘরে এসেছিলুম,—কিন্তু সে ত তোমাদেরই কীর্ত্তি।

তুমি জিজ্ঞাসা করলে,—"বিন্দুকে আবার এনে কোথাও লুকিয়ে রেখেছ ?"

আমি বল্লুম,—"বিন্দু যদি আস্‌ত তাহলে নিশ্চয় এনে লুকিয়ে রাখতুম। কিন্তু সে আস্‌বে না, তোমাদের ভয় নেই।"

শরৎকে আমার কাছে দেখে তোমার সন্দেহ আরো বেড়ে উঠল। আমি জানতুম শরৎ আমাদের বাড়ি যাতায়াত করে এ তোমরা কিছুতেই পছন্দ করতে না। তোমাদের ভয় ছিল ওর পরে পুলিসের দৃষ্টি আছে—কোন্‌দিন ও কোন্ রাজনৈতিক মাম্‌লায় পড়বে তখন তোমাদের সুদ্ধ জড়িয়ে ফেলবে। সেইজন্যে আমি ওকে ভাইফোঁটা পর্য্যন্ত লোক দিয়ে পাঠিয়ে দিতুম, ঘরে ডাকতুম না।

তোমার কাছে শুন্‌লুম বিন্দু আবার পালিয়েছে তাই তোমাদের বাড়িতে তার ভাসুর খোঁজ করতে এসেছে। শুনে আমার বুকের মধ্যে শেল বিঁধল। হতভাগিনীর যে কি অসহ্য কষ্ট তা বুঝলুম অথচ কিছুই করবার রাস্তা নেই।

শরৎ খবর নিতে ছুটল। সন্ধ্যার সময় ফিরে এসে আমাকে বল্লে, বিন্দু তার খুড়তত ভাইদের বাড়ি গিয়েছিল কিন্তু তারা তুমুল রাগ করে তখনি আবার তাকে শশুড়বাড়ি পৌঁছে দিয়ে গেছে।

এর জন্যে তাদের খেসারৎ এবং গাড়িভাড়া দণ্ড যা ঘটেছে তার ঝাঁজ এখনো তাদের মন থেকে মরেনি।

তোমাদের খুড়িমা শ্রীক্ষেত্রে তীর্থ করতে যাবেন বলে তোমাদের বাড়িতে এসে উঠেছেন। আমি তোমাদের বল্লুম, আমিও যাব।

আমার হঠাৎ এমন ধর্ম্মে মন হয়েছে দেখে তোমরা এত খুসি হয়ে উঠলে যে কিছুমাত্র আপত্তি করলে না। এ কথাও মনে ছিল যে, এখন যদি কলকাতায় থাকি তবে আবার কোন্‌দিন বিন্দুকে নিয়ে ফ্যাসাদ বাধিয়ে বস্‌ব। আমাকে নিয়ে বিষম ল্যাঠা।

বুধবারে আমাদের যাবার দিন, রবিবারে সমস্ত ঠিক হল। আমি শরৎকে ডেকে বল্লুম, যেমন করে হোক্ বিন্দুকে বুধবারে পুরী-যাবার গাড়ীতে তোকে তুলে দিতে হবে।

শরতের মুখ প্রফুল্ল হয়ে উঠল,—সে বল্লে, ভয় নেই দিদি, আমি তাকে গাড়িতে তুলে দিয়ে পুরী পর্য্যন্ত চলে যাব—ফাঁকি দিয়ে জগন্নাথ দেখা হয়ে যাবে।

সেইদিন সন্ধ্যার সময় শরৎ আবার এল। তার মুখ দেখেই আমার বুক দমে গেল। আমি বল্লুম,—"কি শরৎ, সুবিধা হল না বুঝি?"

সে বল্লে,—"না।"

আমি বল্‌লুম,—"রাজি করতে পারলিনে?"

সে বল্লে,—"আর দরকারও নেই। কাল রাত্তিরে সে কাপড়ে আগুন ধরিয়ে আত্মহত্যা করে মরেছে। বাড়ির যে ভাইপোটার সঙ্গে ভাব করে নিয়েছিলুম, তার কাছে খবর পেলুম তোমার নামে সে একটা চিঠি রেখে গিয়েছিল কিন্তু সে চিঠি ওরা নষ্ট করেছে।"

যাক্‌, শান্তি হল।

দেশসুদ্ধ লোক চটে উঠল। বল্‌তে লাগল, মেয়েদের কাপড়ে আগুন লাগিয়ে মরা একটা ফ্যাসান্ হয়েছে।

তোমরা বল্‌লে, এ সমস্ত নাটক করা! তা হবে। কিন্তু নাটকের তামাসাটা কেবল বাঙালী মেয়েদের শাড়ির উপর দিয়েই হয় কেন, আর বাঙালী বীরপুরুষদের কোঁচার উপর দিয়ে হয় না কেন সেটাও ত ভেবে দেখা উচিত।

বিন্দীটার এম্‌নি পোড়াকপাল বটে! যতদিন বেঁচে ছিল রূপে গুণে কোনো যশ পায়নি—মরবার বেলাও যে একটু ভেবে চিন্তে এমন একটা নতুন ধরনে মরবে যাতে দেশের পুরুষরা খুসি হয়ে হাততালি দেবে তাও তার ঘটে এল না! মরেও লোকদের চটিয়ে দিলে!

দিদি ঘরের মধ্যে লুকিয়ে কাঁদলেন। কিন্তু সে কান্নার মধ্যে একটা সান্ত্বনা ছিল। যাই হোক্ না কেন, তবু রক্ষা হয়েছে, মরেছে বইত না; বেঁচে থাকলে কি না হতে পারত!

আমি তীর্থে এসেছি। বিন্দুর আর আসবার দরকার হল না, কিন্তু আমার দরকার ছিল।

দুঃখ বল্‌তে লোকে যা বোঝে তোমাদের সংসারে তা আমার ছিল না। তোমাদের ঘরে খাওয়া-পরা অসচ্ছল নয়; তোমার দাদার চরিত্র যেমন হোক্ তোমার চরিত্রে এমন কোনো দোষ নেই যাতে বিধাতাকে মন্দ বল্‌তে পারি। যদি বা তোমার স্বভাব তোমার দাদার মতই হত তাহলেও হয়ত মোটের উপর আমার এমনি ভাবেই দিন চলে যেত এবং আমার সতীসাধ্বী বড় জায়ের মত পতিদেবতাকে দোষ না দিয়ে বিশ্বদেবতাকেই আমি দোষ দেবার

চেষ্টা করতুম। অতএব তোমাদের নামে আমি কোনো নালিশ উত্থাপন করতে চাইনে—আমার এ চিঠি সেজন্যে নয়।

কিন্তু আমি আর তোমাদের সেই সাতাশ নম্বর মাখন বড়ালের গলিতে ফিরব না। আমি বিন্দুকে দেখেছি। সংসারের মাঝখানে মেয়েমানুষের পরিচয়টা যে কি তা আমি পেয়েছি। আর আমার দরকার নেই।

তারপরে এও দেখেছি ও মেয়ে বটে তবু ভগবান ওকে ত্যাগ করেন নি। ওর উপরে তোমাদের যত জোরই থাক না কেন, সে জোরের অন্ত আছে। ও আপনার হতভাগ্য মানবজন্মের চেয়ে বড়। তোমরাই যে আপন ইচ্ছামত আপন দস্তুর দিয়ে ওর জীবনটাকে চিরকাল পায়ের তলায় চেপে রেখে দেবে তোমাদের পা এত লম্বা নয়! মৃত্যু তোমাদের চেয়ে বড়। সেই মৃত্যুর মধ্যে সে মহান—সেখানে বিন্দু কেবল বাঙালী ঘরের মেয়ে নয়, কেবল খুড়তত ভাইয়ের বোন নয়, কেবল অপরিচিত পাগল স্বামীর প্রবঞ্চিত স্ত্রী নয়। সেখানে সে অনন্ত।

সেই মৃত্যুর বাঁশি এই বালিকার ভাঙা হৃদয়ের ভিতর দিয়ে আমার জীবনের যমুনাপারে যেদিন বাজল সেদিন প্রথমটা আমার বুকের মধ্যে যেন বাণ বিঁধল। বিধাতাকে জিজ্ঞাসা করলুম জগতের মধ্যে যা কিছু সব চেয়ে তুচ্ছ তাই সব চেয়ে কঠিন কেন? এই গলির মধ্যকার চারিদিকে-প্রাচীর-তোলা নিরানন্দের অতি সামান্য বুদ্বুদটা এমন ভয়ঙ্কর বাধা কেন? তোমার বিশ্বজগৎ তার ছয় ঋতুর সুধাপাত্র হাতে করে যেমন করেই ডাক দিক না —একমুহূর্ত্তের জন্যে কেন আমি এই অন্দরমহলটার এইটুকুমাত্র

চৌকাঠ পেরতে পারি নে?—তোমার এমন ভুবনে আমার এমন জীবন নিয়ে কেন ঐ অতি তুচ্ছ ইঁটকাঠের আড়ালটার মধ্যেই আমাকে তিলে তিলে মরতেই হবে। কত তুচ্ছ আমার এই প্রতিদিনের জীবনযাত্রা, কত তুচ্ছ এর সমস্ত বাঁধা নিয়ম, বাঁধা অভ্যাস, বাঁধা বুলি, এর সমস্ত বাঁধা মার—কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত সেই দীনতার নাগপাশবন্ধনেরই হবে জিত,—আর হার হল তোমার নিজের সৃষ্টি ঐ আনন্দলোকের?

কিন্তু মৃত্যুর বাঁশি বাজতে লাগল,—কোথায় রে রাজমিস্ত্রির গড়া দেয়াল, কোথায় রে তোমাদের ঘোরো আইন দিয়ে গড়া কাঁটার বেড়া! কোন্ দুঃখে কোন্ অপমানে মানুষকে বন্দী করে রেখে দিতে পারে! ঐ ত মৃত্যুর হাতে জীবনের জয়পতাকা উড়চে! ওরে মেজ-বৌ, ভয় নেই তোর! তোর মেজ-বৌয়ের খোলষ ছিন্ন হতে এক নিমেষও লাগে না!

তোমাদের গলিকে আর আমি ভয় করিনে। আমার সমুখে আজ নীল সমুদ্র, আমার মাথার উপরে আষাঢ়ের মেঘপুঞ্জ।

তোমাদের অভ্যাসের অন্ধকারে আমাকে ঢেকে রেখে দিয়েছিলে। ক্ষণকালের জন্য বিন্দু এসে সেই আবরণের ছিদ্র দিয়ে আমাকে দেখে নিয়েছিল। সেই মেয়েটাই তার আপনার মৃত্যু দিয়ে আমার আবরণখানা আগাগোড়া ছিন্ন করে দিয়ে গেল। আজ বাইরে এসে দেখি আমার গৌরব রাখবার আর জায়গা নেই। আমার এই অনাদৃত রূপ যাঁর চোখে ভালো লেগেছে, সেই সুন্দর সমস্ত আকাশ দিয়ে আমাকে চেয়ে দেখচেন। এইবার মরেচে মেজ-বৌ!

তুমি ভাবচ আমি মরতে যাচ্চি—ভয় নেই, অমন পুরোণো ঠাট্টা

তোমাদের সঙ্গে আমি করব না। মীরাবাইও ত আমারি মত মেয়েমানুষ ছিল—তার শিকলও ত কম ভারি ছিল না, তাকে ত বাঁচবার জন্যে মরতে হয়নি। মীরাবাই তার গানে বলেছিল, "ছাড়ুক বাপ, ছাড়ুক মা, ছাড়ুক যে যেখানে আছে; মীরা কিন্তু লেগেই রইল, প্রভু, তাতে তার যা হবার তা হোক্!" এই লেগে থাকাই ত বেঁচে থাকা।

আমিও বাঁচব। আমি বাঁচলুম।

তোমাদের চরণতলাশ্রয়চ্ছিন্ন—মৃণাল।

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

পত্র

সম্পাদক-মহাশয়সমীপেষু—

আপনি যে নূতন কাগজ বার করেছেন, তার যদি কোন উদ্দেশ্য থাকে ত সে হচ্ছে, নূতন কথা নূতন ধরণে বলা। এ উদ্দেশ্য সফল করতে হলে, নূতন লেখক চাই,—নচেৎ সবুজপত্র কালক্রমে শ্বেতপত্রে পরিণত হবে।

যদিচ আপনি মুখপত্রে "আমির" পরিবর্ত্তে "আমরা" শব্দ ব্যবহার করেছেন, তথাপি ঐ বহুবচনের পিছনে যে বহু লেখক আছেন, তার কোনও প্রমাণ পাওয়া গেল না। বাঙ্গলায় দ্বিবচন নেই, সম্ভবতঃ সেই কারণেই আপনি প্রথমপুরুষের বহুবচন ব্যবহার করতে বাধ্য হয়েছেন। কারণ অদ্যাবধি কেবলমাত্র দুটি লেখকেরই পরিচয় পাওয়া গেছে—এক সম্পাদক, আর এক শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্রনাথ দত্তকে গুণ্‌তির মধ্যে ধরা গেল না, কেননা আপনারা লেখার যা নমুনা দেখিয়েছেন, তার থেকে স্পষ্টই বোঝা যায় যে আপনার প্রধান ভরসাস্থল হচ্ছে গদ্য। কারণ সোজা কথা বাঁকা করে এবং বাঁকা কথা সোজা করে বলা পদ্যের রীতি নয়।

আর ছিলুম আমি,—কিন্তু আর বেশিদিন যে থাকব কিম্বা থাক্‌তে পারব, এমন আমার ভরসা হয় না। হয় আপনি আমাকে ছাড়বেন, নয়ত আমি আপনাকে ছাড়ব। আমার লেখায়, আর যাই হোক্, সবুজপত্রের যে গৌরব বৃদ্ধি হয়নি, একথা সর্ব্ব-সমালোচক-সম্মত। এ অবস্থায়, "বীরবল" অতঃপর "আবুল-ফজল" হওয়া ব্যতীত উপায়ান্তর

দেখ্‌তে পাচ্ছেন না। ভবিষ্যতে আইন-ই-আঙ্গরেজি নামক যে নব-বিশ্বকোষ রচনা করব—"সবুজপত্রে" তার স্থান হবে না। যদি "ফৈজি" হতে পারতুম, তাহলেও না হয় আপনার কাগজের জন্য একখানি দেশকালোপযোগী অর্থাৎ স্বয়ম্বরা-তিরস্কৃত একখানি "নলদমন" রচনা কর্‌তে পার্‌তুম, কিন্তু সে হবার যো নেই। আমাকে আবুল-ফজল হতেই হবে। আশা করি, বাঙ্গলার নবীন আবুল-ফজলদের মধ্যে কেউ-না-কেউ আমার সঙ্গে পেশা বদ্‌লে নেবেন, কেননা সাহিত্য-রাজ্যে বীরবলেরও আবশ্যকতা আছে। ইংরাজেরা বলেন—এক কোকিলে বসন্ত হয় না—অর্থাৎ আর পাঁচরঙ্গের আর পাঁচটি পাখীও চাই। বাঙ্গলা-সাহিত্যের উদ্যানে যদি বসন্তঋতু এসে থাকে, তাহলে সেখানে কোকিলও থাক্‌বে, কাঠ-ঠোক্‌রাও থাকবে, লক্ষ্মী-পেঁচাও থাকবে, হুতুম-পেঁচাও থাকবে। মনোরাজ্যে যখন নানা পক্ষ আছে তখন নানা পক্ষী থাকাই স্বাভাবিক। যেমন এক "বউ কথাকও" নিয়ে কবিতা হয় না, তেমনি এক "চোখ-গেল" নিয়ে দর্শনও হয় না।

উপরোক্ত ভাবে বাদসাদ দিয়ে শেষে দাঁড়াল এই যে, আপনার কাগজের যা প্রধান প্রয়োজন সেইটিই হচ্ছে তার প্রধান অভাব—অর্থাৎ নূতন লেখক। মনে রাখ্‌বেন যে, এদেশে আজকাল খাঁটি সাহিত্য চল্‌বে না, চল্‌বে যা—তা হচ্ছে জাতীয় সাহিত্য;—যদিচ এ কথার সার্থকতা কি সে সম্বন্ধে কারো স্পষ্ট ধারণা নেই। কোনও লেখা যদি সাহিত্য না হয়, তবুও তার আর মার নেই—যদি তা তথাকথিত জাতীয় হয়। এর কারণ, প্রথমতঃ আমরা বিশেষ্যের চাইতে বিশেষণের অধিক ভক্ত, দ্বিতীয়তঃ আমরা সাহিত্য বিচার করতে পারি

আর না পারি, জাত-বিচার করতে জানি। বলা বাহুল্য যে, দুহাতে কখনো জাতীয় সাহিত্য গড়ে তোলা যায় না। দুহাতে অবশ্য তালি বাজে। আপনারা যদি স্বজাতিকে অহর্নিশি করতালি দিতে প্রস্তুত হতেন, তাহলে আপনাদের হাতে জাতীয় সাহিত্য রচিত হত; কিন্তু সে বিষয়ে আপনাদের যখন তাদৃশ উৎসাহ দেখা যাচ্ছে না, তখন নূতন লেখক চাই।

বাঙ্গলা-লেখ্‌বার লোকের অভাব না থাক্‌লেও, "সবুজপত্রে" লেখ্‌বার লোকের অভাব যে কেন ঘট্‌ছে, তার কারণ নির্ণয় করতে হলে বঙ্গ-সাহিত্যের বর্ত্তমান অবস্থার পর্য্যালোচনা করা আবশ্যক।

বাঙ্গলা সাহিত্যে যে আজ বসন্তকাল উপস্থিত, "সবুজপত্রের" আবির্ভাব তার একমাত্র প্রমাণ নয়। ইতিপূর্ব্বেই স্বদেশী জ্ঞানবৃক্ষের নানা ডালপালা বেরিয়েছে, এবং অন্ততঃ তার একটি শাখায় —অর্থাৎ ইতিহাসের অক্ষয় শাখায়—এমন ফুল ফুটেছে ও ফল ধরেছে যা সমালোচকদের নখদন্তের অধিকার বহির্ভূত; কেননা সে ফুল তামার এবং সে ফল পাথরের।

কিন্তু আপনি পাঠকদের এই ফলাহারে নিমন্ত্রণ করেননি। আপনি সবুজপত্রে যে ফল পরিবেষণ করতে চান্, সে জ্ঞানবৃক্ষের ফল নয়, কিন্তু তার চাইতে ঢের বেশি মুখরোচক সংসারবিষবৃক্ষের সেই ফল, যা আমাদের পূর্ব্বপুরুষেরা অমৃতোপম মনে করতেন। সেই জাতীয় লেখকেরা হচ্ছেন আপনার মনোমত, যাঁরা কিছুই আবিষ্কার করেন না কিন্তু সবই উদ্ভাবনা করেন,—যাঁরা বস্তুজগৎকে বিজ্ঞানের হাতে সমর্পণ করে মনোজগতের উপাদান নিয়ে সাহিত্য গড়েন।

আমাদের সাহিত্যসমাজে কবি দার্শনিকের ভিড়ের ভিতর

বৈজ্ঞানিকদেরই খুঁজে পাওয়া ভার, অতএব আপনার স্বজাতীয় সাহিত্যিকের অভাব এদেশে মোটেই নেই। তাহলেও তাঁরা যে উপযাচী হয়ে এসে আপনাদের দলে ভিড়বেন, তার সম্ভাবনা কম,—কেননা, যাতে করে দল বাঁধে, সেরকম কোনও মতের সন্ধান আপনাদের লেখায় পাওয়া যায় না।

সকল দেশেই মনেরও একটা চল্‌তি পথ আছে। অভ্যাসবশতঃ এবং সংস্কারবশতঃ দলে দলে লোক সেই পথ-ধরেই চল্‌তে ভালবাসে, কারণ মুখ্যতঃ সে পথ হচ্ছে জনসাধারণের জীবনযাত্রার পথ। সে পথ মহাজনদের হাতে রচিত হয়নি, কিন্তু লোকসমাজের পায়ে গঠিত হয়েছে। আপনারা বঙ্গ-সরস্বতীকে সেই পরিচিত পথ ছেড়ে একটি নূতন এবং কাঁচা রাস্তায় চালাতে চান। আপনারা বলেন—"সমুখে চল"; কিন্তু বুদ্ধিমানরা বলেন—"নগণস্যাগ্রতোগচ্ছেৎ!" আপনাদের মত এই যে, সামাজিক জীবনের পদানুসরণ করা কবি কিম্বা দার্শনিকের মনের কাজ নয়। জীবনকে পথ দেখানই হচ্ছে সে মনের ধর্ম্ম, অতএব কর্ত্তব্য। সুতরাং আপনাদের দ্বারা উদ্ভাবিত, অপরিচিত এবং অপরীক্ষিত চিন্তামার্গে অগ্রসর হতে অনেকেই অস্বীকৃত হবেন। বিশেষতঃ যখন সে পথের একটা নির্দ্দিষ্ট গন্তব্য স্থান নেই—যদি বা থাকে ত সে অলকা বর্ত্তমান-ভারতের পরপারে অবস্থিত। শুন্‌তে পাই, ইউরোপের সকল স্থল-পথই রোমে যায়। তেমনি এদেশের সকল হাঁটা-পথই কাশী যায়। কিন্তু আপনারা যখন বাঙ্গালীর মনকে কাশীযাত্রা না করিয়ে সমুদ্রযাত্রা করাতে চান, তখন যে নূতন লেখকেরা সবুজপত্র নিয়ে আপনাদের সঙ্গে এক-পংক্তিতে বসে যাবেন, এরূপ আশা করা বৃথা। সুতরাং আপনাদের সেই শ্রেণীর

লেখক সংগ্রহ করতে হবে যাঁদের কাছে আপনাদের সাহিত্য অচল নয়। এ দলের বহুলোক আপনার হাতের গোড়াতেই আছে।

গত বৈশাখ মাসের "ভারতী" পত্রিকাতে আপনি বিলেত-ফেরৎ বলে নিজের পরিচয় দিয়েছেন। প্রাচীন ব্রাহ্মণ-সমাজে এ সম্প্রদায়ের স্থান নেই—সুতরাং নূতন ব্রাহ্মণ-সমাজ অর্থাৎ সাহিত্য সমাজে এঁদের তুলে নেওয়া হচ্ছে আপনার পক্ষে কর্ত্তব্য। অতীতের উদ্ধারের পাল্টা-জবাব দিতে হলে, পতিতের উদ্ধার করা আবশ্যক।

বিলেত-ফেরতদের লেখায় আর কিছু থাক আর না থাক্—নূতনত্ব থাক্‌বেই। ৺ মাইকেল দত্ত, শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর এবং ৺ দ্বিজেন্দ্রলাল রায় এই তিনটি বিলেত-ফেরৎ কবির ভাষায় ও ভাবে এতটা অপূর্ব্বতা ছিল যে, আদিতে তার জন্য এঁদের দুজনকে পুরাতনের কাছে অনেক ঠাট্টাবিদ্রূপ সহ্য করতে হয়েছিল। ৺ দ্বিজেন্দ্র লাল রায়কে যে কেউ ঠাট্টা করেন নি তার কারণ, তিনি সকলকে ঠাট্টা করেছেন। এই থেকেই প্রমাণ পাওয়া যায় যে, বিলেত-ফেরতের হাতে পড়লে বঙ্গ-সাহিত্যের চেহারা ফিরে যায়।

আসল. কথা, এ যুগের বঙ্গ-সাহিত্য হচ্ছে বিলেতি ঢংয়ের সাহিত্য। যে হিসেবে দাশরথি রায়ের পাঁচালি ও গোবিন্দ অধিকারীর যাত্রা খাঁটি বাঙ্গলা-সাহিত্য—সে হিসেবে নব-সাহিত্য খাঁটি বঙ্গ-সাহিত্য নয়। এর জন্যে কেউ কেউ দুঃখও করেন। চোখের জল ফেলবার কোনও সুযোগ বাঙ্গালী ছাড়ে না। ব্যাস-বাল্মিকীর জন্যও আমরা যেমন কাঁদি, পাঁচালিওয়ালাদের জন্যও আমরা তেমনি কাঁদি। কিন্তু সমালোচকেরা চক্ষের জলে বক্ষ ভাসিয়ে দিলেও, বঙ্গ-সরস্বতী আর গোবিন্দ অধিকারীর অধিকার ভুক্ত হবেন না, এবং দাশরথিকেও সারথি কর্‌বেন না।

আমাদের নব-সরস্বতী বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রতিষ্ঠিতা এবং কলেজে শিক্ষিত লোকেরাই অদ্যাবধি তাঁর সেবা করে আস্‌ছেন এবং ভবিষ্যতেও কর্‌বেন—কেউ ফোঁটা কেটে, কেউ হ্যাট পরে। এই প্রভেদের কারণ নির্দ্দেশ করছি। পুরাকালে যখন ক্ষত্রিয়েরা একসঙ্গে সুরা এবং সোম পান্ কর্‌তেন, তখন ব্রাহ্মণেরা এই শান্তি-বচন পাঠ করতেন

—"অহে সুরা ও সোম, তোমাদের জন্য দেবগণ পৃথক্ পৃথক্ রূপে স্থান কল্পনা করিয়াছেন। তুমি তেজস্বিনী সুরা, আর ইনি রাজা সোম, তোমরা আপন আপন স্থানে প্রবেশ কর।"

আমরাও কলেজে যুগপৎ ইংরাজি সুরা এবং সংস্কৃত সোম পান করেছি। দুর্ভাগ্যক্রমে আমাদের দুটি পাকস্থলী না থাকায়, সেই সুরা আর সোম আমাদের উদরস্থ হয়ে পরস্পর লড়াই কর্‌ছে। আমাদের সাহিত্য সেই কলহে মুখরিত হয়ে উঠেছে। আমাদের যে নেশা ধরেছে, সে মিশ্র-নেশা। তবে কোথাও বা তাতে সুরার তেজ বেশি, কোথাও বা সোমের। মনোজগতে যে আমরা সকলেই বিলেত ফেরৎ, এই কথাটা মনে রাখলে, সাহিত্য-মন্দিরে আপনার সম্প্রদায়কে প্রবেশ করতে সাহিত্যের পাণ্ডারা আর বাধা দেবেন না, বরং উৎসাহই দেবেন; কেননা আমরা সকলেই ইংরাজি-সাহিত্যে শিক্ষিত, আপনারা উপরন্তু ইংরাজি-সভ্যতায় দীক্ষিত।

সামাজিক হিসেবে বিলেত-ফেরতদের এই গুরুগৃহ-বাসের ফল যাই হোক, সাহিত্য-হিসেবে এর ফল ভাল হবারই সম্ভাবনা। কারণ ইংরাজি-জীবনের সঙ্গে ইংরাজি-সাহিত্যের সম্বন্ধ অতি ঘনিষ্ঠ। ইংরাজি-জীবনের সঙ্গে যাঁর সাক্ষাৎ-পরিচয় আছে, তিনি জানেন যে ইউরোপে সাহিত্য হচ্ছে জীবনের প্রকাশ ও প্রতিবাদ—আর সে

পরিচয় যাঁর নেই, তিনি ভাবেন যে, ও শুধু বাদানুবাদ। সাহিত্যের ভাষ্য ও টীকা জীবনসূত্র হতে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়লে তা শুধু কথার কথা হয়ে ওঠে। সেই কারণে নব-শিক্ষিত-সম্প্রদায়ের জীবনে ইংরাজি-জীবনের প্রভাব যে পরিমাণে কম, তাঁদের রচিত সাহিত্যে ইংরাজি কথার প্রভাব তত বেশি। এর প্রকৃষ্ট প্রমাণ আমাদের স্বদেশী বক্তৃতায় ও লেখায় নিত্য পাওয়া যায়। সংস্কৃত ভাষার ছদ্মবেশ পরিয়েও বিলেতি মনোভাবকে আমরা গোপন করে রাখতে পারিনে। বিদেশী ভাবকে আমি অবশ্য মন থেকে বহিষ্কৃত করে দেবার প্রস্তাব করছি নে,—কারণ যে সকল ভাব সাত সমুদ্র তের-নদীর পার থেকে উড়ে এসে আমাদের মনোজগতে জুড়ে বসেছে, তাদের বেবাক্ উপ্‌ড়ে ফেলাও সম্ভব নয়, এবং সম্ভব হলেও তাতে মন উজাড় হয়ে যাবে। তবে যা জালে ওঠে তাই যেমন মাছ নয়—তেমনি যা ভুঁই ফুঁড়ে ওঠে তাই গাছ নয়। বিলেতিজীবনে বিলেতিসাহিত্য যাচাই করে নিতে না পার্‌লে, এই বিদেশী ভাবের জঙ্গলের মধ্যে থেকে সাহিত্যের উদ্যান গড়ে তুলতে পারব না। এই পরখ কর্‌বার কাজটি সম্ভবতঃ বিলেত-ফেরতেরাই ভাল পার্‌বেন।

তবে সাহিত্য-সমাজে প্রবেশ কর্‌তে এঁরা সহজে স্বীকৃত হবেন না। লিখ্‌তে অনুরোধ কর্‌বামাত্র এঁরা উত্তর কর্‌বেন যে, "আমরা বাঙ্গলা লিখ্‌তে জানিনে।" কিন্তু ও কথা শুনে পিছ-পাও হলে চল্‌বে না। সেকেলে বিলেত-ফেরতেরা বল্‌তেন যে তাঁরা বাঙ্গলা বল্‌তে পারেন না। অথচ সে বিনয় কিম্বা সে স্পর্দ্ধা যে সত্য নয়, তার প্রমাণ আজ বিলেত-ফেরতের মুখে মুখে পাওয়া যায়। হতে পারে যে, বাংলা লিখ্‌তে পারিনে একথা বলায় প্রমাণ হয় যে, বক্তা ইংরাজি লিখ্‌তে পারেন।

অথচ এ বিষয়ে কোনও সন্দেহ নেই যে, যে-লেখা সাহিত্য বলে গণ্য হতে পারে, সে-ইংরাজি কোন দেশী লোক লিখ্‌তে পারেন না। যাঁরা আদালতে এবং সভাসমিতিতে ইংরাজি ভাষায় ওকালতি এবং "কলাবতী" করেন, তাঁরা যে ও-ভাষায় শুধু পড়া-মুখস্থ দেন তা শ্রোতামাত্রেই বুঝতে পারে। আমরা আইন-সম্বন্ধে এবং রাজনীতি-সম্বন্ধে ইংরাজ-রাজপুরুষের কাছে নিত্য পরীক্ষা দিতে বাধ্য, সুতরাং ও দুই ক্ষেত্রে মুখস্থ-বিদ্যা যার যত বেশি, সে তত বড় বড় প্রাইজ পায়; কিন্তু তার থেকে এ প্রমাণ হয় না যে, ঐ প্রাইজের দৌলতে তাঁরা ইংরাজি সাহিত্য-সমাজে প্রোমোসন্‌ পান। সুতরাং সাহিত্য বস্তু যে কি, তা যিনি জানেন, তাঁকে ইংরেজি ত্যাগ করে বাঙ্গলা লেখাতে প্রবৃত্ত কর্‌তে কিঞ্চিৎ সাধ্য-সাধনার আবশ্যক হবে। বিলেতি বুট ত্যাগ কর্‌লে বঙ্গসন্তান যে স্বদেশের সাহিত্যক্ষেত্রে স্বচ্ছন্দে বিচরণ কর্‌তে পারেন সে বিষয়ে আমার সন্দেহ নেই—তবে বুট ছেড়ে যদি পণ্ডিতি খড়ম পরে বেড়াতে হয় তাহলে অবশ্য তা আরও বিপদের কথা হবে। কিন্তু বঙ্গ-সরস্বতীর মন্দিরে খোলা পায়ে প্রবেশ করাটাই যে কর্ত্তব্য এবং শোভন, সুশিক্ষিত ব্যক্তিমাত্রেরই সেটি বোঝা উচিত। অবশ্য পণ্ডিতি-খড়মের প্রধান গুণ এই যে, তা যত বেশি খট্‌খটায়মান হবে, লোকে তত বেশি "সাধু সাধু" বল্‌বে। কিন্তু এটি মনে রাখা উচিত যে, আশৈশব ও-বস্তুর ব্যবহারে অভ্যস্ত না হলে, খড়মধারীদের পদে পদে হোঁচট খাওয়া অনিবার্য্য।

বিলেত-ফেরতকে লেখক তৈরি করার প্রধান বাধা হচ্ছে যে, তাঁরা অধিকাংশই আইন-ব্যবসায়ী। উকিল ও কোকিল হচ্ছে বিভিন্ন শ্রেণীর জীব—যদিচ উভয়েই বাচাল। এর একক দিয়ে অপরের

কাজ করানো যায় না। তবে কথা হচ্ছে এই যে, যে লঙ্কায় যায় সেই যেমন রাক্ষস হয়ে ওঠে, তেমনি যে আদালতে যায় সেই যে রাসবিহারী হয়, তা নয়। সকলেই জানেন যে, এ দেশের কত বিদ্যাবুদ্ধি আদালতের মাঠে মারা যাচ্ছে। তার কারণ ও শুষ্ক এবং কঠিন ক্ষেত্রের রস আত্মসাৎ করা দূরে থাকুক, অনেকের মন তাতে শিকড়ও গাড়্‌তে পারে না। এ অবস্থায় যে অনেকে আদালতের মাটি-কামড়ে পড়ে থাকেন তার কারণ, ও স্থান ত্যাগ করলে হাঁসপাতালে যাওয়া ছাড়া এদেশে স্বাধীন ব্যবসায়ীর আর গত্যন্তর নেই। তাই নিত্যই দেখ্‌তে পাওয়া যায় বহু বিদ্বান ও বুদ্ধিমান লোক, এক ফোঁটা জল না খেয়ে, দিনের পর দিন, ন্যুব্জশিরে কুব্জপৃষ্ঠে অগাধ আইনের পুস্তকের ভার বহন করে আদালতে ঘুরে বেড়াচ্ছেন। সে গুরুভারে পৃষ্ঠদণ্ড ভঙ্গ হলেও যে তাঁরা পৃষ্ঠ-ভঙ্গ দেন না, তার আর একটি কারণ এই যে, এই মরুভূমিতে তাঁরা নিত্য রজতমায়ার মরীচিকা দেখেন। সুতরাং এই আইনের দেশ একবারে ত্যাগ কর্‌তে কেউ রাজি হবেন না; তবে মধ্যে মধ্যে সবুজপত্রের ওয়েসিসে এসে বিশ্রামলাভ কর্‌তে এঁদের আপত্তি নাও হতে পারে। আপনি শুধু এইটুকু সতর্ক থাকবেন যে, এমন লোক আপনার বেছে নেওয়া চাই যার মন ইংরাজের আইনের নজিরবন্দী হয়নি।

আমার শেষ কথা এই যে, যেন তেন প্রকারেণ আপনার নিজের দলের লোককে,—আর কোনও কারণে না হোক, আত্মরক্ষার জন্যও —আপনাকে লেখক তৈরি করে নিতে হবে—কারণ তাঁরা যদি লেখক না হন, তাহলে তাঁরা সব সমালোচক হয়ে উঠবেন। ইতি

বীরবল।

উপমা ও অনুপ্রাস

ভাব-পদার্থকে পরিস্ফুটরূপে প্রকাশ করিবার জন্য কবিগণ উপমা প্রয়োগ করিয়া থাকেন। এ বিষয়ে যাঁহার ঐশ্বর্য্য যত বেশি, কবি-সমাজে তিনি যে তত উচ্চ আসন অধিকার করেন, এ সম্বন্ধে দ্বিমত নাই। কিন্তু অনুপ্রাসের সার্থকতাসম্বন্ধে সকলে একমত নহেন। কাহারও কাহারও মতে এই শব্দালঙ্কারের ব্যবহারে ভাবের মূর্ত্তি ঢাকা পড়ে।

এ কথা অবশ্য মনে করা ভুল যে, কাব্যে অনুপ্রাসের কোনও স্থান নাই। রূপের সাদৃশ্য হইতে যেমন উপমা জন্মলাভ করিয়াছে, তেমনি শব্দের সাদৃশ্য হইতে অনুপ্রাস জন্মলাভ করিয়াছে। রসায়নে আণবিক আকর্ষণের বলে, যেমন অণুর সঙ্গে অণু মিলিত হয় তেমনি একটি বিশেষ হৃদয়াবেগের প্রকাশের তাড়নায় বিশেষ বিশেষ শব্দ তাহার জুড়িকে খুঁজিয়া লয়। এই যে শব্দের সহিত শব্দের সহজ সঙ্গতি, ইহার মূলেও শব্দ-রাজ্যের কোনো গূঢ় রাসায়নিক আকর্ষণ বিদ্যমান। পাতায় পাতায় লাগিয়া যেমন মর্ম্মরধ্বনি উঠে, তরঙ্গে তরঙ্গে অভিহত হইয়া যেমন কলগান জাগে, সেইরূপ কথা যখন তাহার জুড়ির সহিত মিলিত হয়, তখন সেই মিলনের ফলে এক অপূর্ব্ব সঙ্গীত কাব্যে হিল্লোলিত হইয়া উঠে।

দৃষ্টান্তস্বরূপ রবীন্দ্রনাথের "ক্ষণিকা"র একটি কবিতার তিনটি ছত্র উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি—

কাছে এলে যবে হেরি অভিনব
ঘোর ঘননীল গুণ্ঠন তব
চলচপলার চকিতচমকে করিছে চরণ বিচরণ।

এটি বোধ হয় কোনো বর্ষার কবিতা হইবে। শেষ-ছত্রটিতে যে অনুপ্রাসের লীলা আছে বিদ্যুতের নৃত্যলীলার সঙ্গে তাহার সাদৃশ্য স্পষ্ট।

কিন্তু সাহিত্যে যখন ভাবের দৈন্য ঘটে, তখন বলিবার-ভঙ্গী বলিবার-বিষয়কে অতিক্রম করে। যেখানে রসের অভাব আছে, সেখানে কবিরা রচনার চাতুর্য্যের দ্বারা সেই আন্তরিক শুষ্কতা গোপন করিবার প্রয়াস পান। শ্রোতাদের মুগ্ধ করিবার জন্য তখন তাঁহারা অপূর্ব্ব উপমা এবং নিরবচ্ছিন্ন অনুপ্রাসের সাহায্য গ্রহণ করিতে বাধ্য হন।

উপমা ভাবানুসারী না হইলে তাহা যে কতদূর পর্য্যন্ত কৃত্রিম হইতে পারে, তাহার উদাহরণ সংস্কৃত-কাব্যেও বিরল নহে। সংস্কৃত-কাব্যের জোয়ারের মুখে যে উপমাগুলি শুভ্রফেণকিরীটের মত ভাবের তরঙ্গের চূড়ায় চূড়ায় ঝলমল করিয়াছে, ভাঁটার সময়ে সেই উপমা-গুলিই ক্রমে অধোগতি প্রাপ্ত হইয়া ভাবের মরা-স্রোতকে পঙ্কিল করিয়া তুলিয়াছে।

এইরূপ কষ্টকল্পিত এবং অসঙ্গত উপমার দুএকটি নমুনা উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি—

"ভ্রূরেখাযুগলং ভাতি তস্যাশ্চটুলচক্ষুষঃ।
পত্রদ্বয়ীব হরিতা নাসাবংশবিনির্গতা॥"

অর্থাৎ, চঞ্চলনয়না সেই রমণীর ভ্রূদুটি, নাসারূপ বংশের হরিৎবর্ণ দুটি পত্রের ন্যায় শোভা পাইতেছে।

অপর একটি শ্লোক ইহা অপেক্ষাও অদ্ভুত। সেটি এই—

"বেণী শ্যামা ভুজঙ্গীয়ং নিতম্বাম্মস্তকং গতা।
বক্ত্রচন্দ্রসুধাং লেঢ়ুং সান্দ্রসিন্দুরজিহ্বয়া॥"

অর্থাৎ, অতি গাঢ় সিন্দূররূপ জিহ্বাদ্বারা মুখচন্দ্রের সুধাপান করিবার জন্যই যেন কালো ভুজঙ্গীর মত বেণীটা নিতম্বদেশ হইতে মস্তকে আরোহণ করিতেছে।

উপমার উপর জোরজবরদস্তি করিলে তাহা যে কতদূর অস্বাভাবিক হইয়া উঠে, তাহার উদাহরণ যেমন সংস্কৃত কাব্য-সাহিত্য হইতে দেখানো গেল, তেমনি অনুপ্রাস যখন শব্দের উপর শব্দ চাপাইয়া ভাবের প্রাণ বাহির করিয়া দিবার আয়োজন করে, তখন তাহার উপদ্রব যে কতদূর বিরক্তিকর হয়, তাহার প্রমাণ প্রাচীন বাংলা-সাহিত্য হইতে সংগ্রহ করা কঠিন নয়।

প্রাচীন বাংলা-সাহিত্যের ভাঁটার সময় এই অনুপ্রাসের ঘটা বাঙালী কবিদের পক্ষে শ্রোতার মনোরঞ্জনের প্রধান সম্বল হইয়া উঠিয়াছিল। অনুপ্রাসের ভেল্কিবাজি যে-কবি যত দেখাইতে পারিত, শ্রোতাদের চমৎকৃত করিবার সম্ভাবনা তাহার পক্ষে তত বাড়িয়া যাইত। বলা বাহুল্য, দাশরথি রায়ের পাঁচালি এ বিষয়ে স্বনামধন্য হইয়াছে। দীনেশবাবুকর্তৃক আবিষ্কৃত কৃষ্ণকমল গোস্বামী নামক জনৈক উনবিংশ শতাব্দীর বাঙালী কবির কবিতা হইতে অনুপ্রাসের একটি উদাহরণ নিম্নে উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি—

"বিদ্যুতলজ্জিতকৃত যে রূপসী
সে রূপচ্ছেদক বিচ্ছিন্নরূপ অসি,

মরি! কি দারুণ অসি, পশি কৈল মসী,
শশিরাশি-জিত যে শশী,—
হ'ল সে শশী অসিত চতুর্দ্দশীর প্রায়॥”

অনুপ্রাস যে কতটা প্রলাপের মত হইয়া উঠিতে পারে, পূর্ব্বোক্ত উদাহরণই তাহার প্রকৃষ্ট প্রমাণ।

এই যুগসঞ্চিত কৃত্রিম উপমার আবর্জ্জনা ও কৃত্রিম অনুপ্রাসের জঞ্জাল সাহিত্যক্ষেত্র হইতে দূর করিবার জন্য কোনো কোনো আধুনিক কবি এতই উৎসুক হইয়াছিলেন যে, কাব্যকে একেবারে নিরাভরণ করা তাঁহারা অত্যাবশ্যক মনে করিতেন। ইঁহাদের মতে অলঙ্কারের অন্তরালে ভাবের সৌন্দর্য্য চাপা পড়িয়া যায়, সুতরাং মনোভাবকে যত সজ্জামুক্ত করিতে পারিবে ততই তাহার রূপ ব্যক্ত হইয়া উঠিবে। প্রসিদ্ধ ইংরাজ-কবি ওয়ার্ডস্ওয়ার্থ পূর্ব্বোক্ত মতাবলম্বী; তাই তিনি উপমা-প্রয়োগসম্বন্ধে নিতান্ত কৃপণ ছিলেন। যদি কখনো তাঁহার কলমের মুখ দিয়া কোনও উপমা বাহির হইয়া পড়ে তবে তাহা “Phantom of delight”-গোছের,—অর্থাৎ একেবারে রূপ-রস-গন্ধ-স্পর্শ-শব্দ-বর্জ্জিত।

উপমা ও অনুপ্রাসের প্রতি মনস্বী লেখকদের এতটা বীতরাগ হইবার কারণ, উহা মন্দকবির হাতে সহজেই বিকৃত হইয়া পড়ে। যাহারা উপমাকে কাব্যদেহে অর্পিত বাহ্য অলঙ্কারস্বরূপ মনে করে, তাহাদের লক্ষ্য যে তাহার বাহুল্য ও গঠন-চাতুর্য্যের দিকেই থাকিবে, তাহাতে আর আশ্চর্য্য কি? এক-শ্রেণীর কবিরা উপমাকে গহনা হিসাবে ব্যবহার করিয়াছিলেন বলিয়া, অপর শ্রেণীর কবিরা সে গহনা খুলিয়া ফেলিবার জন্য ব্যস্ত হইয়াছিলেন।

কিন্তু আমরা এখন এই সত্য আবিষ্কার করিয়াছি যে, উপমা

ফরমায়েস দিয়া তৈরি করাইবার জিনিষ নয়;—কেননা, তাহা কাব্য-দেহের অলঙ্কার নয়, কিন্তু কাব্যের প্রাণস্বরূপ। কেন আমরা এরূপ মনে করি, তাহা একটু বুঝাইয়া বলিতে চাই।

এ জীবনে বস্তুমাত্রেরই সহিত আমাদের দ্বিবিধ কারবার—এক শরীরের, আর এক মনের। আকাশ, বাতাস, জল, অগ্নি প্রভৃতি সকল জিনিস আমাদের চিন্তার সহিত, অনুভূতির সহিত, নানা প্রকারে জড়িত গ্রথিত হইয়া যায় বলিয়া, অনির্ব্বচনীয় ভাব ক্রমাগতই তাহাদের সাহায্যে বচনীয় হইতেছে। সেইজন্য কোনো কথা বলিতে গেলে, উপমা দিতে পারিলেই মনে হয় কথাটাকে যেন রূপ দেওয়া গেল,—এতক্ষণ পর্য্যন্ত যে কথাটা মনের আকাশে বাষ্পের মত অত্যন্ত অনির্দ্দিষ্টভাবে অবস্থিত ছিল, এইবার যেন তাহাকে একটি সংহত সুন্দর স্পষ্ট আকার দেওয়া গেল। শুধু তাই নয়, ভাল উপমা মুখ হইতে বাহির হইবামাত্র মনে হয় যেন আমার কথার সায় সমস্ত বিশ্বব্রহ্মাণ্ড জুড়িয়া পাওয়া যায়। আমি যে ভাবনা ভাবিতেছি, সেই ভাবনা যেন নানা আকারে, নানা আভাসে, নানা ইঙ্গিতে, নানা ভঙ্গীতে সমস্ত বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে ব্যাপ্ত হইয়া আছে।

এক বস্তুর সহিত অপর বস্তুর, এক ভাবের সহিত অপর ভাবের যোগসাধন করাই উপমার কার্য্য। কেবল তাহাই নহে, কবিরা নির্ভয়ে বস্তুর ধর্ম্ম মনেতে, এবং মনের ধর্ম্ম বস্তুতে আরোপ করেন। "ভাব হতে রূপে অবিরাম যাওয়া আসা"—এই উপমার সেতুর সাহায্যেই সাধিত হয়। উপমা রূপ হইতে ভাবে ক্রমাগতই যাতায়াত করিতেছে। যে বাধা বিজ্ঞানের কাছে, দর্শনের

কাছে দুর্লঙ্ঘ্য বাধা—হিমালয়ের পর্ব্বত-প্রাচীরের অপেক্ষাও দুর্লঙ্ঘ্য —তাহা উপমার কাছে মস্‌লিনের তিরস্করণীর মতও নয়।

বিজ্ঞান একসময়ে মানব-মনের এই সহজ প্রবৃত্তির বিরোধী ছিল, এবং তাহার স্বচ্ছন্দ গতিতে বাধা দিতে চেষ্টা করিয়াছিল; কারণ বৈজ্ঞানিক মতে বিশেষ-বস্তুর বিশেষ-জ্ঞানের অভাববশতই কবি-কল্পনা, যাহা বস্তুত পৃথক তাহার ঐক্য-সাধন করিতে বৃথা চেষ্টা করিত। কিন্তু এ যুগের বিজ্ঞান আমাদিগকে বলিয়া দিয়াছে যে, পৃথিবীতে ক্রমাগতই এক হইতে আরে, রূপ হইতে রূপান্তরে প্রাণের ও শক্তির যাত্রা চলিয়াছে। জীবজগতে অভিব্যক্তিবাদ ও বস্তুজগতে নব-আণবিক-সিদ্ধান্ত আমাদিগকে এই কথাই জানাইয়াছে যে, বিশ্ব প্রতিমুহূর্ত্তেই রূপান্তরিত হইতেছে, এখানে কিছুই স্থির হইয়া বসিয়া নাই। জীবজগতে প্রাণের রূপও স্থির নহে, জড়জগতে অণুর রূপও স্থির নহে।

যখন এই কথা চিন্তা করি যে, সৌরজগতের সেই অবিভক্ত অসংহত বাষ্পপিণ্ডের ঘূর্ণি, তৎপরে সংহত পৃথিবীগ্রহের মহাসমুদ্রের উন্মত্ত আলোড়ন, সমুদ্রগর্ভ হইতে উত্তপ্ত পর্ব্বতোচ্ছ্বাস, জীবপঙ্কের আবির্ভাব, খাদ্যরসের রক্তে পরিণতি ও জীবের প্রজনন-শক্তি, এবং ক্রমে বিচিত্র জীবদেহের অভিব্যক্তি,—এই সমস্ত যুগযুগান্তরের ক্রিয়াগুলি এই শরীরের অণুপরমাণুর মধ্যে মগ্ন-চেতনার অন্ধকার-রাজ্যে কত অস্পষ্ট সংস্কাররূপে বিদ্যমান রহিয়াছে, তখনি বুঝিতে পারি বিশ্বের সর্ব্বত্র আমার মন কেন উপমার জাল ফেলিয়াছে।

বিজ্ঞানের অভ্যুদয়কালে কিন্তু ইহার উল্টা কথাটাই লোকের

মনে হইয়াছিল। মনে হইয়াছিল বুঝি কবির অনুভূতির মধ্যে কোনো সত্যই নাই। কাব্যও হঠাৎ তাহার উপমার প্রদীপ ছুঁড়িয়া ফেলিয়া দিবার জন্য ব্যগ্র হইয়া উঠিল। বিজ্ঞানের সাহায্যে সে বাস্তবকে যে ভাবে দেখিতে শিখিল, তাহাতে বুঝিল যে উপমা সত্যের শুভ্রজ্যোতিকে শুধু মলিন করে। বিজ্ঞান আজ আবার ইন্দ্রিয়গোচর বিশ্বের চতুর্দ্দিকে অতীন্দ্রিয় লোকের কত দ্বার বাতায়ন উন্মুক্ত করিয়া দিতেছে। সত্য যে স্থির পদার্থ নয়, তাহা যে উপমার নিদান,—রূপ হইতে রূপান্তরের মধ্য দিয়াই যে তাহার পরিচয় পূর্ণতর হইতেছে, এই জ্ঞানের প্রভাব আজ সাহিত্য-রাজ্যেও লক্ষিত হইতেছে। সত্যকে মানুষ একদিন স্থির জানিয়াছিল; এখন সে দেখে যে যাহা স্থির তাহাই মৃত্যু, অর্থাৎ সৃষ্টির বহির্ভূত, এবং এই সত্যের ব্যক্তি উপমায়। কারণ উপমা তো সত্যকে বাঁধে না;—সে কেবলি বলে, এই রকম, এই রকম। অনির্ব্বচনীয়কে সে কেবলি বচনগম্য করে, অনন্তকে সান্তরূপে প্রকাশ করে;—কিন্তু সে বচন, সে রূপ যে স্থায়ী নয়, তাহাও সে নিজেই জানে।

ঐন্দ্রিয় হইতে অতীন্দ্রিয় লোকে যাত্রা করিবার পূর্ব্বে সাহিত্যের মধ্যেও অধুনা একটা অস্বাভাবিক উত্তেজনার লক্ষণ দেখা দিয়াছে। এ জগতে কোনও নূতন সত্যের আবির্ভাবের সহিত যে আনন্দ ও যে ভয় জড়িত থাকে, তাহাকে একজন আধুনিক লেখক cosmic nervousness—বিশ্বের বেপথু বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন। এই কারণেই ঐন্দ্রিয় হইতে অতীন্দ্রিয়লোকে যাত্রার মুখে আধুনিক সাহিত্যে একটি অস্বাভাবিক উত্তেজনার লক্ষণ দেখা

দিয়াছে। খ্যাতনামা ইংরাজলেখক এচ্, জি, ওয়েল্স্ বলিয়াছেন, "মানুষ সংকীর্ণ দিক্‌চক্রবালের দ্বারা সীমাবদ্ধ জগৎ হইতে আজ অনন্ত দৃশ্যময় ও ঘটনাময় এক বিশাল জগতে যাত্রা করিতেছে—সেখানকার অস্পষ্টতা ও অন্ধকার তাহার নিকট কি ভয়াবহ!" বিশ্ব যে অসীমের বিচিত্র কাব্য, এই কথাটার আভাসমাত্রে মানুষকে এমনি বিহ্বল করিয়াছে যে, যতক্ষণ পর্য্যন্ত মানুষ সেই অস্পষ্ট অন্ধকারলোকের পথঘাট আবিষ্কার না করিবে, ততক্ষণ পর্য্যন্ত যে সাহিত্য রচিত হইবে, তাহার মধ্যে একটি অস্থির ত্রস্ত ভাব পদে পদেই লক্ষিত হইবে।

আধুনিক ইউরোপীয় সাহিত্যে এই অশান্ত উত্তেজিত ভাবের লক্ষণই বেশি করিয়া চোখে পড়ে। টমাস হার্ডি হইতে জন্ গ্যাল্স্‌ওয়ার্দি, বার্ণাড শ হইতে নিট্‌সে ও মেস্‌ফিল্ড প্রভৃতি সকল সাহিত্যিকের মধ্যে আধুনিক জীবনের যে সুতীব্র প্রতিবাদ দেখিতে পাওয়া যায়, তাহার মূলে একটি অদম্য অসন্তোষ বিদ্যমান। বিশ্বামিত্রের ন্যায় ইঁহারা প্রত্যেকেই একএকটি নূতন বিশ্ব সৃষ্টি করিতে চাহেন। নব-সাহিত্যের এই সকল সৃষ্টি বাষ্পালোকের মত অত্যন্ত অনির্দ্দিষ্ট ও ছায়াময়। কেননা বাহিরের ও ভিতরের মিলনে নয়—বিরোধের উপরেই এই সকল কবি-সৃষ্টি প্রতিষ্ঠিত।

কালিদাস প্রভৃতির রচনার তুলনায় ইঁহাদের কাব্য যে অসম্পূর্ণ এবং শ্রীভ্রষ্ট, তাহার কারণ পূর্ব্ব কবিদিগের মনে শিবশক্তির যে মিলন ছিল, নব্য-কবিদের মনে তাহার বিচ্ছেদ ঘটিয়াছে। তাই ইঁহারা ইঁহাদের কাব্যে কোনও নূতন সত্যকে সাকার করিয়া তুলিতে পারেন না, পারেন শুধু নিজ মনের বিকারকে প্রকাশ করিতে।

আধুনিক সাহিত্যের নবজীবনের এই ছটফটানিকে অনেকে দুর্গতির সূত্রপাত মনে করিয়া নিরাশ হন। তাঁহারা ভুলিয়া যান্ যে সংকোচন ও প্রসারণের দ্বন্দ্বের মধ্য দিয়াই সকল সৃষ্টির বিকাশ। হঠাৎ একদিন এই সংকোচের বাধা অপসারিত হইলে দেখা যাইবে যে, যেখানে সংঘাত ছিল, সেইখানে সঙ্গীত বাজিতেছে, যেখানে উচ্ছৃঙ্খলতা ছিল, সেইখানে সৌন্দর্য্য জাগিতেছে।

মানুষের মন এখন সত্যের পূর্ব্বনির্দ্দিষ্ট সীমা অতিক্রম করিতেছে —বাহ্যজগত ও মনোজগতের স্পষ্ট পার্থক্য ভুলিয়া উহাদের অস্পষ্ট সম্বন্ধ অনুভব করিতেছে। এই নূতন অনুভূতির বলে কাব্যে উপমা আবার স্বীয় স্থান অধিকার করিবে, এবং এই নবজ্ঞানের উপর প্রতিষ্ঠিত হইয়া অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্যে বিকশিত হইয়া উঠিবে।

শ্রীঅজিতকুমার চক্রবর্ত্তী।

সহজিয়া

ওরে সহজিয়া, কোন্ সহজে
মজেছে তোর প্রাণ !
লাগ্‌ল বুকে কোন্ সহজের
এত কঠিন টান ?
যে সহজ ঐ ফুট্‌ল ফুলে,
লতা-পাতায় উঠ্‌ল দুলে,
যে সহজের ঢেউ লেগেছে
পাখীর কণ্ঠে গান।
ছুট্‌চে নদী সাগর-পানে,
বারণ কারো নাইক মানে,
সহজ রসের ধারায় ভাসে
ধরার বক্ষখান।
অবোধ সুখের নেশার মুখে
এ উহারে টানচে বুকে,
মরণজয়ী প্রাণের চলে
অসীম অভিযান ॥

কান্না-হাসির সহজ তানে
        আকুল ভরপুর
বিশ্বযাত্রা বাজায় প্রাণে
        রাখাল বাঁশীর সুর।
অন্ধ মূঢ় এই সহজে
মজুক যাহার পরাণ মজে,
শিশুর সহজ, কাছের সহজ,
        নাই কিছু ওর দূর।
আসুক ঝঞ্ঝা, লাগুক দ্বন্দ্ব,
বাজুক দ্বিধার দোদুল ছন্দ,
ভালো মন্দ এ ওর পানে
        হানুক মরণ-বাণ,
জান্‌বো আমি, চিন্‌ব আমি,
হারবো আমি, জিন্‌ব আমি,
চাখ্‌বো আমি, রাখ্‌বো আমি
        করব খানখান্‌॥

দেহ মনের কণায় কণায়
        চেতন হব আমি।
তারি পরে রঙীন মোহের
        আলো আসুক নামি।

ঝড়ের সাথে নাচুক শান্তি,
সত্য সাথে মিলুক ভ্রান্তি ;
যে মরণের সহজ মাঝে
জাগে নূতন প্রাণ
সেই সহজে দুলুক দ্বন্দ্ব,
দুঃখ সুখের মহানন্দ,
ওঠাপড়া ভাঙাগড়ার
করুক্ ছন্দ দান ॥

শ্রীদ্বিজেন্দ্রনারায়ণ বাগচি।

দেবতা

ভাগ্যে তোমার নয়ক দেউল মস্ত ইমারত,
যেথায় লোকের হুড়াহুড়ি, রুদ্ধ সদাই পথ।
ভাগ্যে তোমার গৃহে যেতে পাণ্ডা প্রহরীকে
সাধতে না হয়, ঢুকতে না হয় কায়দাকানুন শিখে।
তাই ত মোরা নৃত্য করি তোমার আঙিনায়,
যখন খুসি দুয়ার খুলে প্রণাম করি পায়।
ছুটি পেলেই তোমার সাথে একলা ঘরে রই,
পরাণ খুলে শ্রবণমূলে মনের কথা কই।

ভাগ্যে তোমার নয়ক ভোগের মস্ত আয়োজন,
বইতে জিনিস হয়না হাজার লোকের প্রয়োজন।
তোমার অর্ঘ্য আহরণের বিষম উপদ্রবে
প্রমাদ নাহি গণে দেশের দুঃখী লোকে সবে।
চাষের চালে ঘরের দুধে গাছের ফলে ফুলে
যেদিন যাহা জুটে তাহাই জোগাই চরণমূলে।
পৃথক আয়োজনের কোনো নেইক দাবিদাওয়া
একই থালাতেই তোমার আমার আগে পিছে খাওয়া।

ভাগ্যে তোমার নেইক খেয়াল দেমাক অভিমান,
মোদের চেয়ে অল্প পেয়ে তুষ্ট তোমার প্রাণ।
মারীভয়ের দিনে তুমি ভাবো মোদের তরে,
বর্ষাকালে মোদের সনে ভিজো ভাঙা ঘরে।
বন্যা-দিনে উপোষ কর আমাদেরি সাথে,
মোদের সনে জেগে রহ উৎসবেরি রাতে।
মন্ত্র কোথা? প্রাণের ভাষায় তোমার পূজা করি।
অবোধেরও ঠাকুর তুমি কাঙালেরও হরি!

শ্রীকালিদাস রায়।

পঞ্চম সংখ্যা]　　　　ভাদ্র ১৩২১　　　　[প্রথম বর্ষ

সবুজ পত্র

সম্পাদক—শ্রীপ্রমথ চৌধুরী

সবুজ পত্র

লোকহিত

লোক-সাধারণ বলিয়া একটা পদার্থ আমাদের দেশে আছে এটা আমরা কিছুদিন হইতে আন্দাজ করিতেছি এবং এই লোক-সাধারণের জন্য কিছু করা উচিত হঠাৎ এই ভাবনা আমাদের মাথায় চাপিয়াছে। যাদৃশী ভাবনা যস্য সিদ্ধির্ভবতি তাদৃশী। এই কারণে, ভাবনার জন্যই ভাবনা হয়।

আমরা পরের উপকার করিব মনে করিলেই উপকার করিতে পারি না। উপকার করিবার অধিকার থাকা চাই। যে বড় সে ছোটর অপকার অতি সহজে করিতে পারে কিন্তু ছোটর উপকার করিতে হইলে কেবল বড় হইলে চলিবে না, ছোট হইতে হইবে, ছোটর সমান হইতে হইবে। মানুষ কোনোদিন কোনো যথার্থ হিতকে ভিক্ষারূপে গ্রহণ করিবে না, ঋণরূপেও না, কেবলমাত্র প্রাপ্য বলিয়াই গ্রহণ করিতে পারিবে।

কিন্তু আমরা লোকহিতের জন্য যখন মাতি তখন অনেক স্থলে সেই মত্ততার মূলে একটি আত্মাভিমানের মদ থাকে। আমরা লোক-সাধারণের চেয়ে সকল বিষয়ে বড় এই কথাটাই রাজকীয় চালে সম্ভোগ করিবার উপায় উহাদের হিত করিবার আয়োজন। এমন স্থলে উহাদেরও অহিত করি, নিজেদেরও হিত করি না।

হিত করিবার একটিমাত্র ঈশ্বরদত্ত অধিকার আছে সেটি প্রীতি। প্রীতির দানে কোনো অপমান নাই কিন্তু হিতৈষিতার দানে মানুষ অপমানিত হয়। মানুষকে সকলের চেয়ে নত করিবার উপায় তাহার হিত করা অথচ তাহাকে প্রীতি না করা।

এ কথা অনেক সময়েই শোনা যায় যে, মানুষ স্বভাবতই অকৃতজ্ঞ —যাহার কাছে সে ঋণী তাহাকে পরিহার করিবার জন্য তাহার চেষ্টা। মহাজনো যেন গতঃ স পন্থাঃ—এ উপদেশ পারতপক্ষে কেহ মানে না। তাহার মহাজনটি যে রাস্তা দিয়া চলে মানুষ সে রাস্তায় চলা একেবারে ছাড়িয়া দেয়।

ইহার কারণ এ নয় যে, স্বভাবতই মানুষের মনটা বিকৃত। ইহার কারণ এই যে, মহাজনকে সুদ দিতে হয়; সে সুদ আসলকে ছাড়াইয়া যায়। হিতৈষী যে সুদটি আদায় করে সেটি মানুষের আত্মসম্মান;—সেটিও লইবে আবার কৃতজ্ঞতাও দাবী করিবে সে যে শাইলকের বাড়া হইল।

সেইজন্য, লোক-হিত করায় লোকের বিপদ আছে সে কথা ভুলিলে চলিবে না। লোকের সঙ্গে আপনাকে পৃথক রাখিয়া যদি তাহার হিত করিতে যাই তবে সেই উপদ্রব লোকে সহ্য না করিলেই তাহাদের হিত হইবে।

অল্পদিন হইল এ সম্বন্ধে আমাদের একটা শিক্ষা হইয়া গেছে। যে কারণেই হউক্ যেদিন স্বদেশী নিমকের প্রতি হঠাৎ আমাদের অত্যন্ত একটা টান হইয়াছিল সেদিন আমরা দেশের মুসলমানদের কিছু অস্বাভাবিক উচ্চস্বরেই আত্মীয় বলিয়া ভাই বলিয়া ডাকাডাকি সুরু করিয়াছিলাম।

সেই স্নেহের ডাকে যখন তাহারা অশ্রুগদগদ কণ্ঠে সাড়া দিল না তখন আমরা তাহাদের উপর ভারি রাগ করিয়াছিলাম। ভাবিয়াছিলাম এটা নিতান্তই ওদের সয়তানি। একদিনের জন্যও ভাবি নাই আমাদের ডাকের মধ্যে গরজ ছিল কিন্তু সত্য ছিল না। মানুষের সঙ্গে মানুষের যে একটা সাধারণ সামাজিকতা আছে,— যে সামাজিকতার টানে আমরা সহজ প্রীতির বশে মানুষকে ঘরে ডাকিয়া আনি, তাহার সঙ্গে বসিয়া খাই, যদিবা তাহার সঙ্গে আমাদের পার্থক্য থাকে সেটাকে অত্যন্ত স্পষ্ট করিয়া দেখিতে দিই না,— সেই নিতান্ত সাধারণ সামাজিকতার ক্ষেত্রে যাহাকে আমরা ভাই বলিয়া আপন বলিয়া মানিতে না পারি দায়ে পড়িয়া রাষ্ট্রীয় ক্ষেত্রে ভাই বলিয়া যথোচিত সতর্কতার সহিত তাহাকে বুকে টানিবার নাট্যভঙ্গী করিলে সেটা কখনই সফল হইতে পারে না।

এক মানুষের সঙ্গে আর-এক মানুষের, এক সম্প্রদায়ের সঙ্গে আর-এক সম্প্রদায়ের ত পার্থক্য থাকেই, কিন্তু সাধারণ সামাজিকতার কাজই এই—সেই পার্থক্যটাকে রূঢ়ভাবে প্রত্যক্ষগোচর না করা। ধনী দরিদ্রে পার্থক্য আছে—কিন্তু দরিদ্র তাহার ঘরে আসিলে ধনী যদি সেই পার্থক্যটাকে চাপা না দিয়া সেইটেকেই অত্যুগ্র করিয়া তোলে তবে আর যাই হউক্ দায়ে ঠেকিলে সেই দরিদ্রের

বুকের উপর ঝাঁপাইয়া পড়িয়া অশ্রুবর্ষণ করিতে যাওয়া ধনীর পক্ষে না হয় সত্য, না হয় শোভন।

হিন্দু-মুসলমানের পার্থক্যটাকে আমাদের সমাজে আমরা এতই কুশ্রীভাবে বে-আব্রু করিয়া রাখিয়াছি যে, কিছুকাল পূর্ব্বে স্বদেশী-অভিযানের দিনে একজন হিন্দু স্বদেশী-প্রচারক একগ্লাস জল খাইবেন বলিয়া তাঁহার মুসলমান সহযোগীকে দাওয়া হইতে নামিয়া যাইতে বলিতে কিছুমাত্র সঙ্কোচ বোধ করেন নাই। কাজের ক্ষেত্রে প্রতিযোগিতার বশে মানুষ মানুষকে ঠেলিয়া রাখে, অপমানও করে—তাহাতে বিশেষ ক্ষতি হয় না। কুস্তির সময়ে কুস্তিগিরদের গায়ে পরস্পরের পা ঠেকে তাহার হিসাব কেহ জমাইয়া রাখে না, কিন্তু সামাজিকতার স্থলে কথায় কথায় কাহারো গায়ে কেবলি পা ঠেকাইতে থাকিলে তাহা ভোলা শক্ত হয়। আমরা বিদ্যালয়ে ও আপিসে প্রতিযোগিতার ভিড়ে মুসলমানকে জোরের সঙ্গে ঠেলা দিয়াছি; সেটা সম্পূর্ণ প্রীতিকর নহে তাহা মানি; তবু সেখানকার ঠেলাঠেলিটা গায়ে লাগিতে পারে, হৃদয়ে লাগে না। কিন্তু সমাজের অপমানটা গায়ে লাগে না, হৃদয়ে লাগে। কারণ, সমাজের উদ্দেশ্যই এই যে, পরস্পরের পার্থক্যের উপর সুশোভন সামঞ্জস্যের আস্তরণ বিছাইয়া দেওয়া।

বঙ্গবিচ্ছেদ-ব্যাপারটা আমাদের অন্নবস্ত্রে হাত দেয় নাই, আমাদের হৃদয়ে আঘাত করিয়াছিল। সেই হৃদয়টা যতদূর পর্য্যন্ত অখণ্ড ততদূর পর্য্যন্ত তাহার বেদনাও অপরিচ্ছিন্ন ছিল। বাংলার মুসলমান যে এই বেদনায় আমাদের সঙ্গে এক হয় নাই তাহার কারণ তাহাদের সঙ্গে আমরা কোনোদিন হৃদয়কে এক হইতে দিই নাই।

সংস্কৃত ভাষায় একটা কথা আছে, ঘরে যখন আগুন লাগিয়াছে তখন কূপ খুঁড়িতে যাওয়ার আয়োজন বৃথা। বঙ্গবিচ্ছেদের দিনে হঠাৎ যখন মুসলমানকে আমাদের দলে টানিবার প্রয়োজন হইল তখন আমরা সেই কূপ-খননেরও চেষ্টা করি নাই—আমরা মনে করিয়াছিলাম, মাটির উপরে ঘটি ঠুকিলেই জল আপনি উঠিবে। জল যখন উঠিল না কেবল ধূলাই উড়িল তখন আমাদের বিস্ময়ের সীমা-পরিসীমা রহিল না। আজ পর্য্যন্ত সেই কূপ-খননের কথা ভুলিয়া আছি। আরও বারবার মাটিতে ঘটি ঠুকিতে হইবে, সেই সঙ্গে সে ঘটি আপনার কপালে ঠুকিব।

লোক-সাধারণের সম্বন্ধেও আমাদের ভদ্রসম্প্রদায়ের ঠিক ঐ অবস্থা। তাহাদিগকে সর্ব্বপ্রকারে অপমানিত করা আমাদের চিরদিনের অভ্যাস। যদি নিজেদের হৃদয়ের দিকে তাকাই তবে একথা স্বীকার করিতেই হইবে যে, ভারতবর্ষকে আমরা ভদ্রলোকের ভারতবর্ষ বলিয়াই জানি। বাংলা দেশে নিম্নশ্রেণীর মধ্যে মুসলমানের সংখ্যা যে বাড়িয়া গিয়াছে তাহার একমাত্র কারণ হিন্দুভদ্রসমাজ এই শ্রেণীয়-দিগকে হৃদয়ের সহিত আপন বলিয়া টানিয়া রাখে নাই।

আমাদের সেই মনের ভাবের কোনো পরিবর্ত্তন হইল না অথচ এই শ্রেণীর হিতসাধনের কথা আমরা কষিয়া আলোচনা করিতে আরম্ভ করিয়াছি। তাই এ কথা স্মরণ করিবার সময় আসিয়াছে যে, আমরা যাহাদিগকে দূরে রাখিয়া অপমান করি তাহাদের মঙ্গল-সাধনের সমারোহ করিয়া সেই অপমানের মাত্রা বাড়াইয়া কোনো ফল নাই।

একদিন যখন আমরা দেশহিতের ধ্বজা লইয়া বাহির হইয়াছিলাম

তখন তাহার মধ্যে দেশের অংশটা প্রায় কিছুই ছিল না, হিতের অভিমানটাই বড় ছিল। সেদিন আমরা য়ুরোপের নকলে দেশহিত সুরু করিয়াছিলাম, অন্তরের একান্ত তাগিদে নয়। আজও আমরা লোকহিতের জন্য যে উৎসুক হইয়া উঠিয়াছি তাহার মধ্যে অনেকটা নকল আছে। সম্প্রতি য়ুরোপে লোক-সাধারণ সেখানকার রাষ্ট্রীয় রঙ্গ-ভূমিতে প্রধান-নায়কের সাজে দেখা দিয়াছে। আমরা দর্শকরূপে এত দূরে আছি যে, আমরা তাহার হাত-পা নাড়া যতটা দেখি তাহার বাণীটা সে পরিমাণে শুনিতে পাই না। এই জন্যই নকল করিবার সময় ঐ অঙ্গভঙ্গীটাই আমাদের একমাত্র সম্বল হইয়া উঠে।

কিন্তু সেখানে কাণ্ডটা কি হইতেছে সেটা জানা চাই।

য়ুরোপে যাহারা একদিন বিশিষ্ট-সাধারণ বলিয়া গণ্য হইত তাহারা সেখানকার ক্ষত্রিয় ছিল। তখন কাটাকাটি মারামারির অন্ত ছিল না। তখন য়ুরোপের প্রবল বহিঃশত্রু ছিল মুসলমান; আর ভিতরে ছোট ছোট রাজ্যগুলা পরস্পরের গায়ের উপর পড়িয়া কেবলি মাথা ঠোকাঠুকি করিত। তখন দুঃসাহসিকের দল চারিদিকে আপনার ভাগ্য পরীক্ষা করিয়া বেড়াইত—কোথাও শান্তি ছিল না।

সে সময়ে সেখানকার ক্ষত্রিয়েরাই ছিল দেশের রক্ষক। তখন তাহাদের প্রাধান্য স্বাভাবিক ছিল। তখন লোক-সাধারণের সঙ্গে তাহাদের যে সম্বন্ধ ছিল সেটা কৃত্রিম নহে। তাহারা ছিল রক্ষাকর্ত্তা এবং শাসনকর্ত্তা। লোক-সাধারণে তাহাদিগকে স্বভাবতই আপনাদের উপরিবর্ত্তী বলিয়া মানিয়া লইত।

তাহার পরে ক্রমে অবস্থার পরিবর্ত্তন হইয়াছে। এখন য়ুরোপে রাজার জায়গাটা রাষ্ট্রতন্ত্র দখল করিতেছে, এখন লড়াইয়ের চেয়ে নীতি-

কৌশল প্রধান হইয়া উঠিয়াছে। যুদ্ধের আয়োজন পূর্ব্বের চেয়ে বাড়িয়াছে বই কমে নাই কিন্তু এখন যোদ্ধার চেয়ে যুদ্ধবিদ্যা বড়; এখন বীর্য্যের আসনে বিজ্ঞানের অভিষেক হইয়াছে। কাজেই য়ুরোপে সাবেক-কালের ক্ষত্রিয়-বংশীয়েরা এবং সেই সকল ক্ষত্রিয়-উপাধিধারীরা যদিও এখনো আপনাদের আভিজাত্যের গৌরব করিয়া থাকে তবু লোক-সাধারণের সঙ্গে তাহাদের স্বাভাবিক সম্বন্ধ ঘুচিয়া গেছে। তাই রাষ্ট্রচালনার কাজে তাহাদের আধিপত্য কমিয়া আসিলেও সেটাকে জাগাইয়া তুলিবার জোর তাহাদের নাই।

শক্তির ধারাটা এখন ক্ষত্রিয়কে ছাড়িয়া বৈশ্যের কূলে বহিতেছে। লোক-সাধারণের কাঁধের উপরে তাহারা চাপিয়া বসিয়াছে। মানুষকে লইয়া তাহারা আপনার ব্যবসায়ের যন্ত্র বানাইতেছে। মানুষের পেটের জ্বালাই তাহাদের কলের ষ্টীম উৎপন্ন করে।

পূর্ব্বকালের ক্ষত্রিয়-নায়কের সঙ্গে মানুষের যে সম্বন্ধ ছিল সেটা ছিল মানব-সম্বন্ধ। দুঃখ কষ্ট অত্যাচার যতই থাক্, তবু পরস্পরের মধ্যে হৃদয়ের আদান-প্রদানের পথ ছিল। এখন বৈশ্য মহাজনদের সঙ্গে মানুষের সম্বন্ধ যান্ত্রিক। কর্ম্মপ্রণালী নামক প্রকাণ্ড একটা জাঁতা মানুষের আর সমস্তই গুঁড়া করিয়া দিয়া কেবল মজুরটুকুমাত্র বাকি রাখিবার চেষ্টা করিতেছে।

ধনের ধর্ম্মই অসাম্য। জ্ঞান ধর্ম্ম কলা-সৌন্দর্য্য পাঁচজনের সঙ্গে ভাগ করিলে বাড়ে বই কমে না,—কিন্তু ধন জিনিষটাকে পাঁচজনের কাছ হইতে শোষণ করিয়া লইয়া পাঁচজনের হাত হইতে তাহাকে রক্ষা না করিলে সে টেঁকে না। এই জন্য ধনকামী নিজের গরজে দারিদ্র্য সৃষ্টি করিয়া থাকে।

তাই ধনের বৈষম্য লইয়া যখন সমাজে পার্থক্য ঘটে তখন ধনীর দল সেই পার্থক্যকে সমূলে ঘুচাইতে ইচ্ছা করে না, অথচ সেই পার্থক্যটা যখন বিপদজনক হইয়া উঠে তখন বিপদটাকে কোনমতে ঠেকো দিয়া ঠেকাইয়া রাখিতে চায়।

তাই ওদেশে শ্রমজীবীর দল যতই গুমরিয়া গুমরিয়া উঠিতেছে ততই তাহাদিগকে ক্ষুধার অন্ন না দিয়া ঘুম-পাড়াইবার গান গাওয়া হইতেছে; তাহাদিগকে অল্পস্বল্প এটা-ওটা দিয়া কোনোমতে ভুলাইয়া রাখিবার চেষ্টা। কেহ বলে উহাদের বাসা একটু ভালো করিয়া দাও, কেহ বলে যাহাতে উহারা দু চামচ সুপ খাইয়া কাজে যাইতে পারে তাহার বন্দোবস্ত কর, কেহবা তাহাদের বাড়ীতে গিয়া মিষ্টমুখে কুশল জিজ্ঞাসা করে, শীতের দিনে কেহবা আপন উদ্বৃত্ত গরম কাপড়টা তাহাদিগকে পাঠাইয়া দেয়।

এমনি করিয়া ধনের প্রকাণ্ড জালের মধ্যে আট্‌কা পড়িয়া লোক-সাধারণ ছটফট করিয়া উঠিয়াছে। ধনের চাপটা যদি এত জোরের সঙ্গে তাহাদের উপর না পড়িত তবে তাহারা জমাট বাঁধিত না—এবং তাহারা যে, কেহ বা কিছু তাহা কাহারো খবরে আসিত না। এখন ওদেশে লোক-সাধারণ কেবল সেন্সস্‌-রিপোর্টের তালিকাভুক্ত নহে; সে একটা শক্তি। সে আর ভিক্ষা করে না, দাবি করে। এই জন্য তাহার কথা দেশের লোকে আর ভুলিতে পারিতেছে না; সকলকে সে বিষম ভাবাইয়া তুলিয়াছে।

এই লইয়া পশ্চিমদেশে নিয়ত যে সব আলোচনা চলিতেছে আমরা তাহাদের কাগজে পত্রে তাহা সর্ব্বদাই পড়িতে পাই। ইহাতে হঠাৎ একএকবার আমাদের ধর্ম্ম-বুদ্ধি চমক খাইয়া

উঠে। বলে, তবে ত আমাদেরও ঠিক এই রকম আলোচনা কর্ত্তব্য।

ভুলিয়া যাই ওদেশে কেবলমাত্র আলোচনার নেশায় আলোচনা নহে, তাহা নিতান্তই প্রাণের দায়ে। এই আলোচনার পশ্চাতে নানা বোঝাপড়া, নানা উপায়-অন্বেষণ আছে। কারণ সেখানে শক্তির সঙ্গে শক্তির লড়াই চলিতেছে,—যাহারা অক্ষমকে অনুগ্রহ করিয়া চিত্ত-বিনোদন ও অবকাশ-যাপন করিতে চায় এ তাহাদের সেই বিলাসকলা নহে।

আমাদের দেশে লোক-সাধারণ এখনো নিজেকে লোক বলিয়া জানে না, সেইজন্য জানান্‌ দিতেও পারে না। আমরা তাহাদিগকে ইংরেজি বই পড়িয়া জানিব এবং অনুগ্রহ করিয়া জানিব সে জানায় তাহারা কোনো জোর পায় না, ফলও পায় না। তাহাদের নিজেদের অভাব ও বেদনা তাহাদের নিজের কাছে বিচ্ছিন্ন ও ব্যক্তিগত। তাহাদের একলার দুঃখ যে একটি বিরাট দুঃখের অন্তর্গত এইটি জানিতে পারিলে তবে তাহাদের দুঃখ সমস্ত সমাজের পক্ষে একটি সমস্যা হইয়া দাঁড়াইত। তখন সমাজ, দয়া করিয়া নহে, নিজের গরজে সেই সমস্যার মীমাংসায় লাগিয়া যাইত। পরের ভাবনা ভাবা তখনি সত্য হয়, পর যখন আমাদিগকে ভাবাইয়া তোলে। অনুগ্রহ করিয়া ভাবিতে গেলে কথায় কথায় অন্যমনস্ক হইতে হয় এবং ভাবনাটা নিজের দিকেই বেশি করিয়া ঝোঁকে।

সাহিত্য সম্বন্ধেও এই কথা খাটে। আমরা যদি আপনার উচ্চতার অভিমানে পুলকিত হইয়া মনে করি যে ঐ সব সাধারণ লোকদের জন্য আমরা লোকসাহিত্য সৃষ্টি করিব তবে এমন জিনিষের আমদানি

করিব যাহাকে বিদায় করিবার জন্য দেশে ভাঙা কুলা দুর্ম্মূল্য হইয়া উঠিবে। ইহা আমাদের ক্ষমতায় নাই। আমরা যেমন অন্য মানুষের হইয়া খাইতে পারি না, তেমনি আমরা অন্য মানুষের হইয়া বাঁচিতে পারি না। সাহিত্য জীবনের স্বাভাবিক প্রকাশ, তাহা ত প্রয়োজনের প্রকাশ নহে। চিরদিনই লোকসাহিত্য লোক আপনি সৃষ্টি করিয়া আসিয়াছে। দয়ালু বাবুদের উপর বরাৎ দিয়া সে আমাদের কলেজের দোতালার ঘরের দিকে হাঁ করিয়া তাকাইয়া বসিয়া নাই। সকল সাহিত্যেরই যেমন এই লোকসাহিত্যেরও সেই দশা। অর্থাৎ ইহাতে ভালো মন্দ মাঝারি সকল জাতেরই জিনিষ আছে। ইহার যাহা ভালো তাহা অপরূপ ভালো—জগতের কোনো রসিক সভায় তাহার কিছুমাত্র লজ্জা পাইবার কারণ নাই। অতএব দয়ার তাগিদে আমাদের কলেজের কোনো ডিগ্রিধারীকেই লোক-সাহিত্যের মুরুব্বিয়ানা করা সাজিবে না। স্বয়ং বিধাতাও অনুগ্রহের জোরে জগৎ সৃষ্টি করিতে পারেন না তিনি অহেতুক আনন্দের জোরেই এই যাহা কিছু রচিয়াছেন। যেখানেই হেতু আসিয়া মুরুব্বি হইয়া বসে সেইখানেই সৃষ্টি মাটি হয়। এবং যেখানেই অনুগ্রহ আসিয়া সকলের চেয়ে বড় আসনটা লয় সেইখান হইতেই কল্যাণ বিদায় গ্রহণ করে।

আমাদের ভদ্রসমাজ আরামে আছে কেননা আমাদের লোক-সাধারণ নিজেকে বোঝে নাই। এই জন্যই জমিদার তাহাদিগকে মারিতেছে, মহাজন তাহাদিগকে ধরিতেছে, মনিব তাহাদিগকে গালি দিতেছে, পুলিষ তাহাদিগকে শুষিতেছে, গুরুঠাকুর তাহাদের মাথায় হাত বুলাইতেছে, মোক্তার তাহাদের গাঁট কাটিতেছে, আর তাহারা কেবল

সেই অদৃষ্টের নামে নালিশ করিতেছে যাহার নামে সমন-জারি করিবার জো নাই। আমরা বড় জোর ধর্ম্মের দোহাই দিয়া জমিদারকে বলি তোমার কর্ত্তব্য কর, মহাজনকে বলি তোমার সুদ কমাও, পুলিসকে বলি তুমি অন্যায় করিয়ো না—এমন করিয়া নিতান্ত দুর্ব্বলভাবে কতদিন কতদিক ঠেকাইব। চালুনিতে করিয়া জল আনাইব আর বাহককে বলিব যতটা পার তোমার হাত দিয়া ছিদ্র সামলাও—সে হয় না; তাহাতে কোনো এক সময়ে এক মুহূর্ত্তের কাজ চলে কিন্তু চিরকালের এ ব্যবস্থা নয়। সমাজে দয়ার চেয়ে দায়ের জোর বেশি।

অতএব সব প্রথমে দরকার, লোকেরা আপনাদের পরস্পরের মধ্যে যাহাতে একটা যোগ দেখিতে পায়। অর্থাৎ তাহাদের পরস্পরের মধ্যে একটা রাস্তা থাকা চাই। সেটা যদি রাজপথ না হয় ত অন্তত গলি রাস্তা হওয়া চাই।

লেখাপড়া শেখাই এই রাস্তা। যদি বলি জ্ঞান শিক্ষা, তাহা হইলে তর্ক উঠিবে, আমাদের চাষাভুষারা যাত্রার দল ও কথকঠাকুরের কৃপায় জ্ঞান শিক্ষায় সকল দেশের অগ্রগণ্য। যদি বলি উচ্চ শিক্ষা, তাহা হইলে ভদ্রসমাজে খুব একটা উচ্চহাস্য উঠিবে,—সেটাও সহিতে পারিতাম যদি আশু এই প্রস্তাবটার কোনো উপযোগিতা থাকিত।

আমি কিন্তু সব চেয়ে কম করিয়াই বলিতেছি কেবলমাত্র লিখিতে পড়িতে শেখা। তাহা কিছু লাভ নহে তাহা কেবলমাত্র রাস্তা —সেও পাড়াগাঁয়ের মেটে রাস্তা। আপাতত এই যথেষ্ট—কেননা এই রাস্তাটা না হইলেই মানুষ আপনার কোণে আপনি বদ্ধ হইয়া থাকে। তখন তাহাকে যাত্রা কথকতার যোগে সাংখ্যযোগ বেদান্ত

পুরাণ ইতিহাস সমস্তই শুনাইয়া যাইতে পারো, তাহার আঙিনায় হরিনাম-সঙ্কীর্ত্তনেরও ধুম পড়িতে পারে কিন্তু এ কথা তাহার স্পষ্ট বুঝিবার উপায় থাকে না যে সে একা নহে, তাহার যোগ কেবলমাত্র অধ্যাত্মযোগ নহে—একটা বৃহৎ লৌকিক যোগ।

দূরের সঙ্গে নিকটের, অনুপস্থিতের সঙ্গে উপস্থিতের সম্বন্ধপথটা সমস্ত দেশের মধ্যে অবাধে বিস্তীর্ণ হইলে তবেই ত দেশের অনুভব-শক্তিটা ব্যাপ্ত হইয়া উঠিবে। মনের চলাচল যতখানি মানুষ ততখানি বড়। মানুষকে শক্তি দিতে হইলে মানুষকে বিস্তৃত করা চাই।

তাই আমি এই বলি, লিখিতে পড়িতে শিখিয়া মানুষ কি শিখিবে ও কতখানি শিখিবে সেটা পরের কথা, কিন্তু সে যে অন্যের কথা আপনি শুনিবে ও আপনার কথা অন্যকে শোনাইবে; এমনি করিয়া সে যে আপনার মধ্যে বৃহৎ মানুষকে ও বৃহৎ মানুষের মধ্যে আপনাকে পাইবে—তাহার চেতনার অধিকার যে চারিদিকে প্রশস্ত হইয়া যাইবে এইটেই গোড়াকার কথা।

য়ুরোপে লোক-সাধারণ আজ যে এক হইয়া উঠিবার শক্তি পাইয়াছে তাহার কারণ এ নয় যে তাহারা সকলেই পরম পণ্ডিত হইয়া উঠিয়াছে। হয় ত আমাদের দেশাভিমানীরা প্রমাণ করিয়া দিতে পারেন যে পরাবিদ্যা বলিতে যাহা বুঝায় তাহা আমাদের দেশের সাধারণ লোকে তাহাদের চেয়ে বেশি বোঝে, কিন্তু ইহাতে কোনো সন্দেহ নাই যে য়ুরোপের সাধারণ লোকে লিখিতে পড়িতে শিখিয়া পরস্পরের কাছে পৌঁছিবার উপায় হইয়াছে, হৃদয়ে হৃদয়ে গতিবিধির একটা মস্ত বাধা দূর হইয়া গেছে। এ কথা নিশ্চিত সত্য যে য়ুরোপে লোকশিক্ষা আপাততঃ অগভীর হইলেও তাহা যদি ব্যাপ্ত না হইত তবে আজ

সেখানে লোক-সাধারণ নামক যে সত্তা আপনার শক্তির গৌরবে জাগিয়া উঠিয়া আপন প্রাপ্য দাবি করিতেছে তাহাকে দেখা যাইত না। তাহা হইলে যে গরীব সে ক্ষণে ক্ষণে ধনীর প্রসাদ পাইয়া কৃতার্থ হইত, যে ভৃত্য সে মনিবের পায়ের কাছে মাথা রাখিয়া পড়িয়া থাকিত এবং যে মজুর সে মহাজনের লাভের উচ্ছিষ্টকণামাত্র খাইয়া ক্ষুধাদগ্ধ পেটের একটা কোণমাত্র ভরাইত।

লোকহিতৈষীরা বলিবেন, আমরা ত সেই কাজেই লাগিয়াছি—আমরা ত নাইট স্কুল খুলিয়াছি। কিন্তু ভিক্ষার দ্বারা কেহ কখনো সমৃদ্ধি লাভ করিতে পারে না। আমরা ভদ্রলোকেরা যে শিক্ষা লাভ করিতেছি সেটাতে আমাদের অধিকার আছে বলিয়া আমরা অভিমান করি,—সেটা আমাদিগকে দান করা অনুগ্রহ করা নয়, কিন্তু সেটা হইতে বঞ্চিত করা আমাদের প্রতি অন্যায় করা। এই জন্য আমাদের শিক্ষাব্যবস্থায় কোনো খর্ব্বতা ঘটিলে আমরা উত্তেজিত হইয়া উঠি। আমরা মাথা তুলিয়া শিক্ষা দাবী করি। সেই দাবী ঠিক গায়ের জোরের নহে, তাহা ধর্ম্মের জোরের। কিন্তু লোক-সাধারণেরও সেই জোরের দাবী আছে, যতদিন তাহাদের শিক্ষার ব্যবস্থা না হইতেছে ততদিন তাহাদের প্রতি অন্যায় জমা হইয়া উঠিতেছে এবং সেই অন্যায়ের ফল আমরা প্রত্যেকে ভোগ করিতেছি একথা যতক্ষণ পর্য্যন্ত আমরা স্বীকার না করিব ততক্ষণ দয়া করিয়া তাহাদের জন্য এক-আধটা নাইট্ স্কুল খুলিয়া কিছুই হইবে না। সকলের গোড়ায় দরকার লোক-সাধারণকে লোক বলিয়া নিশ্চিতরূপে গণ্য করা।

কিন্তু সমস্যাটা এই যে, দয়া করিয়া গণ্য করাটা টেঁকে না। তাহারা শক্তি লাভ করিয়া যেদিন গণ্য করাইবে সেই দিনই সমস্যার

মীমাংসা হইবে। সেই শক্তি যে তাহাদের নাই তাহার কারণ তাহারা অজ্ঞতার দ্বারা বিচ্ছিন্ন। রাষ্ট্রব্যবস্থা যদি তাহাদের মনের রাস্তা তাহাদের যোগের রাস্তা খুলিয়া না দেয় তবে দয়ালু লোকের নাইট্ স্কুল খোলা অশ্রু বর্ষণ করিয়া অগ্নিদাহ নিবারণের চেষ্টার মত হইবে। কারণ, এই লিখিতে পড়িতে শেখা তখনি যথার্থ ভাবে কাজে লাগিবে যখন তাহা দেশের মধ্যে সর্ব্বব্যাপী হইবে। সোনার আঙটি কড়ে আঙুলের মাপে হইলেও চলে কিন্তু একটা কাপড় সেই মাপের হইলে তাহা ঠাট্টার পক্ষেও নেহাৎ ছোট হয়—দেহটাকে এক-আবরণে আবৃত করিতে পারিলেই তবে তাহা কাজে দেখে। সামান্য লিখিতে পড়িতে শেখা দুই চার জনের মধ্যে বদ্ধ হইলে তাহা দামী জিনিষ হয় না, কিন্তু সাধারণের মধ্যে ব্যাপ্ত হইলে তাহা দেশের লজ্জা রক্ষা করিতে পারে।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি শক্তির সঙ্গে শক্তির বোঝাপড়া হইলে তবেই সেটা সত্যকার কারবার হয়। এই সত্যকার কারবারে উভয় পক্ষেরই মঙ্গল। য়ুরোপে শ্রমজীবীরা যেমনি বলিষ্ঠ হইয়াছে অমনি সেখানকার বণিকরা জবাবদিহির দায়ে পড়িয়াছে। ইহাতেই দুইপক্ষেয় সম্বন্ধ সত্য হইয়া উঠিবে—অর্থাৎ যেটা বরাবর সহিবে সেইটেই দাঁড়াইয়া যাইবে, সেইটেই উভয়েরই পক্ষে কল্যাণের। স্ত্রীলোককে সাধ্বী রাখিবার জন্য পুরুষ সমস্ত সামাজিক শক্তিকে তাহার বিরুদ্ধে খাড়া করিয়া রাখিয়াছে—তাই স্ত্রীলোকের কাছে পুরুষের কোনো জবাবদিহি নাই—ইহাতেই স্ত্রীলোকের সহিত সম্বন্ধে পুরুষ সম্পূর্ণ কাপুরুষ হইয়া দাঁড়াইয়াছে; স্ত্রীলোকের চেয়ে ইহাতে, পুরুষের ক্ষতি অনেক বেশি। কারণ দুর্ব্বলের সঙ্গে ব্যবহার করার মত এমন দুর্গতিকর

আর কিছুই নাই। আমাদের সমাজ লোক-সাধারণকে যে শক্তিহীন করিয়া রাখিয়াছে এইখানেই সে নিজের শক্তিকে অপহরণ করিতেছে। পরের অস্ত্র কাড়িয়া লইলে নিজের অস্ত্র নির্ভয়ে উচ্ছৃঙ্খল হইয়া উঠে—এইখানেই মানুষের পতন।

আমাদের দেশের জনসাধারণ আজ জমিদারের, মহাজনের, রাজপুরুষের, মোটের উপর সমস্ত ভদ্রসাধারণের দয়ার অপেক্ষা রাখিতেছে, ইহাতে তাহারা ভদ্রসাধারণকে নামাইয়া দিয়াছে। আমরা ভৃত্যকে অনায়াসে মারিতে পারি, প্রজাকে অনায়াসে অতিষ্ঠ করিতে পারি, গরীব মূর্খকে অনায়াসে ঠকাইতে পারি;—নিম্নতনদের সহিত ন্যায়-ব্যবহার করা, মানহীনদের সহিত শিষ্টাচার করা নিতান্তই আমাদের ইচ্ছার পরে নির্ভর করে, অপর পক্ষের শক্তির পরে নহে, এই নিরন্তর সঙ্কট হইতে নিজেদের বাঁচাইবার জন্যই আমাদের দরকার হইয়াছে নিম্নশ্রেণীয়দের শক্তিশালী করা। সেই শক্তি দিতে গেলেই তাহাদের হাতে এমন একটি উপায় দিতে হইবে যাহাতে ক্রমে তাহারা পরস্পর সম্মিলিত হইতে পারে—সেই উপায়টিই তাহাদের সকলকেই লিখিতে পড়িতে শেখানো।

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

ভাইফোঁটা

শ্রাবণ মাসটা আজ যেন একরাত্রে একেবারে দেউলে হইয়া গেছে। সমস্ত আকাশে কোথাও একটা ছেঁড়া মেঘের টুক্‌রাও নাই।

আশ্চর্য্য এই যে আমার সকালটা আজ এমন করিয়া কাটিতেছে। আমার বাগানের মেহেদি-বেড়ার প্রান্তে শিরীষগাছের পাতাগুলা ঝলমল করিয়া উঠিতেছে আমি তাহা তাকাইয়া দেখিতেছি। সর্ব্বনাশের যে মাঝ-দরিয়ায় আসিয়া পৌঁছিয়াছি এটা যখন দূরে ছিল তখন ইহার কথা কল্পনা করিয়া কত শীতের রাত্রে সর্ব্বাঙ্গে ঘাম দিয়াছে, কত গ্রীষ্মের দিনে হাত-পায়ের তেলো ঠাণ্ডা হিম হইয়া গেছে। কিন্তু আজ সমস্ত ভয়ভাবনা হইতে এমনি ছুটি পাইয়াছি যে ঐ যে আতা-গাছের ডালে একটা গিরিগিটি স্থির হইয়া শিকার লক্ষ্য করিতেছে সেটার দিকেও আমার চোখ রহিয়াছে।

সর্ব্বস্ব খোয়াইয়া পথে দাঁড়াইব এটা তত কঠিন না—কিন্তু আমাদের বংশে যে সততার খ্যাতি আজ তিন-পুরুষ চলিয়া আসিয়াছে সেটা আমারি জীবনের উপর আছাড় খাইয়া চুরমার হইতে চলিল সেই লজ্জাতেই আমার দিনরাত্রি স্বস্তি ছিলনা—এমন কি আত্মহত্যার কথাও অনেকবার ভাবিয়াছি। কিন্তু আজ যখন আর পর্দ্দা রহিল না, খাতাপত্রের গুহাগহ্বর হইতে অখ্যাতিগুলো কালো ক্রিমির মত কিলবিল করিয়া বাহির হইয়া আদালত হইতে খবরের কাগজময় ছড়াইয়া পড়িল, তখন আমার একটা মস্ত বোঝা নামিয়া গেল।

পিতৃপুরুষের সুনামটাকে টানিয়া বেড়াইবার দায় হইতে রক্ষা পাইলাম। সবাই জানিল, আমি জুয়াচোর। বাঁচা গেল!

উকিলে উকিলে ছেঁড়াছেঁড়ি করিয়া সকল কথাই বাহির করিবে, কেবল সকলের চেয়ে বড় কলঙ্কের কথাটা আদালতে প্রকাশ হইবার সম্ভাবনা নাই—কারণ স্বয়ং ধর্ম্ম ছাড়া তার আর-কোনো ফরিয়াদি অবশিষ্ট নাই। এইজন্য সেইটে প্রকাশ করিয়া দিব বলিয়াই আজ কলম ধরিলাম।

আমার পিতামহ উদ্ধব দত্ত তাঁর প্রভুবংশকে বিপদের দিনে নিজের সম্পত্তি দিয়া রক্ষা করিয়াছেন। সেই হইতে আমাদের দারিদ্র্যই অন্যলোকের ধনের চেয়ে মাথা উঁচু করিয়াছে। আমার পিতা সনাতন দত্ত ডিরোজিয়োর ছাত্র। মদের সম্বন্ধে তাঁর যেমন অদ্ভুত নেশা ছিল সত্যের সম্বন্ধে ততোধিক। মা আমাদের একদিন নাপিত ভায়ার গল্প বলিয়াছিলেন শুনিয়া পরদিন হইতে সন্ধ্যার পর আমাদের বাড়ির ভিতরে যাওয়া তিনি একেবারে বন্ধ করিয়া দিলেন। বাহিরে পড়িবার-ঘরে শুইতাম। সেখানে দেয়াল-জুড়িয়া ম্যাপগুলা সত্য কথা বলিত, তেপান্তর মাঠের খবর দিত না—এবং সাতসমুদ্র তেরো নদীর গল্পটাকে ফাঁসিকাঠে ঝুলাইয়া রাখিত। সততা সম্বন্ধেও তাঁর শুচিবায়ু প্রবল ছিল। আমাদের জবাবদিহির অন্ত ছিল না। একদিন একজন 'হকার' দাদাকে কিছু জিনিষ বেচিয়াছিল। তারই কোনো একটা মোড়কের একখানা দড়ি লইয়া খেলা করিতেছিলাম। বাবার হুকুমে সেই দড়ি 'হকার'কে ফিরাইয়া দিবার জন্য রাস্তায় আমাকে ছুটিতে হইয়াছিল।

আমরা সাধুতার জেলখানায় সততার লোহার বেড়ি পরিয়া

মানুষ। মানুষ বলিলে একটু বেশি বলা হয়—আমরা-ছাড়া আর সকলেই মানুষ, কেবল আমরা মানুষের দৃষ্টান্তস্থল। আমাদের খেলা ছিল কঠিন, ঠাট্টা বন্ধ, গল্প নীরস, বাক্য স্বল্প, হাসি সংযত, ব্যবহার নিখুঁৎ। ইহাতে বাল্য-লীলায় মস্ত যে একটা ফাঁক পড়িয়াছিল লোকের প্রশংসায় সেটা ভর্ত্তি হইত। আমাদের মাষ্টার হইতে মুদি পর্য্যন্ত সকলেই স্বীকার করিত, দত্ত-বাড়ির ছেলেরা সত্যযুগ হইতে হঠাৎ পথ ভুলিয়া আসিয়াছে।

পাথর দিয়া নিরেট করিয়া বাঁধানো রাস্তাতেও একটু ফাঁক পাইলেই প্রকৃতি তার মধ্য হইতে আপনার প্রাণ-শক্তির সবুজ জয়পতাকা তুলিয়া বসে। আমার নবীন জীবনে সকল তিথিই একাদশী হইয়া উঠিয়াছিল, কিন্তু উহারই মধ্যে উপবাসের একটা কোন্ ফাঁকে আমি একটুখানি সুধার স্বাদ পাইয়াছিলাম।

যে কয়জনের ঘরে আমাদের যাওয়া-আসার বাধা ছিল না তার মধ্যে একজন ছিলেন অখিলবাবু। তিনি ব্রাহ্ম-সমাজের লোক—বাবা তাঁকে বিশ্বাস করিতেন। তাঁর মেয়ে ছিল অনসূয়া, আমার চেয়ে ছয়-বছরের ছোট। আমি তার শাসনকর্ত্তার পদ লইয়াছিলাম।

তার শিশুমুখের সেই ঘন কালো চোখের পল্লব আমার মনে পড়ে। সেই পল্লবের ছায়াতে এই পৃথিবীর আলোর সমস্ত প্রখরতা তার চোখে যেন কোমল হইয়া আসিয়াছিল। কি স্নিগ্ধ করিয়াই সে মুখের দিকে চাহিত। পিঠের উপরে দুলিতেছে তার সেই বেণীটি, সেও আমার মনে পড়ে। আর মনে পড়ে সেই দুইখানি হাত;—কেন জানি না তার মধ্যে বড়-একটি করুণা ছিল। সে যেন পথে চলিতে আর-কারো হাত ধরিতে চায়—তার সেই কচি

আঙুলগুলি যেন সম্পূর্ণ বিশ্বাস করিয়া কার মুঠার মধ্যে ধরা দিবার জন্য পথ চাহিয়া আছে।

ঠিক সেদিন এমন করিয়া তাকে দেখিতে পাইয়াছিলাম একথা বলিলে বেশি বলা হইবে। কিন্তু আমরা সম্পূর্ণ বুঝিবার আগেও অনেকটা বুঝি। অগোচরে মনের মধ্যে অনেক ছবি আঁকা হইয়া যায়—হঠাৎ একদিন কোনো-একদিক হইতে আলো পড়িলে সেগুলা চোখে পড়ে।

অনুর মনের দরজায় কড়া পাহারা ছিল না। সে যা-তা বিশ্বাস করিত। একে ত সে তার বুড়ি দাসীর কাছ হইতে বিশ্ব-তত্ত্ব সম্বন্ধে যে-সমস্ত শিক্ষা লাভ করিয়াছিল তা আমার সেই ম্যাপ-টাঙানো পড়িবার-ঘরের জ্ঞান-ভাণ্ডারের আবর্জ্জনার মধ্যেও ঠাঁই পাইবার যোগ্য নয়; তার পরে সে আবার নিজের কল্পনার যোগেও কত কি যে সৃষ্টি করিত তার ঠিকানা নাই। এইখানে কেবলি তাকে আমার শাসন করিতে হইত। কেবলি বলিতে হইত, "অনু, এ সমস্ত মিথ্যা কথা, তা জান! ইহাতে পাপ হয়!" শুনিয়া অনুর দুই চোখে কালো পল্লবের ছায়ার উপরে আবার একটা ভয়ের ছায়া পড়িত। অনু যখন তার ছোট বোনের কান্না থামাইবার জন্য কত কি বাজে কথা বলিত—তাকে ভুলাইয়া দুধ খাওয়াইবার সময় যেখানে পাখী নাই সেখানেও পাখী আছে বলিয়া উচ্চৈঃস্বরে উড়ো-খবর দিবার চেষ্টা করিত, আমি তাকে ভয়ঙ্কর গম্ভীর হইয়া সাবধান করিয়া দিয়াছি—বলিয়াছি, উহাকে যে মিথ্যা বলিতেছ, পরমেশ্বর সমস্ত শুনিতেছেন, এখনি তাঁর কাছে তোমার মাপ চাওয়া উচিত।

এমনি করিয়া আমি তাকে যত শাসন করিয়াছি সে আমার শাসন মানিয়াছে। সে নিজেকে যতই অপরাধী মনে করিত আমি ততই খুসি হইতাম। কড়া শাসনে মানুষের ভালো করিবার সুযোগ পাইলে নিজে যে অনেক শাসনে ভালো হইয়াছি সেটার একটা দাম ফিরিয়া পাওয়া যায়। অনুও আমাকে নিজের এবং পৃথিবীর অধিকাংশের তুলনায় অদ্ভুত ভালো বলিয়া জানিত।

ক্রমে বয়স বাড়িয়াছে, ইস্কুল হইতে কলেজে গিয়াছি। অখিল বাবুর স্ত্রীর মনে মনে ইচ্ছা ছিল আমার মত ভালো ছেলের সঙ্গে অনুর বিবাহ দেন। আমারো মনে এটা ছিল কোনো কন্যার পিতার চোখ-এড়াইবার মত ছেলে আমি নই। কিন্তু একদিন শুনিলাম বি-এল্ পাস-করা একটি টাট্‌কা মুন্সেফের সঙ্গে অনুর সম্বন্ধ পাকা হইয়াছে। আমরা গরীব—আমি ত জানিতাম সেটাতেই আমাদের দাম বাড়িয়াছে। কিন্তু কন্যার পিতার হিসাবের প্রণালী স্বতন্ত্র।

বিসর্জ্জনের প্রতিমা ডুবিল। একেবারে জীবনের কোন্ আড়ালে সে পড়িয়া গেল। শিশুকাল হইতে যে আমার সকলের চেয়ে পরিচিত সে একদিনের মধ্যেই এই হাজার লক্ষ অপরিচিত মানুষের সমুদ্রের মধ্যে তলাইয়া গেল। সেদিন মনে যে কি বাজিল তাহা মনই জানে। কিন্তু বিসর্জ্জনের পরেও কি চিনিয়াছিলাম সে আমার দেবীর প্রতিমা? তা নয়। অভিমান সেদিন ঘা খাইয়া আরো ঢেউ খেলাইয়া উঠিয়াছিল। অনুকে ত চিরকাল ছোট করিয়াই দেখিয়া আসিয়াছি; সেদিন আমার যোগ্যতার তুলনায় তাকে আরো ছোট করিয়া দেখিলাম। আমার শ্রেষ্ঠতার যে পূজা হইল না

সেদিন এইটেই সংসারের সকলের চেয়ে বড় অকল্যাণ বলিয়া জানিয়াছি।

যাক্—এটা বোঝা গেল সংসারে শুধু সৎ হইয়া কোনো লাভ নাই। পণ করিলাম এমন টাকা করিব যে, একদিন অখিলবাবুকে বলিতে হইবে বড় ঠকান ঠকিয়াছি। খুব কষিয়া কাজের-লোক হইবার জোগাড় করিলাম।

কাজের-লোক হইবার সব-চেয়ে বড় সরঞ্জাম নিজের পরে অগাধ বিশ্বাস, সে পক্ষে আমার কোনোদিন কোনো কম্‌তি ছিল না। এ জিনিষটা ছোঁয়াচে। যে নিজেকে বিশ্বাস করে অধিকাংশ লোকেই তাকে বিশ্বাস করে। কেজো বুদ্ধিটা যে আমার স্বাভাবিক এবং অসাধারণ সেটা সকলেই মানিয়া লইতে লাগিল।

কেজো সাহিত্যের বই এবং কাগজে আমার শেল্‌ফ্‌ এবং টেবিল ভরিয়া উঠিল। বাড়ি-মেরামৎ, ইলেক্‌ট্রিক আলো ও পাখার কৌশল, কোন্ জিনিষের কত দর, বাজার দর ওঠাপড়ার গূঢ়তত্ত্ব, এক্‌স্‌চেঞ্জের রহস্য, প্ল্যান্, এষ্টিমেট্ প্রভৃতি বিদ্যায় আসর জমাইবার মত ওস্তাদি আমি এক-রকম মারিয়া লইয়াছিলাম।

কিন্তু অহরহ কাজের কথা বলি অথচ কিছুতে কোনো কাজেই নামি না এমন ভাবে অনেক দিন কাটিল। আমার ভক্তরা যখনি আমাকে কোনো-একটা স্বদেশী কম্পানিতে যোগ দিবার প্রস্তাব করিত আমি বুঝাইয়া দিতাম, যতগুলা কারবার চলিতেছে কোনোটার কাজের ধারা বিশুদ্ধ নহে, সকলেরই মধ্যে গলদ বিস্তর—তা ছাড়া সততা বাঁচাইয়া চলিতে হইলে ওদের কাছে ঘেঁষিবার জো নাই। সততার লাগামে একটু-আধটু ঢিল্ না দিলে ব্যবসা চলে না এমন

কথা আমার কোনো বন্ধু বলাতে তার সঙ্গে আমার ছাড়াছাড়ি হইয়া গেছে।

মৃত্যুকাল পর্য্যন্ত সর্ব্বাঙ্গ-সুন্দর প্ল্যান, এষ্টিমেট্ এবং প্রস্পেক্টস লিখিয়া আমার যশ অক্ষুণ্ণ রাখিতে পারিতাম। কিন্তু বিধির বিপাকে প্ল্যান করা ছাড়িয়া কাজ করায় লাগিলাম। এক ত পিতার মৃত্যু হওয়াতে আমার ঘাড়েই সংসারের দায় চাপিল, তার পরে আর-এক উপসর্গ আসিয়া জুটিল, সে কথাও বলিতেছি।

প্রসন্ন বলিয়া একটি ছেলে আমার সঙ্গে পড়িত। সে যেমন মুখর তেম্নি নিন্দুক। আমাদের পৈতৃক সততার খ্যাতিটাকে লইয়া খোঁচা দিবার সে ভারি সুযোগ পাইয়াছিল। বাবা আমার নাম দিয়াছিলেন সত্যধন। প্রসন্ন আমাদের দারিদ্র্য লক্ষ্য করিয়া বলিত, বাবা দিবার বেলা দিলেন মিথ্যাধন, আর নামের বেলা দিলেন সত্যধন, তার চেয়ে ধনটাকে সত্য দিয়া নামটাকে মিথ্যা দিলে লোকসান হইত না। প্রসন্নর মুখটাকে বড় ভয় করিতাম।

অনেক দিন তার দেখাই ছিল না। ইতিমধ্যে সে বর্ম্মায় লুধিয়ানায় শ্রীরঙ্গপত্তনে নানা রকম-বেরকমের কাজ করিয়া আসিয়াছে। সে হঠাৎ কলিকাতায় আসিয়া আমাকে পাইয়া বসিল। যার ঠাট্টাকে চিরদিন ভয় করিয়া আসিয়াছি তার শ্রদ্ধা পাওয়া কি কম আরাম!

প্রসন্ন কহিল, ভাই আমার এই কথা রইল, দেখে নিয়ো, একদিন তুমি যদি দ্বিতীয় মতি শীল বা দুর্গাচরণ লা' না হও তবে আমি বউবাজারের মোড় হইতে বাগবাজারের মোড় পর্য্যন্ত বরাবর সমানে নাকে খৎ দিতে রাজি আছি।

প্রসন্নর মুখে এত বড় কথাটা যে কতই বড় তাহা প্রসন্নর

সঙ্গে যারা এক-ক্লাসে না পড়িয়াছে তারা বুঝিতেই পারিবে না। তার উপরে প্রসন্ন পৃথিবীটাকে খুব-করিয়া চিনিয়া আসিয়াছে; উহার কথার দাম আছে।

সে বলিল, কাজ বোঝে এমন লোক আমি ঢের দেখিয়াছি দাদা—কিন্তু তারাই সব চেয়ে পড়ে বিপদে। তারা বুদ্ধির জোরেই কিস্তি মাৎ করিতে চায়, ভুলিয়া যায় যে মাথার উপরে ধর্ম্ম আছেন। কিন্তু তোমাতে যে মণিকাঞ্চনযোগ। ধর্ম্মকেও শক্ত করিয়া ধরিয়াছ আবার কর্ম্মের বুদ্ধিতেও তুমি পাকা।

তখন ব্যবসা-ক্ষেপা কালটাও পড়িয়াছিল। সকলেই স্থির করিয়াছিল বাণিজ্য ছাড়া দেশের মুক্তি নাই এবং ইহাও নিশ্চিত বুঝিয়াছিল যে কেবলমাত্র মূল-ধনটার জোগাড় হইলেই উকীল, মোক্তার, ডাক্তার, শিক্ষক, ছাত্র এবং ছাত্রদের বাপদাদা সকলেই একদিনেই সকল প্রকার ব্যবসা পূরাদমে চালাইতে পারে।

আমি প্রসন্নকে বলিলাম, আমার সম্বল নাই যে।

সে বলিল, বিলক্ষণ! তোমার পৈতৃক সম্পত্তির অভাব কি?

তখন হঠাৎ মনে হইল প্রসন্ন তবে বুঝি এতদিন ধরিয়া আমার সঙ্গে একটা লম্বা ঠাট্টা করিয়া আসিতেছে।

প্রসন্ন কহিল, ঠাট্টা নয় দাদা! সততাই ত লক্ষ্মীর সোনার পদ্ম। লোকের বিশ্বাসের উপরই কারবার চলে, টাকায় নয়।

পিতার আমল হইতেই আমাদের বাড়িতে পাড়ার কোনো কোনো বিধবা মেয়ে টাকা গচ্ছিত রাখিত। তারা সুদের আশা করিত না—কেবল এই বলিয়া নিশ্চিন্ত ছিল যে, মেয়েমানুষের সর্ব্বত্রই ঠকিবার আশঙ্কা আছে কেবল আমাদের ঘরেই নাই।

সেই গচ্ছিত টাকা লইয়া স্বদেশী এজেন্সি খুলিলাম। কাপড় কাগজ কালী বোতাম সাবান যতই আনাই বিক্রি হইয়া যায়—একেবারে পঙ্গপালের মত খরিদ্দার আসিতে লাগিল।

একটা কথা আছে—বিদ্যা যতই বাড়ে ততই জানা যায় যে কিছুই জানি না; টাকারও সেই দশা। টাকা যতই বাড়ে ততই মনে হয় টাকা নাই বলিলেই হয়। আমার মনের সেই রকম অবস্থায় প্রসন্ন বলিল—ঠিক যে বলিল তাহা নয়, আমাকে দিয়া বলাইয়া লইল—যে, খুচরা-দোকানদারীর কাজে জীবন দেওয়াটা জীবনের খাজে খরচ। পৃথিবী জুড়িয়া যে সব ব্যবসা সেই ত ব্যবসা। দেশের ভিতরেই যে টাকা খাটে সে টাকা ঘানির বলদের মত অগ্রসর হয় না, কেবল ঘুরিয়া মরে।

প্রসন্ন এমনি ভক্তিতে গদ্‌গদ হইয়া উঠিল যেন এমন নূতন অথচ গভীর জ্ঞানের কথা সে জীবনে আর কখনো শোনে নাই। তার পরে আমি তাকে ভারতবর্ষে তিসির ব্যবসার সাত বছরের হিসাব দেখাইলাম। কোথায় তিসি কত পরিমাণে যায়; কোথায় কত দর; দর সব চেয়ে উঠেই বা কত নামেই বা কত; মাঠে ইহার দাম কত, জাহাজের ঘাটে ইহার দাম কত; চাষাদের ঘর হইতে কিনিয়া একদম সমুদ্রপারে চালান করিতে পারিলে এক লম্ফে কত লাভ হওয়া উচিত কোথাও বা তাহা রেখা কাটিয়া, কোথাও বা তাহা শতকরা হিসাবের অঙ্কে ছকিয়া, কোথাও বা অনুলোম-প্রণালীতে কোথাও বা প্রতিলোম-প্রণালীতে লাল এবং কালো কালীতে অতি পরিষ্কার অক্ষরে লম্বা কাগজের পাঁচ-সাত পৃষ্ঠা ভর্ত্তি করিয়া যখন প্রসন্নর হাতে দিলাম তখন সে আমার

পায়ের ধূলা লইতে যায় আর কি! সে বলিল—মনে বিশ্বাস ছিল আমি এসব কিছু-কিছু বুঝি কিন্তু আজ হইতে দাদা তোমার সাক্‌রেদ্‌ হইলাম।

আবার একটু প্রতিবাদও করিল। বলিল, যো ধ্রুবাণি পরিত্যজ্য—মনে আছে ত? কি জানি হিসাবে ভুল থাকিতেও পারে।

আমার রোখ চড়িয়া গেল। ভুল যে নাই কাগজে কাগজে তাহার অকাট্য প্রমাণ বাড়িয়া চলিল। লোকসান যত প্রকারের হইতে পারে সমস্তকে সার বাঁধিয়া খাড়া করিয়াও মুনফাকে কোনো মতেই শতকরা বিশ পঁচিশের নীচে নামাইতে পারা গেল না।

এমনি করিয়া দোকানদারীর সরু খাল বাহিয়া কারবারের সমুদ্রে গিয়া যখন পড়া গেল তখন যেন সেটা নিতান্ত আমারই জেদ-বশত ঘটিল এমনি একটা ভাব দেখা দিল। দায়িত্ব আমারই।

একে দত্ত বংশের সততা তার উপরে সুদের লোভ; গচ্ছিত টাকা ফাঁপিয়া উঠিল। মেয়েরা গহনা বেচিয়া টাকা দিতে লাগিল।

কাজে প্রবেশ করিয়া আর দিশা পাই না। প্ল্যানে যেগুলো দিব্য লাল এবং কালো কালীর রেখায় ভাগ করা, কাজের মধ্যে সে বিভাগ খুঁজিয়া পাওয়া দায়। আমার প্ল্যানের রসভঙ্গ হয়—তাই কাজে সুখ পাই না। অন্তরাত্মা স্পষ্ট বুঝিতে লাগিল কাজ করিবার ক্ষমতা আমার নাই অথচ সেটা কবুল করিবার ক্ষমতাও আমার নাই। কাজটা স্বভাবত প্রসন্নর হাতেই পড়িল অথচ আমিই যে কারবারের হর্ত্তা-কর্ত্তা-বিধাতা এ ছাড়া প্রসন্নর মুখে আর কথাই নাই। তার মৎলব এবং আমার স্বাক্ষর, তার দক্ষতা এবং আমার

পৈতৃক খ্যাতি এই দুইয়ে মিলিয়া ব্যবসাটা চার পা তুলিয়া যে কোন্ পথে ছুটিতেছে ঠাহর করিতেই পারিলাম না।

দেখিতে দেখিতে এমন জায়গায় আসিয়া পড়িলাম যেখানে তলও পাই না, কূলও দেখি না। তখন হাল ছাড়িয়া দিয়া যদি সত্য খবরটা ফাঁস করি তবে সততা রক্ষা হয় কিন্তু সততার খ্যাতি রক্ষা হয় না। গচ্ছিত টাকার সুদ জোগাইতে লাগিলাম কিন্তু সেটা মুনফা হইতে নয়। কাজেই সুদের হার বাড়াইয়া গচ্ছিতের পরিমাণ বাড়াইতে থাকিলাম।

আমার বিবাহ অনেক দিন হইয়াছে। আমি জানিতাম ঘরকন্না ছাড়া আমার স্ত্রীর আর কোনো-কিছুতেই খেয়াল নাই। হঠাৎ দেখি, অগস্ত্যের মত এক-গণ্ডূষে টাকার সমুদ্র শুষিয়া লইবার লোভ তারও আছে। আমি জানি না কখন আমারই মনের মধ্য হইতে এই হাওয়াটা আমাদের সমস্ত পরিবারে বহিতে আরম্ভ করিয়াছে। আমাদের চাকর দাসী দরোয়ান পর্য্যন্ত আমাদের কারবারে টাকা ফেলিতেছে। আমার স্ত্রীও আমাকে ধরিয়া পড়িল সে কিছু কিছু গহনা বেচিয়া আমার কারবারে টাকা খাটাইবে। আমি ভর্ৎসনা করিলাম, উপদেশ দিলাম। বলিলাম, লোভের মত রিপু নাই।— স্ত্রীর টাকা লই নাই।

আরো একজনের টাকা আমি লইতে পারি নাই।

অনু একটি ছেলে লইয়া বিধবা হইয়াছে। যেমন কৃপণ তেমনি ধনী বলিয়া তার স্বামীর খ্যাতি ছিল। কেহ বলিত দেড় লক্ষ টাকা তার জমা আছে, কেহ বলিত আরো অনেক বেশি। লোকে বলিত, কৃপণতায় অনু তার স্বামীর সহধর্ম্মিণী। আমি ভাবিতাম, তা হবেই ত। অনু ত তেমন শিক্ষা এবং সঙ্গ পায় নাই।

এই টাকা কিছু খাটাইয়া দিবার জন্য সে আমাকে অনুরোধ করিয়া পাঠাইয়াছিল। লোভ হইল, দরকারও খুব ছিল কিন্তু ভয়ে তার সঙ্গে দেখা পর্য্যন্ত করিতে গেলাম না।

একবার যখন একটা বড় হুণ্ডির মেয়াদ আসন্ন এমন সময়ে প্রসন্ন আসিয়া বলিল, অখিলবাবুর মেয়ের টাকাটা এবার না লইলে নয়।

আমি বলিলাম, যে রকম দশা সিঁধ-কাটাও আমার দ্বারা সম্ভব কিন্তু ও টাকাটা লইতে পারিব না।

প্রসন্ন কহিল—যখন হইতে তোমার ভরসা গেছে তখন হইতেই কারবারে লোকসান চলিতেছে। কপাল ঠুকিয়া লাগিলেই কপালের' জোরও বাড়ে।

কিছুতেই রাজি হইলাম না।

পরদিন প্রসন্ন আসিয়া কহিল, দক্ষিণ হইতে এক বিখ্যাত মারাঠী গণৎকার আসিয়াছে তাহার কাছে কুষ্ঠি লইয়া চল।

সনাতন দত্তর বংশে কুষ্ঠি মিলাইয়া ভাগ্য পরীক্ষা! দুর্ব্বলতার দিনে মানব প্রকৃতির ভিতরকার সাবেককেলে বর্ব্বরটা বল পাইয়া উঠে। যাহা দৃষ্ট তাহা যখন ভয়ঙ্কর তখন যাহা অদৃষ্ট তাহাকে বুকে চাপিয়া ধরিতে ইচ্ছা করে। বুদ্ধিকে বিশ্বাস করিয়া কোনো আরাম পাইতেছিলাম না তাই নির্ব্বুদ্ধিতার শরণ লইলাম; জন্মক্ষণ ও সন তারিখ লইয়া গণাইতে গেলাম।

শুনিলাম আমি সর্ব্বনাশের শেষ-কিনারায় আসিয়া দাঁড়াইয়াছি। কিন্তু এইবার বৃহস্পতি অনুকূল—এখন তিনি আমাকে কোনো একটি স্ত্রীলোকের ধনের সাহায্যে উদ্ধার করিয়া অতুল ঐশ্বর্য্য মিলাইয়া দিবেন।

ইহার মধ্যে প্রসন্নর হাত আছে এমন সন্দেহ করিতে পারিতাম। কিন্তু সন্দেহ করিতে কোনোমতেই ইচ্ছা হইল না। বাড়ি ফিরিয়া আসিলে প্রসন্ন আমার হাতে একখানা বই দিয়া বলিল, খোল দেখি। খুলিতেই যে পাতা বাহির হইল তাহাতে ইংরাজিতে লেখা, বাণিজ্যে আশ্চর্য্য সফলতা।

সেইদিনই অনুকে দেখিতে গেলাম।

স্বামীর সঙ্গে মফস্বলে ফিরিবার সময় বারবার ম্যালেরিয়া জ্বরে পড়িয়া অনুর এখন এমন দশা যে ডাক্তাররা ভয় করিতেছে তাকে ক্ষয়-রোগে ধরিয়াছে। কোনো ভালো জায়গায় যাইতে বলিলে সে বলে, আমি ত আজ বাদে কাল মরিবই কিন্তু আমার সুবোধের টাকা আমি নষ্ট করিব কেন?—এমনি করিয়া সে সুবোধকে এবং সুবোধের টাকাটিকে নিজের প্রাণ দিয়া পালন করিতেছে।

আমি গিয়া দেখিলাম অনুর রোগটি তাকে এই পৃথিবী হইতে তফাৎ করিয়া দিয়াছে। আমি যেন তাকে অনেক দূর হইতে দেখিতেছি। তার দেহখানি একেবারে স্বচ্ছ হইয়া ভিতর হইতে একটি আভা বাহির হইতেছে। যা-কিছু স্থূল সমস্ত ক্ষয় করিয়া তার প্রাণটি মৃত্যুর বাহির-দরজায় স্বর্গের আলোতে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে। আর সেই তার করুণ দুটি চোখের ঘন পল্লব। চোখের নীচে কালী পড়িয়া মনে হইতেছে যেন তার দৃষ্টির উপরে জীবনান্তকালের সন্ধ্যার ছায়া নামিয়া আসিয়াছে। আমার সমস্ত মন স্তব্ধ হইয়া গেল, আজ তাহাকে দেবী বলিয়া মনে হইল।

আমাকে দেখিয়া অনুর মুখের উপর একটি শান্ত প্রসন্নতা ছড়াইয়া পড়িল। সে বলিল, কাল রাত্রে আমার অসুখ যখন বাড়িয়াছিল তখন হইতে তোমার কথাই ভাবিতেছি। আমি জানি আমার আর বেশি দিন নাই। পশু´ ভাই-ফোঁটার দিন, সেদিন আমি তোমাকে শেষ ভাই-ফোঁটা দিয়া যাইব।

টাকার কথা কিছুই বলিলাম না।

সুবোধকে ডাকাইয়া আনিলাম। তার বয়স সাত। চোখদুটি মায়েরই মত। সমস্তটা জড়াইয়া তার কেমন-একটি ক্ষণিকতার ভাব—পৃথিবী যেন তাকে পূরা পরিমাণ স্তন্য দিতে ভুলিয়া গেছে। কোলে টানিয়া তার কপাল চুম্বন করিলাম। সে চুপ করিয়া আমার মুখের দিকে চাহিয়া রহিল।

প্রসন্ন জিজ্ঞাসা করিল, কি হইল?

আমি বলিলাম, আজ আর সময় হইল না।

সে কহিল, মেয়াদের আর নয় দিন মাত্র বাকি।

অনুর সেই মুখখানি, সেই মৃত্যু-সরোবরের পদ্মটি, দেখিয়া অবধি সর্ব্বনাশকে আমার তেমন ভয়ঙ্কর বলিয়া মনে হইতেছিল না।

কিছুকাল হইতে হিসাবপত্র দেখা ছাড়িয়া দিয়াছিলাম। কূল দেখা যাইত না বলিয়া ভয়ে চোখ বুজিয়া থাকিতাম। মরীয়া হইয়া সই করিয়া যাইতাম, বুঝিবার চেষ্টা করিতাম না।

ভাই-ফোঁটার সকালবেলায় একখানা হিসাবের চুম্বক ফর্দ্দ লইয়া জোর করিয়া প্রসন্ন আমাকে কারবারের বর্ত্তমান অবস্থাটা বুঝাইয়া দিল। দেখিলাম মূলধনের সমস্ত তলা একেবারে ক্ষইয়া গেছে। এখন কেবলই ধারের টাকায় জল সেঁচিয়া না চলিলে নৌকাডুবি হইবে।

কৌশলে টাকার কথাটা পাড়িবার উপায় ভাবিতে ভাবিতে ভাই-ফোঁটার নিমন্ত্রণে চলিলাম। দিনটা ছিল বৃহস্পতিবার। এখন হতবুদ্ধির তাড়ায় বৃহস্পতিবারকেও ভয় না করিয়া পারি না। যে মানুষ হতভাগা, নিজের বুদ্ধি ছাড়া আর কিছুকেই না মানিতে তার ভরসা হয় না। যাবার বেলায় মনটা বড় খারাপ হইল।

অমুর জ্বর বাড়িয়াছে। দেখিলাম সে বিছানায় শুইয়া। নীচে মেঝের উপর চুপ করিয়া বসিয়া সুবোধ ইংরাজি ছবির কাগজ হইতে ছবি কাটিয়া আটা দিয়া একটা খাতায় আঁটিতেছিল।

বারবেলা বাঁচাইবার জন্য সময়ের অনেক আগে আসিয়াছিলাম। কথা ছিল আমার স্ত্রীকেও সঙ্গে আনিব। কিন্তু অমুর সম্বন্ধে আমার স্ত্রীর মনের কোণে বোধ করি একটুখানি ঈর্ষা ছিল তাই সে আসিবার সময় ছুতা করিল। আমিও পীড়াপীড়ি করিলাম না।

অমু জিজ্ঞাসা করিল, বৌদিদি এলেন না ?

আমি বলিলাম, শরীর ভালো নাই।

অমু একটু নিশ্বাস ফেলিল, আর কিছু বলিল না।

আমার মধ্যে একদিন যেটুকু মাধুর্য্য দেখা দিয়াছিল সেইটিকে আপনার সোনার আলোয় গলাইয়া শরতের আকাশ সেই রোগীর বিছানার উপর বিছাইয়া ছিল। কত কথা আজ উঠিয়া পড়িল। সেই সব অনেক দিনের অতি ছোট কথা আমার আসন্ন সর্ব্বনাশকে ছাড়াইয়া আজ কত বড় হইয়া উঠিল। কারবারের হিসাব ভুলিয়া গেলাম।

ভাই-ফোঁটার খাওয়া খাইলাম। আমার কপালে সেই মরণের

যাত্রী দীর্ঘায়ুকামনার ফোঁটা পরাইয়া আমার পায়ের ধূলা লইল। আমি গোপনে চোখ মুছিলাম।

ঘরে আসিয়া বসিলে সে একটি টিনের বাক্স আমার কাছে আনিয়া রাখিল। বলিল, সুবোধের জন্য এই যা কিছু এতদিন আগ্‌লাইয়া রাখিয়াছি তোমাকে দিলাম, আর সেই সঙ্গে সুবোধকেও তোমার হাতে দিলাম। এখন নিশ্চিন্ত হইয়া মরিতে পারিব।

আমি বলিলাম, অনু, দোহাই তোমার, টাকা আমি লইব না। সুবোধের দেখাশুনার কোনো ত্রুটি হইবে না কিন্তু টাকা আর-কারো কাছে রাখিয়ো।

অনু কহিল, এই টাকা লইবার জন্য কত লোক হাত পাতিয়া বসিয়া আছে। তুমি কি তাদের হাতেই দিতে বল?

আমি চুপ করিয়া রহিলাম। অনু বলিল, একদিন আড়াল হইতে শুনিয়াছি ডাক্তার বলিয়াছে সুবোধের যে রকম শরীরের লক্ষণ ওর বেশি দিন বাঁচার আশা নাই। শুনিয়া অবধি ভয়ে ভয়ে আছি পাছে আমার মরিতে দেরি হয়। আজ অন্তত আশা লইয়া মরিব যে ডাক্তারের কথা ভুল হইতেও পারে। সাত-চল্লিশ হাজার টাকা কোম্পানির কাগজে জমিয়াছে—আরো কিছু এদিকে ওদিকে আছে। ঐ টাকা হইতে সুবোধের পথ্য ও চিকিৎসা ভালো করিয়াই চলিতে পারিবে। আর যদি ভগবান অল্প বয়সেই উহাকে টানিয়া লন তবে এই টাকা উহার নামে একটা কোনো ভালো কাজে লাগাইয়ো।

আমি কহিলাম, অনু আমাকে তুমি যত বিশ্বাস কর আমি নিজেকে তত বিশ্বাস করি না।

শুনিয়া অনু একটুমাত্র হাসিল। আমার মুখে এমন কথা মিথ্যা বিনয়ের মত শোনায়।

বিদায়কালে অনু বাক্স খুলিয়া কোম্পানির কাগজ ও কয়েক কেতা নোট বুঝাইয়া দিল। তার উইলে দেখিলাম লেখা আছে অপুত্রক ও নাবালক অবস্থায় সুবোধের মৃত্যু হইলে আমিই সম্পত্তির উত্তরাধিকারী।

আমি বলিলাম, আমার স্বার্থের সঙ্গে তোমার সম্পত্তি কেন এমন করিয়া জড়াইলে?

অনু কহিল, আমি যে জানি আমার ছেলের স্বার্থে তোমার স্বার্থ কোনোদিন বাধিবে না।

আমি কহিলাম, কোনো মানুষকেই এতটা বিশ্বাস করা কাজের দস্তুর নয়।

অনু কহিল, আমি তোমাকে জানি, ধর্ম্মকে জানি, কাজের দস্তুর বুঝিবার আমার শক্তি নাই।

বাক্সের মধ্যে গহনা ছিল, সেগুলি দেখাইয়া সে বলিল, সুবোধ যদি বাঁচে ও বিবাহ করে তবে বৌমাকে এই গহনা ও আমার আশীর্ব্বাদ দিয়ো। আর এই পান্নার কণ্ঠীটি বৌদিদিকে দিয়া বলিয়ো, আমার মাথার দিব্য, তিনি যেন গ্রহণ করেন।

এই বলিয়া অনু যখন ভূমিষ্ঠ হইয়া আমাকে প্রণাম করিল তার দুই চোখ জলে ভরিয়া উঠিল। উঠিয়া দাঁড়াইয়া তাড়াতাড়ি সে মুখ ফিরাইয়া চলিয়া গেল। এই আমি তার শেষ প্রণাম পাইয়াছি। ইহার দুইদিন পরেই সন্ধ্যার সময় হঠাৎ নিশ্বাস বন্ধ হইয়া তার মৃত্যু হইল—আমাকে খবর দিবার সময় পাইল না।

ভাই-ফোঁটার নিমন্ত্রণ সারিয়া টিনের বাক্স-হাতে গাড়ি হইতে বাড়ির দরজায় যেম্নি নামিলাম দেখি, প্রসন্ন অপেক্ষা করিয়া আছে। জিজ্ঞাসা করিল, দাদা, খবর ভালো ত?

আমি বলিলাম, এ টাকায় কেহ হাত দিতে পারিবে না।

প্রসন্ন কহিল—কিন্তু—

আমি বলিলাম—সে জানিনা—যা হয় তা হোক্, এ টাকা আমার ব্যবসায়ে লাগিবে না।

প্রসন্ন বলিল, তবে তোমার অন্ত্যেষ্টিসৎকারে লাগিবে।

অমুর মৃত্যুর পর সুবোধ আমার বাড়িতে আসিয়া আমার ছেলে নিত্যধনকে সঙ্গী পাইল।

যারা গল্পের বই পড়ে মনে করে মানুষের মনের বড় বড় পরিবর্ত্তন ধীরে ধীরে ঘটে। ঠিক উল্টা। টীকার আগুন ধরিতে সময় লাগে কিন্তু বড় বড় আগুন হুহু করিয়া ধরে। আমি এ কথা যদি বলি যে অতি অল্প সময়ের মধ্যে সুবোধের উপর আমার মনের একটা বিদ্বেষ দেখিতে দেখিতে বাড়িয়া উঠিল তবে সবাই তার বিস্তারিত কৈফিয়ৎ চাহিবে। সুবোধ অনাথ, সে বড় ক্ষীণপ্রাণ, সে দেখিতেও সুন্দর,—সকলের উপরে সুবোধের মা স্বয়ং অমু, কিন্তু তার কথাবার্ত্তা, চলাফেরা, খেলাধূলা সমস্তই যেন আমাকে দিনরাত খোঁচা দিতে লাগিল।

আসল, সময়টা বড় খারাপ পড়িয়াছিল। সুবোধের টাকা কিছুতেই লইব না পণ ছিল অথচ ও-টাকাটা না লইলে নয় এমনি অবস্থা। শেষকালে একদিন মহা বিপদে পড়িয়া কিছু লইলাম। ইহাতে আমার মনের কল এমনি বিগ্‌ড়াইয়া গেল যে সুবোধের

কাছে মুখ-দেখানো আমার দায় হইল। প্রথমটা উহাকে এড়াইতে থাকিলাম তার পর উহার উপরে বিষম রাগিতে আরম্ভ করিলাম।

রাগিবার প্রথম উপলক্ষ্য হইল উহার স্বভাব। আমি নিজে ব্যস্ত-বাগীশ, সব কাজ তড়িঘড়ি করা আমার অভ্যাস। কিন্তু সুবোধের কি-এক-রকমের ভাব, উহাকে প্রশ্ন করিলে হঠাৎ যেন উত্তর করিতেই পারে না—যেখানে সে আছে সেখানে যেন সে নাই, যেন সে আর কোথাও। রাস্তার ধারের জানলার গরাদে ধরিয়া ঘণ্টার পর ঘণ্টা কাটাইয়া দেয়, কি দেখে কি ভাবে তা সেই জানে। আমার এটা অসহ্য বোধ হয়। সুবোধ বহুকাল হইতে রুগ্ন মায়ের কাছে মানুষ—সমবয়সী খেলার সঙ্গী কেউ ছিল না—তাই সে বরাবর আপনার মনকে লইয়াই আপনি খেলা করিয়াছে। এই সব ছেলের মুস্কিল এই যে ইহারা যখন শোক পায় তখন ভালো করিয়া কাঁদিতেও জানে না, শোক ভুলিতেও জানে না। এই জন্যই সুবোধকে ডাকিলে হঠাৎ সাড়া পাওয়া যাইত না এবং কাজ করিতে বলিলে সে ভুলিয়া যাইত। তার জিনিষ-পত্র সে কেবলি হারাইত, তাহা লইয়া বকিলে চুপ করিয়া মুখের দিকে চাহিয়া থাকিত—যেন সেই চাহিয়া থাকাই তার কান্না। আমি বলিতে লাগিলাম, এর দৃষ্টান্ত যে আমার ছেলের পক্ষে বড় খারাপ। আবার মুস্কিল এই যে ইহাকে দেখিয়া অবধি নিত্যর ইহাকে ভারি ভালো লাগিয়াছে—তার প্রকৃতি সম্পূর্ণ অন্য রকম বলিয়াই ইহার প্রতি টানও যেন তার বেশি হইল।

পরের স্বভাব সংশোধন আমার কৌলিক কাজ;—ইহাতে আমার পটুতাও যেমন উৎসাহও তেমনি। সুবোধের স্বভাবটা কর্ম্মপটু নয় বলিয়াই আমি তাকে খুব কষিয়া কাজ করাইতে লাগিলাম। যতবারই

সে ভুল করিত ততবারই নিজেকে দিয়া তার সে ভুল শোধরাইয়া লইতাম। আবার তার আর এক অভ্যাস, সেটা তার মায়েরও ছিল,—সে আপনাকে এবং আপনার চারিদিককে নানারকম করিয়া কল্পনা করিত।

জানলার সাম্‌নেই যে জামরুল গাছ ছিল সেটাকে সে কি-একটা অদ্ভুত নাম দিয়াছিল; স্ত্রীর কাছে শুনিয়াছি একলা দাঁড়াইয়া সেই গাছটার সঙ্গে সে কথা কহিত। বিছানাটাকে মাঠ, আর বালিশগুলাকে গোরুর পাল মনে করিয়া শোবার ঘরে বসিয়া রাখালী করাটা যে কত মিথ্যা ইহা তার নিজের মুখে কবুল করাইবার অনেক চেষ্টা করিয়াছি—সে জবাবই করে না। আমি যতই তাকে শাসন করি আমার কাছে তার ত্রুটি ততই বাড়িয়া চলে। আমাকে দেখিলেই সে থতমত খাইয়া যায়—আমার মুখের সাদা কথাটাও সে বুঝিতে পারে না।

আর কিছু নয়, হৃদয় যদি রাগ করিতে সুরু করে, এবং নিজেকে সামলাইবার মত বাহির হইতে কোনো ধাক্কা যদি সে না পায় তবে রাগটা আপনাকে আপনিই বাড়াইয়া চলে,—নূতন কারণের অপেক্ষা রাখে না। যদি এমন মানুষকে দু' চারবার মূর্খ বলি যার জবাব দিবার সাধ্য নাই তবে সেই দু' চারবার বলাটাই পঞ্চমবারকার বলাটাকে সৃষ্টি করে,—কোনো উপকরণের দরকার হয় না। সুবোধের উপর কেবলি বিরক্ত হইয়া ওঠা আমার মনের এম্‌নি অভ্যাস হইয়াছিল যে সেটা ত্যাগ করা আমার সাধ্যই ছিল না।

এমনি করিয়া পাঁচ বছর কাটিল। সুবোধের বয়স যখন বারো তখন তার কোম্পানির কাগজ এবং গহনাপত্র গলিয়া গিয়া আমার হিসাবের খাতার গোটাকতক কালীর অঙ্কে পরিণত হইল।

মনকে বুঝাইলাম, অনু ত উইলে আমাকেই টাকা দিয়াছে। মাঝখানে সুবোধ আছে বটে কিন্তু ও ত ছায়া, নাই বলিলেই হয়। যে টাকাটা নিশ্চয়ই পাইব সেটাকে আগেভাগে খরচ করিলে অধর্ম্ম হয় না।

অল্পবয়স হইতেই আমার বাতের ব্যামো ছিল। কিছু দিন হইতে সেইটে অত্যন্ত বাড়িয়া উঠিয়াছে। যারা কাজের লোক তাদের স্থির করিয়া রাখিলে তারা চারিদিকের সমস্ত লোককে অস্থির করিয়া তোলে। সে কয়দিন আমার স্ত্রী, আমার ছেলে, সুবোধ, বাড়ির চাকরবাকর কারো শান্তি ছিল না।

এদিকে আমার পরিচিত যে কয়জন বিধবা আমার কাছে টাকা রাখিয়াছিল কয়েক মাস তাদের সুদ বন্ধ। পূর্ব্বে এমন কখনো ঘটিতে দিই নাই। এইজন্য তারা উদ্বিগ্ন হইয়া আমাকে তাগিদ করিতেছে। আমি প্রসন্নকে তাগিদ করি, সে কেবলি দিন ফিরায়। অবশেষে যে দিন নিশ্চিত দিবার কথা সে দিন সকাল হইতে পাওনাদাররা বসিয়া আছে, প্রসন্নর দেখা নাই।

নিত্যকে বলিলাম, সুবোধকে ডাকিয়া দাও।

সে বলিল, সুবোধ শুইয়া আছে।

আমি মহা রাগিয়া বলিলাম, শুইয়া আছে? এখন বেলা এগারোটা, এখন সে শুইয়া আছে?

সুবোধ ভয়ে ভয়ে আসিয়া উপস্থিত হইল। আমি বলিলাম, প্রসন্নকে যেখানে পাও ডাকিয়া আনো।

সর্ব্বদা আমার ফাইফরমাস খাটিয়া সুবোধ এ সকল কাজে পাকা হইয়াছিল। কাকে কোথায় সন্ধান করিতে হইবে সমস্তই তার জানা।

বেলা একটা হইল, দুটা হইল, তিনটা হইল, সুবোধ আর ফেরে না। এদিকে যারা ধন্না দিয়া বসিয়া আছে তাদের ভাষার তাপ এবং বেগ বাড়িয়া উঠিতে লাগিল। কোনোমতেই সুবোধটার গড়িমসি চাল ঘুচাইতে পারিলাম না। যত দিন যাইতেছে ততই তার ঢিলামি আরো যেন বাড়িয়া উঠিতেছে। আজকাল সে বসিতে পারিলে উঠিতে চায় না, নড়িতে-চড়িতে তার সাতদিন লাগে। এক একদিন দেখি বিকালে পাঁচটার সময়েও সে বিছানায় গড়াইতেছে—সকালে তাকে বিছানা হইতে জোর করিয়া উঠাইয়া দিতে হয়—চলিবার সময়ে যেন পায়ে পায়ে জড়াইয়া চলে। আমি সুবোধকে বলিতাম, জন্ম-কুঁড়ে, কুঁড়েমির মহামহোপাধ্যায়। সে লজ্জিত হইয়া চুপ করিয়া থাকিত। একদিন তাকে বলিয়াছিলাম, বল্ দেখি প্রশান্ত মহাসাগরের পরে কোন্ মহাসাগর? যখন সে জবাব দিতে পারিল না আমি বলিলাম, সে হচ্চে তুমি, আলস্য-মহাসাগর।—পারৎপক্ষে সুবোধ কোনোদিন আমার কাছে কাঁদে না কিন্তু সেদিন তার চোখ দিয়া ঝরঝর করিয়া জল পড়িতে লাগিল। সে মার গালি সব সহিতে পারিত কিন্তু বিদ্রূপ তার মর্ম্মে গিয়া বাজিত।

বেলা গেল—রাত হইল। ঘরে কেহ বাতি দিল না। আমি ডাকাডাকি করিলাম, কেহ সাড়া দিল না। বাড়িসুদ্ধ সকলের উপর আমার রাগ হইল। তার পরে হঠাৎ আমার সন্দেহ হইল হয় ত প্রসন্ন সুদের টাকা সুবোধের হাতে দিয়াছে—সুবোধ তাই লইয়া পালাইয়াছে। আমার ঘরে সুবোধের যে আরাম ছিল না সে আমি জানিতাম। ছেলেবেলা হইতে আরাম জিনিষটাকে অন্যায় বলিয়াই জানি বিশেষত ছোট ছেলের পক্ষে। তাই এ সম্বন্ধে আমার মনে কোনো পরিতাপ

ছিল না। কিন্তু তাই বলিয়া সুবোধ যে টাকা লইয়া পালাইয়া যাইতে পারে ইহা চিন্তা করিয়া আমি তাকে কপট অকৃতজ্ঞ বলিয়া মনে মনে গালি দিতে লাগিলাম। এই বয়সেই চুরি আরম্ভ করিল ইহার গতি কি হইবে? আমার কাছে থাকিয়া, আমাদের বাড়িতে বাস করিয়াও ইহার এমন শিক্ষা হইল কি করিয়া? সুবোধ যে টাকা চুরি করিয়া পালাইয়াছে এ সম্বন্ধে আমার মনে কোনো সন্দেহ রহিল না। ইচ্ছা হইল পশ্চাতে ছুটিয়া তাকে যেখানে পাই ধরিয়া আনি, এবং আপাদ-মস্তক একবার কষিয়া প্রহার করি।

এমন সময়ে আমার অন্ধকার ঘরে সুবোধ আসিয়া প্রবেশ করিল। তখন আমার এমন রাগ হইয়াছে যে চেষ্টা করিয়াও আমার কণ্ঠ দিয়া কথা বাহির হইল না। সুবোধ বলিল, টাকা পাই নাই।

আমি ত সুবোধকে টাকা আনিতে বলি নাই তবে সে কেন বলিল টাকা পাই নাই। নিশ্চয় টাকা পাইয়া চুরি করিয়াছে,—কোথাও লুকাইয়াছে। এই সমস্ত ভালোমানুষ ছেলেরাই মিট্‌মিটে সয়তান। আমি বহুকষ্টে কণ্ঠ পরিষ্কার করিয়া বলিলাম, টাকা বাহির করিয়া দে!

সেও উদ্ধত হইয়া বলিল, না, দিব না, তুমি কি করিতে পার কর!

আমি আর কিছুতেই আপনাকে সামলাইতে পারিলাম না। হাতের কাছে লাঠি ছিল, সজোরে তার মাথা লক্ষ্য করিয়া মারিলাম। সে আছাড় খাইয়া পড়িয়া গেল। তখন আমার ভয় হইল। নাম ধরিয়া ডাকিলাম, সে সাড়া দিল না। কাছে গিয়া যে দেখিব আমার সে শক্তি রহিল না। কোনোমতেই উঠিতে পারিলাম না। হাৎড়াইতে গিয়া দেখি জাজিম ভিজিয়া গেছে। এ যে রক্ত!—ক্রমে রক্ত-ব্যাপ্ত

হইতে লাগিল—ক্রমে আমি যেখানে ছিলাম তার চারিদিক রক্তে ভিজিয়া উঠিল। আমার খোলা-জানলার 'বাহির হইতে সন্ধ্যাতারা দেখা যাইতেছিল; আমি তাড়াতাড়ি চোখ ফিরাইয়া লইলাম;—আমার হঠাৎ কেমন মনে হইল সন্ধ্যাতারাটি ভাই-ফোঁটার সেই চন্দনের ফোঁটা। সুবোধের উপর আমার এতদিনকার যে অন্যায় বিদ্বেষ ছিল সে কোথায় একমুহূর্ত্তে ছিন্ন হইয়া গেল। সে যে অনুর হৃদয়ের ধন—মায়ের কোল হইতে ভ্রষ্ট হইয়া সে যে আমার হৃদয়ে পথ খুঁজিতে আসিয়াছিল। আমি এ কি করিলাম, এ কি করিলাম,—ভগবান আমাকে এ কি বুদ্ধি দিলে! আমার টাকার কি দরকার ছিল—আমার সমস্ত কারবার ভাসাইয়া দিয়া সংসারে কেবল এই রুগ্ন বালকটির কাছে যদি ধর্ম্ম রাখিতাম তাহা হইলে যে আমি রক্ষা পাইতাম।

ক্রমে ভয় হইতে লাগিল পাছে কেহ আসিয়া পড়ে, পাছে ধরা পড়ি। প্রাণপণে ইচ্ছা করিতে লাগিলাম, কেহ যেন না আসে, আলো যেন না আনে—এই অন্ধকার যেন মুহূর্ত্তের জন্য না ঘোচে, যেন কাল সূর্য্য না ওঠে, যেন বিশ্বসংসার একেবারে সম্পূর্ণ মিথ্যা হইয়া এমনিতর নিবিড় কালো হইয়া আমাকে আর এই ছেলেটিকে চির-দিন ঢাকিয়া রাখে।

পায়ের শব্দ শুনিলাম। মনে হইল কেমন করিয়া পুলিস খবর পাইয়াছে। কি মিথ্যা কৈফিয়ৎ দিব তাড়াতাড়ি সেইটে ভাবিয়া লইতে চেষ্টা করিলাম কিন্তু মন একেবারেই ভাবিতে পারিল না।

ধড়াস্ করিয়া দরজাটা পড়িল, ঘরে কে প্রবেশ করিল।

আমি আপাদমস্তক চমকিয়া উঠিলাম। দেখিলাম তখনো রৌদ্র

আছে। ঘুমাইয়া পড়িয়াছিলাম; সুবোধ ঘরে ঢুকিতেই আমার ঘুম ভাঙিয়াছে।

সুবোধ হাটখোলা বড়বাজার বেলেঘাটা প্রভৃতি যেখানে যেখানে প্রসন্নর দেখা পাইবার সম্ভাবনা ছিল সমস্ত দিন ধরিয়া সব জায়গায় খুঁজিয়াছে। যে করিয়াই হোক তাহাকে যে আনিতে পারে নাই এই অপরাধের ভয়ে তার মুখ ম্লান হইয়া গিয়াছিল। এত দিন পরে দেখিলাম, কি সুন্দর তার মুখখানি, কি করুণায় ভরা তার দুইটি চোখ!

আমি বলিলাম, আয় বাবা সুবোধ, আয় আমার কোলে আয়!

সে আমার কথা বুঝিতেই পারিল না—ভাবিল আমি বিদ্রূপ করিতেছি। ফ্যাল্‌ফ্যাল্ করিয়া আমার মুখের দিকে তাকাইয়া রহিল এবং খানিকক্ষণ দাঁড়াইয়াই মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িয়া গেল।

মুহূর্ত্তে আমার বাতের পঙ্গুতা কোথায় চলিয়া গেল। আমি ছুটিয়া গিয়া কোলে করিয়া তাহাকে বিছানায় আনিয়া ফেলিলাম। কুঁজায় জল ছিল, তার মুখে মাথায় ছিটা দিয়া কিছুতেই তার চৈতন্য হইল না। ডাক্তার ডাকিতে পাঠাইলাম।

ডাক্তার আসিয়া তার অবস্থা দেখিয়া বিস্মিত হইলেন। বলিলেন, এ যে একেবারে ক্লান্তির চরমসীমায় আসিয়াছে। কি করিয়া এমন হওয়া সম্ভব হইল?

আমি বলিলাম, আজ কোনো কারণে সমস্ত দিন উহাকে পরিশ্রম করিতে হইয়াছে।

তিনি বলিলেন, এ ত একদিনের কাজ নয়। বোধ হয় দীর্ঘকাল ধরিয়া ইহার ক্ষয় চলিতেছিল, কেহ লক্ষ্য করে নাই।

উত্তেজক ঔষধ ও পথ্য দিয়া ডাক্তার তার চৈতন্যসাধন

করিয়া চলিয়া গেলেন। বলিলেন, বহু যত্নে যদি দৈবাৎ বাঁচিয়া যায় ত বাঁচিবে কিন্তু ইহার শরীরে প্রাণশক্তি নিঃশেষ হইয়া গেছে। বোধ করি শেষ-কয়েক-দিন এ ছেলে কেবলমাত্র মনের জোরে চলাফেরা করিয়াছে।

আমি আমার রোগ ভুলিয়া গেলাম। সুবোধকে আমার বিছানায় শোয়াইয়া দিনরাত তার সেবা করিতে লাগিলাম। ডাক্তারের যে ফি দিব এমন টাকা আমার ঘরে নাই। স্ত্রীর গহনার বাক্স খুলিলাম। সেই পান্নার কণ্ঠীটি তুলিয়া লইয়া স্ত্রীকে দিয়া বলিলাম, এইটি তুমি রাখ।—বাকি সবগুলি লইয়া, বন্ধক দিয়া টাকা লইয়া আসিলাম।

কিন্তু টাকায় ত মানুষ বাঁচে না। উহার প্রাণ যে আমি এতদিন ধরিয়া দলিয়া নিঃশেষ করিয়া দিয়াছি। যে স্নেহের অন্ন হইতে উহাকে দিনের পর দিন বঞ্চিত করিয়া রাখিয়াছি আজ যখন তাহা হৃদয়-ভরিয়া তাহাকে আনিয়া দিলাম তখন সে আর তাহা গ্রহণ করিতে পারিল না। শূন্য হাতে তার মার কাছে সে ফিরিয়া গেল।

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

পাড়ি

মস্ত সাগর দিল পাড়ি গহনরাত্রিকালে
ঐ যে আমার নেয়ে।
ঝড় বয়েছে, ঝড়ের হাওয়া লাগিয়ে দিয়ে পালে
আস্‌চে তরী বেয়ে।
কালো রাতের কালী-ঢালা ভয়ের বিষম বিষে
আকাশ যেন মূর্চ্ছি পড়ে সাগর সাথে মিশে,
উতল ঢেউয়ের দল ক্ষেপেছে, না পায় তারা দিশে,
উধাও চলে ধেয়ে।
হেনকালে এ দুর্দ্দিনে ভাবল মনে কি সে
কূল-ছাড়া মোর নেয়ে?

এমন রাতে উদাস হয়ে কেমন অভিসারে
আসে আমার নেয়ে ?
শাদা পালের চমক দিয়ে নিবিড় অন্ধকারে
আস্‌চে তরী বেয়ে।
কোন্ ঘাটে যে ঠেক্‌বে এসে কে জানে তার পাতী,
পথহারা কোন্ পথ দিয়ে সে আস্‌বে রাতারাতী,
কোন্ অচেনা আঙিনাতে তারি পূজার বাতি
রয়েছে পথ চেয়ে ?
অগৌরবার বাড়িয়ে গরব করবে আপন সাথী
বিরহী মোর নেয়ে।

এই তুফানে এই তিমিরে খোঁজে কেমন খোঁজা
বিবাগী মোর নেয়ে ?
নাহি জানি পূর্ণ করে' কোন্ রতনের বোঝা
আস্‌চে তরী বেয়ে ?
নহে নহে, নাইক মাণিক, নাই রতনের ভার,
একটি ফুলের গুচ্ছ আছে রজনীগন্ধার,
সেইটি হাতে আঁধার রাতে সাগর হবে পার
আনমনে গান গেয়ে।
কার গলাতে নবীন প্রাতে পরিয়ে দেবে হার
নবীন আমার নেয়ে ?

সে থাকে এক পথের পাশে, অদিনে যার তরে
বাহির হল নেয়ে।
তারি লাগি পাড়ি দিয়ে সবার অগোচরে
আস্‌চে তরী বেয়ে।
রুক্ষ অলক উড়ে পড়ে, সিক্ত-পলক আঁখি,
ভাঙা ভিতের ফাঁক দিয়ে তার বাতাস চলে হাঁকি,
দীপের আলো বাদল-বায়ে কাঁপচে থাকি থাকি
ছায়াতে ঘর ছেয়ে।
তোমরা যাহার নাম জান না তাহারি নাম ডাকি
ঐ যে আসে নেয়ে।

অনেক দেরী হয়ে গেছে বাহির হল কবে
উন্মনা মোর নেয়ে।
এখনো রাত হয়নি প্রভাত, অনেক দেরী হবে
আস্‌তে তরী বেয়ে।
বাজ্‌বেনাকো তুরী ভেরী, জান্‌বেনাকো কেহ,
কেবল যাবে আঁধার কেটে, আলোয় ভরবে গেহ,
দৈন্য যে তার ধন্য হবে, পুণ্য হবে দেহ
পুলক পরশ পেয়ে।
নীরবে তার চিরদিনের ঘুচিবে সন্দেহ
কূলে আস্‌বে নেয়ে॥

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

সমাজের জীবন

ব্যক্তিগতভাবে জীবনসম্বন্ধে আমরা অনেক কথা বলিয়া থাকি। কিন্তু সমাজেরও যে একটি জীবন আছে একথা আমাদের অনেকেরই বড়-একটা মনে থাকে না। সমাজ যে একটা শৃঙ্খল বা পিঞ্জর-বিশেষ তাহা আমরা সকলেই জানি, কেননা আমরা সকলেই সেই শৃঙ্খল বা পিঞ্জরে আবদ্ধ। মাঝে মাঝে তোমার আমার সেই শৃঙ্খল বা পিঞ্জর ভাঙিবার ইচ্ছা হইতে পারে। সে ইচ্ছা স্বাভাবিক এবং বোধগম্য। কিন্তু সমাজের অন্তরেও যে ঐরূপ কোনও ইচ্ছার সঞ্চার হইতে পারে ইহা আমাদের অনেকেরই পক্ষে এতই অজ্ঞাত যে, সে সত্য আমাদের কল্পনারও অগম্য।

শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরিয়া আমরা এই বিশ্বসংসারকে একটা গণ্ডীর মধ্যে ক্রমশঃ টানিয়া আনিতে চেষ্টা করিতেছি। যাহা-কিছু হইয়াছে, বা হইতেছে, বা হইবে—সমস্তই গণ্ডীর মধ্যে। এই ভাবটি আমাদের মজ্জায় মজ্জায় যে প্রবেশ করিয়াছে, তাহা সর্ব্ববিষয়ে পরিলক্ষিত হয়। সূর্য্য চন্দ্র ইত্যাদি ঘুরিতেছে, কিন্তু নিজের নিজের বিধিনির্দ্দিষ্ট পথ ধরিয়া। সমুদ্র ও বেলাভূমির মধ্যে ঘাত-প্রতিঘাত চলিতেছে, কিন্তু তাহাদেরও একটি সন্ধিস্থল আছে। নদী বহিয়া চলিয়াছে, কিন্তু তাহারও একটি খাত আছে। এগুলিকে আমরা বলি প্রকৃতির নিয়ম। তুমি ভাল কবিতা লিখিতে পার, কিন্তু কবিতা-লিখিবার কতকগুলি নিয়ম আছে, তাহার ব্যতিক্রম করিলে চলিবে না। তুমি ভাল ছবি আঁকিতে পার, তাহারও নিয়মাদি আছে; সেগুলি তোমার শিরোধার্য্য। তোমার ইচ্ছা দানধ্যান করিবে, ধর্ম্মে মন দিবে,

বিশ্বের নিগূঢ় চিন্তায় আত্মহারা হইবে; সে সম্বন্ধেও ঋষি-প্রণীত ব্যবস্থাদি আছে। যাহা কিছু করিবে, সেই ব্যবস্থা-অনুসারে করিবে। ফল-কথা—বিশ্বসংসার, মানবজীবন, ধর্ম্ম, আচার, ব্যবহার, সমস্তই নিয়মের গণ্ডীর মধ্যে অবস্থিত। গণ্ডীর পরপারে যাইবার কাহারও অধিকার নাই,—এমন কি গণ্ডীর সীমা বাড়াইবার বা পরিবর্ত্তন করিবার ইচ্ছা ধৃষ্টতামাত্র।

অনেকের মতে মানব-সমাজ উপরোক্ত একটি বৃহৎ গণ্ডীবিশেষ। ব্যক্তিমাত্রেরই ইচ্ছা—নূতন দেখিব, শুনিব, করিব ইত্যাদি। সমাজ সেই ইচ্ছার স্বাভাবিক প্রতিদ্বন্দ্বী। তুমি আমি আজ আছি, কাল কোথায় থাকিব ঠিকানা নাই। কিন্তু সমাজ চিরন্তন। কাজেই তোমার আমার একটা নূতন-কিছু করিয়া, একটা ওলটপালট করিবার বা গোলমাল বাধাইবার কি অধিকার আছে? যে জমিদার সেই জমির মর্ম্ম বোঝে। দু'দিনের মেয়াদে আবাদ করিতে যে লোক জমির জমা লইয়াছে, তাহার প্রাণ কি জমির জন্য কাঁদে? তাহার ইচ্ছা কোনো-মতে দু'পয়সা করিয়া লয়। তার পর যা হয় তার ভাবনা, সেই জমিতে যার চিরস্থায়ী স্বত্বস্বামিত্ব আছে, সেই দুনিয়ার মালিক ভাবিবে।

আমাদের দেশে Hobbes-এর Leviathanএর ন্যায় কোন পুস্তক লিখিত হইয়াছে কি না জানি না। Hobbes Stateকে Leviathan-পদে অভিষিক্ত করিয়াছেন। Leviathan জন্তুটি কি তাহা জানি না, বোধ হয় অজগরের জুড়ি কোনও প্রকাণ্ড সর্ব্বগ্রাসী জীব হইবে। আমরাও এদেশে সমাজকে একটি মহামহিম Leviathan করিয়া তুলিয়াছি। তাহার ফল হইয়াছে, সমাজের পূর্ব্বে যে জীবন ছিল, তাহা এক্ষণে বিনষ্ট হইয়াছে। সমাজ মরিয়া পুড়িয়া ছাই হইয়া

গিয়াছে, কিন্তু তৎপ্রতিষ্ঠিত ধর্ম্ম, রীতিনীতি, আচারব্যবহার, ক্রিয়াকলাপ, আজও প্রেতযোনির ন্যায় আমাদের চতুষ্পার্শে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। জীবন্ত লোকের সংসর্গে আশা, বিশ্বাস ও সাহসের উদ্রেক হয়, আর মৃত ব্যক্তির সংস্পর্শে হয় ভয় ও উৎকণ্ঠা। সমাজের সংস্পর্শে আমাদের আশা, বিশ্বাস ও সাহস দূরে পলায়ন করিয়াছে; কেবল আছে ভয়, এবং কখন রাত্রি প্রভাত হইবে সেই উৎকণ্ঠা।

সমাজকে আবার সজীব করিতে হইলে, তাহাকে তাহার পুরাতন স্বাধীনতা ফিরাইয়া দিতে হইবে। এমন কি তাহাকে পূর্ব্ববৎ যথেচ্ছা-চারিতার শক্তি দিতে হইবে। যথেচ্ছাচারিতা শব্দ শুনিয়া কানে হাত দিবেন না। যে দেশের ইতিহাস আছে সে দেশে ইতিহাস সাক্ষ্য দেয় যে, এক-যুগের যথেচ্ছাচারিতা, সমাজের অগ্নি-পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া, পরযুগের সদাচার বলিয়া গ্রাহ্য হয়। বর্ত্তমানে সমাজ আমাদিগকে সম্পূর্ণ বাঁধিতে গিয়া নিজে বাঁধা পড়িয়াছে। সেই বন্ধন হইতে তাহাকে ছাড়াইতে হইবে। যে নিয়মাবলীর দ্বারা সমাজ আমাদিগকে এতদিন শাসন করিয়া আসিয়াছে, সে এখন নিজেই সেই নিয়মাবলীর শাসনে নিপীড়িত হইতেছে। সেই শাসন হইতে তাহাকে মুক্ত করিতে হইবে। ফলকথা, সমাজকে স্বাধীন করিতে হইবে। এস্থলে অনেকে হয় ত বলিবেন,—সমাজ স্বাধীন হইলে চলিবে কেন? ব্যক্তিগত স্বাধীনতা বা যথেচ্ছাচারিতার দমনের জন্যই সমাজের সৃষ্টি। তুমি আমি যদি কিছু বাড়াবাড়ি বা তাড়াতাড়ি করিতে যাই, অমনি সমাজ সম্মুখে আসিয়া দাঁড়ায় ও বাধা দেয়। শাসন করিবার অধিকার একমাত্র সমাজেরই আছে—সুতরাং নির্ব্বিচারে শাসিত হওয়াই ব্যক্তিমাত্রেরই কর্ত্তব্য। যদি সমাজকে স্বাধীনতা

দেওয়া হয়, সে যখন নিজের সীমা অতিক্রম করিবে, তাহাকে কে সামলাইবে? কাজেই সমাজকে স্বাধীনতা দিলে চলিবে না। গুটিপোকা যেমন নিজের গুটিতে আবদ্ধ, সমাজও সেইরূপ নিজের নিয়মে আবদ্ধ, এবং চিরকাল আবদ্ধ থাকিবে।

যুক্তিতর্ক অনুসারে এ কথার কোনো উত্তর আছে কি না জানি না। স্বাধীনতা ভাল বটে, কিন্তু তাহারও একটি সীমা আছে। সেই সীমা অতিক্রম করিলে স্বাধীনতা স্বেচ্ছাচারিতায় পরিণত হয়, আর তখন সমাজ আসিয়া তাহার প্রতীকার করে। কিন্তু সমাজ যদি প্রকৃত স্বাধীনতার সীমা লঙ্ঘন করিয়া উচ্ছৃঙ্খল হইয়া পড়ে, তখন তাহার প্রতীকার কে করিবে? ইহা অবশ্য একটি বড়ই দুরূহ প্রশ্ন, এবং ইহার কোন যুক্তিযুক্ত উত্তর আছে কি না জানি না। তবে এখন কথা এই—আমরা কি চাই? চারিদিক আটঘাট-বাঁধা একটি দীর্ঘিকা? না দুকূল ভাসাইয়া চলিয়াছে, জল থইথই করিতেছে, এমন একটি ভরা গাঙ? যাঁহারা প্রথমটি চান, তাঁহাদিগের সম্বন্ধে আমাদের কিছুই বলিবার নাই। কিন্তু আর দশজনে চান একটি পর্ব্বত-বাহিনী স্রোতস্বিনী, যাহার গতি আছে লীলা আছে, এবং যাহার মাঝে মাঝে দুকূল ভাসাইয়া পার্শ্বস্থ গ্রাম জনপদ প্লাবিত করিবার শক্তি আছে। এক-কথায় যাহার প্রাণও আছে বানও আছে। আমি হয় ত নদীর ঢেউ দেখিলে ভয় পাই। কিন্তু আর দশজনে হয় ত সেই ঢেউয়ে গা ঢালিয়া দিয়া মরিয়া-হইয়া ভাসিয়া যাইতে চায়। আপনি হয়ত বলিবেন, কি পাগলামি! তাহার উত্তর "ভিন্নরুচির্হি লোকা"। এই দুয়ের মধ্যে কোন্ পক্ষ ঠিক, এই ত সমস্যা।

শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র চক্রবর্ত্তী।

মন্তব্য

শ্রীযুক্ত প্রফুল্লচন্দ্র চক্রবর্ত্তীমহাশয় "সমাজের জীবন" প্রবন্ধে যে সমস্যা উত্থাপন করিয়াছেন তাহার মীমাংসা তর্কশাস্ত্র খুঁজিয়া পায় না, কিন্তু জীবন নিজের বলে সে মীমাংসা নিজেই করিয়া লয়। সামাজিক জীবন লজিক অনুসরণ করে না—কিন্তু লজিক জীবনকে অনুসরণ করে। সমাজে নবজীবনের লক্ষণ তার্কিকের বিচার-বুদ্ধিকে অতিক্রম করিয়া দেখা দেয়। ইহার প্রমাণ সকল দেশে, সকল কালে পাওয়া যায়। লজিকের উদ্দেশ্য জানা-পদার্থকে মনের ঘরে সাজাইয়া রাখা—কিন্তু জীবনের স্ফূর্ত্তির সঙ্গে কিছু-না-কিছু অপ্রত্যাশিত নূতনত্ব থাকেই থাকে। এই কারণেই লজিক জীবনের কাছে হার মানে। সমাজ যেমন জীবনকে একটি গণ্ডীর মধ্যে আবদ্ধ রাখিতে চেষ্টা করে, তেমনি মানুষের মনকেও একটি গণ্ডীর মধ্যে রাখিতে চেষ্টা করে। সামাজিক-জীবন তাই নিয়ত সামাজিক-মন বলিয়া একটি পদার্থ গড়িয়া তুলিতে চায়। ব্যবহারিক-জীবন ব্যবহারিক-মন তৈরি করে। কোনও সমাজের সকল লোকের মন যদি কেবলমাত্র ব্যবহারিক মন হইত, তাহা হইলে অবশ্য স্বরচিত গণ্ডীর মধ্যেই সামাজিক জীবনের সমাধি হইত, কেননা একদিকে যেমন সামাজিক-জীবন সামাজিক-মনকে সীমাবদ্ধ করিতে চায়, অপরদিকে সামাজিক-মনও সামাজিক-জীবনকে তদ্রূপ সীমাবদ্ধ করিতে চায়। কে কাহাকে সঙ্কীর্ণতর করিতে পারে, এই লইয়া উভয়ের ভিতর রেষারেষি চলে। কিন্তু জীবন্ত সমাজ যেমন নিজের ব্যবহারিক গণ্ডী অতিক্রম করে—জীবন্ত মনও তেমনি তাহার ব্যবহারিক গণ্ডী অতিক্রম করে। সমাজ যখন উন্নতির পথে যাত্রা করে, তখন সমাজের মনের

এক-অংশ পিছনে পড়িয়া থাকে, আর-এক অংশ বহুদূর অগ্রসর হইয়া যায়। সমাজ লইয়া যাহা-কিছু তর্ক তাহা এই দুই পক্ষের মধ্যেই হইয়া থাকে। কিন্তু যতক্ষণ তর্ক চলিতে থাকে, ততক্ষণ সমাজের জীবন অলক্ষিত ভাবে নিজের পথে অগ্রসর হয়। জীবন্ত সমাজের জীবন্ত সাহিত্যে এই দুই প্রকারের মনই প্রতিফলিত হয়। এদিকে সমাজের জীবন, যাহাদের মন অগ্রগামী ক্রমে তাহাদের নিকটে আসে, আর যাহাদের মন পশ্চাতে পড়িয়া আছে তাহাদের নিকট হইতে আরও দূরে চলিয়া যায়। তাহার কারণ বহুলোকের মনে যা অস্পষ্ট আকারে রহিয়াছে, তাহাই আশার ভাষায় স্পষ্ট ও সাকার হইয়া উঠে। আর যে সমাজ মৃত্যুর পথে যাত্রা করে, স্মৃতির ভাষাতেই সে নিজেকে প্রকাশ করে।

সম্পাদক।

অনার্য্য বাঙ্গালী

বাঙ্গালী যে অনার্য্য সে বিষয়ে আর সন্দেহ করা চলে না। বছর-দশেক আগে যখন রিজলি-সাহেবের কেতাব বার হয়েছিল, তখন আমাদের অনেকের মন বিগড়ে গিয়েছিল—এবং কথাটা চাপা দেবার অনেক চেষ্টাও যে না হয়েছিল তা নয়। কিন্তু কথাটাকে আর তো চাপা দেওয়া যায় না। সেদিন সাহিত্য-সম্মিলনে পণ্ডিত হরপ্রসাদ শাস্ত্রীমহাশয় তো স্পষ্টই বলে দিলেন যে, যদিওবা আমরা আর্য্য হয়ে থাকি, তবু অনার্য্য আমরা তার পূর্ব্বে এবং তার চেয়ে বেশি। খোট্টা, মারাঠা, ইংরেজ, জার্ম্মান আমাদের ভাই হ'লেও অনেক দূর-সম্পর্কের ভাই; তেলেগু, তামিল, চীনে, বর্ম্মান আমাদের নিকট-সম্পর্কীয় ভাই।

কিন্তু অভিমানের কথা এর মধ্যে কিছু নেই—বরং অনেকটা আশার কথা, অনেকটা সোয়াস্তির কথা আছে। এতকাল আমরা আর্য্য হ'বার বৃথা-চেষ্টায় কাটিয়েছি। আর্য্য-সভ্যতা যে আমাদের সভ্যতা, আর্য্য-ইতিহাস যে আমাদের ইতিহাস, আর্য্য-ধর্ম্ম যে আমাদেরই সহজ ধর্ম্ম, এই মিথ্যা কথার প্রতিষ্ঠা করতে গিয়ে আমাদের ঢের ভুগতে হয়েছে। আমাদের ধর্ম্ম যে অন্যরূপ, আমাদের স্বভাব যে খোট্টা, মারাঠা, জার্ম্মান, ইংরেজদের স্বভাব হতে ঢের স্বতন্ত্র—এর মধ্যে অনেকটা আরাম এবং শান্তি আছে।

আর্য্যদের নীতিশাস্ত্র, আর্য্যদের system of values বা বিবেক-বুদ্ধি দিয়ে নিজেদের পরীক্ষা করবার আর আমাদের দরকার নেই, আর্য্যদের কষ্টিপাথরে আর আমাদের আছাড়-খেয়ে মরবার জন্য ব্যস্ত হবার প্রয়োজন নেই;—এতে যে কত লাভ, তা আর্য্য এবং অনার্য্যের স্বভাব একটু বিশ্লেষণ না করলে বোঝা যাবে না।

আর্য্যদের সম্বন্ধে প্রথম কথা এবং শেষ কথা হচ্চে এই যে, সংসারে আর্য্যদেরই জিৎ। এ কথাটা আর-এক-রকম করে সাধারণতঃ আমাদের কাছে খাড়া করা হয়। সে হচ্চে এই যে, আর্য্যদের চরিত্র-বল বা character আছে, আমাদের নেই। এই চরিত্র-বল নিয়ে আর্য্যদের চীৎকারের বিরাম নেই, শ্রান্তি নেই।

স্পষ্টবক্তা বন্ধুদের কাছ থেকে তো জন্মে অবধি শুনে আসছি—বাঙ্গালীর character নেই। কথাটা খুব শক্ত বলেই বোধ হ'ত, এবং এ কলঙ্ক যে অত্যন্ত অন্যায় এবং মিথ্যা, তাই প্রমাণ করবার জন্য আমরা আমাদের বিচার-কর্ত্তাদের অমুক অমুক আর অমুক বাঙ্গালীর জীবন-চরিত আলোচনা করতে বরাবর ব'লে এসেছি। কিন্তু এখন এই চরিত্র-বল ব্যাপারটা কি, তা একটু খুঁটিয়ে দেখবার সময় এসেছে।

চরিত্র বা character হচ্চে মানুষের সেই জিনিষ, যা হ'তে মানুষটাকে এক-নিঃশ্বাসে পড়ে' ফেলা যায়। অমুক-অবস্থায় পড়লে অমুক-লোকটা কি করবে, তা আগে থেকে বা হ'তে বোঝা যায়—তারই নাম হচ্চে character। এই characterএর সঙ্গে মানুষের বিদ্যা, বুদ্ধি, জ্ঞান, দেমাক, অহঙ্কার ইত্যাদির কোনও

সম্বন্ধ নেই—অর্থাৎ বুদ্ধি কি বিদ্যা থাকলেই যে character থাকবে, তা বলা যায় না।

এই character জিনিষটার মূল্য সমাজের কাছে খুব বেশি। কারণ সমাজের পক্ষে যা সুবিধাজনক তাই মূল্যবান। প্রত্যেক মানুষের গতিবিধি যদি আগে থেকে নির্ণয় করতে পারা যায়, তা হ'লে সমাজের ঢের গোলমাল বেঁচে যায়। কাজেই character জিনিষটা সামাজিক গুণের মধ্যে অগ্রগণ্য।

কিন্তু ব্যাপারটার আর-এক দিক আছে। জীবিত ও মৃতের মধ্যে প্রভেদ হচ্ছে এই যে, মৃত বস্তুর character সম্বন্ধে কারও কোনও সন্দেহ থাকতে পারে না। একটা যন্ত্রের চলন যে কোন্-দিকে হ'বে, তা বুঝতে বেশি কষ্ট হয় না। পরমাণুর সমষ্টি এবং জীবাণুর সমষ্টির মধ্যে তফাৎ হচ্চে এই যে, জড়-সমষ্টির পূর্ব্ব-ইতিহাস যদি জানা থাকে, তাহ'লে মাধ্যাকর্ষণ প্রভৃতি বাহিরের জ্ঞাত শক্তি এবং নিয়মের ফলে তার চিরকালের ভবিষ্যৎ-ইতিহাস অঙ্কশাস্ত্রবিশারদগণ নির্ণয় করে দিতে পারেন;—কিন্তু জীবাণু-সমষ্টির সম্বন্ধে এ কথা খাটবে না। জীবাণুর পূর্ব্ব-ইতিহাস ভবিষ্যৎ-ইতিহাস সম্বন্ধে কতকটা খবর দিতে পারে সত্য, কিন্তু সম্পূর্ণ খবর দিতে পারে না। যে পরিমাণে সে জীবাণুগুলি জড়গুণসম্পন্ন অর্থাৎ সুনির্দ্দিষ্ট সীমাবদ্ধ, সেই পরিমাণে সে খবর সঠিক হবে।

এ তো গেল "দার্শনিক গবেষণা।" এ কথাটাকে সহজ-কথায় বলতে গেলে এই দাঁড়ায় যে, জীবন বলতে যে স্ফূর্ত্তি, যে স্বাধীনতা, যে আনন্দ বোঝায়, চরিত্র গঠন করতে গেলে তার কতকটা হ্রাস

করা দরকার। এবং যার যে পরিমাণে সেই স্বাধীন আনন্দের অভাব, তার চরিত্র সেই পরিমাণে গঠিত। *

এক-কথায় একগুঁয়েমি, একদেশদর্শিতা এবং অল্পবুদ্ধি, চরিত্র-গঠনের পক্ষে পরম উপযোগী। যদি তুমি সমুখে ও আশেপাশে বেশি দূর এক নজরে দেখতে পাও, যদি তোমার বুদ্ধি ক্রমশঃ পরিষ্কার হতে থাকে, যদি তুমি নিজেকে চিনতে শেখ, তাহ'লে তোমার জীবনে পূর্ব্বাপর সামঞ্জস্য রাখা সম্ভব হবে না, কাজেই তোমার চরিত্রও দৃঢ় বা সীমাবদ্ধ হবে না। যদি তুমি প্রাণের আনন্দে অধীর হও, যদি তুমি পৃথিবীর গানে, গন্ধে, আঁধারে, আলোকে বিচলিত হও, তবেই তুমি "চরিত্রশূন্য" ;—যদি তুমি সংসারের ক্ষণে ক্ষণে নব নব ভাব, এবং মানুষের মুখে, আকাশের গায়ে, লতায় পাতায়, সততপরিবর্ত্তনশীল নিত্য-নবশ্রী দর্শনে অভিভূত হও, তাহলে বলতে হবে তুমি চরিত্রহীন—তোমার character নেই।

অর্থাৎ মাতা বসুন্ধরার চিরপরিবর্ত্তনশীল, চির-অদ্ভুত, নিত্য-নূতন, অজস্র সৃষ্টি-লীলা যদি তোমার কাছে সত্য বলে প্রতিভাত হয়; মুহূর্ত্তের জন্য যা সত্য তা যদি তুমি সেই-মুহূর্ত্তেরই জন্য সত্য বলে মান; যদি তোমার জীবন কবিত্বে ভরে উঠে থাকে,—তাহলেই তুমি চরিত্রহীন, সমাজের কাছে চির-দোষী।

পূর্ব্বেই বলেছি, আর্য্যজাতি চরিত্রবানের জাতি। এঁদের কাছে সমাজ মানুষের চেয়ে বড়। অন্ততঃ এঁরা মানুষকে সমাজ হতে

---

* এইখানে আর্য্যদের "সংযম" সম্বন্ধে অসংযত চীৎকারটা বোধহয় ধ্বনিত হবে! কিন্তু সংযম ও রিক্ততার মধ্যদেশ বড় পিচ্ছিল।

বিচ্ছিন্ন করে দেখতে পারেন না। ইউরোপীয় সভ্যতার মূলে আরিষ্টটলের বচন :—"মানুষ সামাজিক জীব।" ভারতবর্ষের আর্য্যগণ যদিও একথা এমন স্পষ্টভাবে ব'লে সমাজ গড়তে বসেন নি, তবুও বর্ণাশ্রম থেকে বোঝা যায়, এঁদের নিকট সমাজ কত আঢ্য ছিল, এবং দৃঢ় চরিত্রগঠনের জন্য কত-না কাণ্ড এঁরা করে গেছেন।

যাঁরা ভাবুক, যাঁরা কবি, যাঁরা স্রষ্টা, তাঁরা চরিত্রহীন; আর্য্য-সমাজ চিরকাল তাঁদের ঘৃণা করে এসেছে, সমাজ চিরকাল তাঁদের বাহিরে রেখেছে। তাই তাদের কাছে কালিদাস দুশ্চরিত্র, Shakespeare লক্ষ্মীছাড়া, Michel Angelo গোঁয়ার, ইত্যাদি।

অনার্য্যগণ কিন্তু আর্য্যদের সমাজ-বন্ধনকে বন্ধন বলেই মনে করে এসেছে চিরকাল। বড়-সাধের, কত-কষ্টের সমাজকে অনার্য্যগণ শতাব্দীর পর শতাব্দী ক্রমাগত ঘা দিয়েই এসেছে।—এর প্রমাণ তৈমুর, চেঙ্গিজ-খাঁ, সক, হূন, গথ ইত্যাদি—আর এর প্রমাণ হচ্চে বঙ্গদেশে বর্ণাশ্রম-ধর্ম্মের দুর্দ্দশা।

আসল কথা হচ্চে এই যে, আর্য্যেরা কর্ম্মী, জয়ী। কিন্তু অনার্য্যেরা বিজিত এবং সংসারে হীন হলেও স্বভাব-কবি—মাতা ধরিত্রীর কোলের সন্তান। আর্য্যদের চাইতে এঁরা মায়ের নিকটতর।

আর্য্যেরা ধীর, অনার্য্যেরা চঞ্চল। আর্য্যদের সর্ব্বোচ্চকীর্ত্তি দর্শনশাস্ত্রে, কিন্তু অনার্য্যদের সুন্দরতম কীর্ত্তি কবিতায়, কলায়। এঁরা পৌত্তলিক, এঁরা গায়ক, এঁরাই শিল্পের প্রতিষ্ঠাতা। আর্য্যদের অভিমত যাই হোক, আমাদের অনার্য্যদের আত্ম-প্রসাদের যথেষ্ট কারণ আছে।

শ্রীবীরেন্দ্রকুমার বসু।

ইউরোপে কুরুক্ষেত্র

ইউরোপে কুরুক্ষেত্র আজ যে বেধেছে, সেটি তত আশ্চর্য্যের বিষয় নয়,—আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে কাল তা বাধেনি। যে দেশের আপামরসাধারণ সকলেই সশস্ত্র,—সে দেশে "দিন যায় ক্ষণ যায় না" এ বাক্য অক্ষরে অক্ষরে সত্য। আজ প্রায় চল্লিশ বৎসর ধরে ইউরোপের প্রতি রাজ্যের প্রায় সমগ্র রাষ্ট্রশক্তি যুদ্ধের অনুষ্ঠান এবং যুদ্ধের আয়োজনে ব্যয়িত হয়েছে। দেবতার আরাধনা নয়, বিজ্ঞানের সাধনা করে ইউরোপ যে দিব্য অস্ত্রশস্ত্র লাভ করেছে, তা এদেশের পৌরাণিক এবং ঐতিহাসিকদের উদ্দাম কল্পনারও অতীত। মানুষ-মার্‌বার এমন কল মানুষের হাতে পূর্ব্বে কখন তৈরি হয় নি। সে কল মাটির উপর ছুটে বেড়ায়, সুড়ঙ্গ-পথে প্রবেশ করে, জলে ভাসে, ডুব-সাঁতার দেয়, পাখীর মত আকাশে ওড়ে, বাজের মত মাথায় ভেঙে পড়ে। আর এই সকল কল চালাবার জন্য লক্ষ লক্ষ স্থলচর সৈন্য, সহস্র সহস্র জলচর সৈন্য এবং শত শত খেচর সৈন্যের সৃষ্টি হয়েছে। এর ফলে এতদিন ধরে ইউরোপের বাহিরে শান্তি থাক্‌লেও, অন্তরে শান্তি ছিল না। যুদ্ধের এই বিরাট আয়োজন ইউরোপে সকল জাতির মনে একটি সর্ব্বনাশী মারী-ভয়ের মত চেপে ছিল। জীবনের আলোর পাশে এই মৃত্যুর ছায়া দিনের পর দিন এমনি ঘনীভূত হয়ে এসেছে যে, এ আশঙ্কা মানুষের মনে সহজেই উদয় হয় যে, একদিন হয়ত মানবের স্বহস্তরচিত এই অন্ধকার, ইউরোপীয়

সভ্যতাকে সম্পূর্ণ গ্রাস কর্‌বে। এই কারণ ইউরোপ একদিকে যেমন লড়ালড়ির জন্য প্রস্তুত হচ্ছিল, অপর দিকে তেমনি শান্তি-রক্ষার জন্যও লালায়িত হয়েছিল। যারা বারুদের ঘরে বাস করে, তারা আগুন নিয়ে খেলা কর্‌তে পারে না। যাতে ইউরোপের ঘরে আগুন না লাগে, সে ভাবনা ইউরোপের মনে সর্ব্বদাই জাগরূক ছিল। কিন্তু আজ সে আগুন লেগেছে। এ অগ্নিকাণ্ডের শেষ যে কোথায়, আজ তা কেউ বল্‌তে পারেন না। এ আগুনের আঁচ পৃথিবীর সমগ্র মানবজাতির গায়ে লাগবে, আমরাও বাদ যাব না। ইউরোপের নানা দেশের নানা জাতির স্বার্থের সংঘর্ষে এই সমরানল প্রজ্বলিত হয়েছে, কিন্তু এই অগ্নিকাণ্ডেই ইউরোপীয় সভ্যতার অগ্নিপরীক্ষা হয়ে যাবে।

(২)

এই যুদ্ধটি কতকটা বিনা-মেঘে বজ্রাঘাতের মত ইউরোপের মাথার উপর এসে পড়েছে। মানুষে মানুষে জাতিতে জাতিতে চিরদিন স্বার্থ নিয়েই লড়াই হয়। কিন্তু আজ একমাস পূর্ব্বে ইউরোপে এমন কোন রাজনৈতিক সমস্যা উপস্থিত হয় নি, যার মীমাংসা তরবারির সাহায্য ব্যতীত অপর কোন উপায়ে হতে পারত না। ইউরোপে গত দশ বারো বৎসরের মধ্যে অন্ততঃ দুচারবার অতি গুরুতর সমস্যা উপস্থিত হয়েছিল, কিন্তু দশে মিলে তার আপোষে মীমাংসা করে নিয়েছেন। সুতরাং দূর থেকে আমাদের মনে হয় যে নিতান্ত অকারণে, বা অতি তুচ্ছ কারণে এই প্রলয়কাণ্ডের সৃষ্টি করা হয়েছে। আমরা আদার ব্যাপারী হলেও জাহাজের খোঁজ না নিয়ে থাকতে পারিনে। কেননা আজকের দিনে জাহাজ বাদ দিয়ে কোনও ব্যাপার নেই।

সুতরাং পৃথিবীর শান্তিভঙ্গ কর্‌বার জন্য কে দায়ী, এ প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করা আমাদের পক্ষে সম্পূর্ণ অনধিকার চর্চ্চা নয়। এ প্রশ্নের উত্তরে সার্ভিয়া, রাসিয়া, বেলজিয়ম, ফ্রান্স এবং ইংলণ্ড বলেন দোষী জার্ম্মানী। এমন কি জার্ম্মানীর মিত্ররাজ্য ইটালিও স্পষ্টাক্ষরে এই মতেই সায় দিয়ে জার্ম্মানীর সঙ্গে সন্ধি-বিচ্ছেদ করেছেন। অর্থাৎ ইউরোপে জার্ম্মানেতর সকল জাতিই একবাক্যে জার্ম্মানীর উপরই দোষারোপ কর্‌ছে। অপর-পক্ষে জার্ম্মান-সম্রাট ঈশ্বর সাক্ষ্য করে, মুক্তকণ্ঠে এই ঘোষণা করে দিয়েছেন যে, অপরে জোর করে তাঁর হাতে তলোয়ার গুঁজে দিয়েছে। কিন্তু সে অপর যে কে, তার কোনও উল্লেখ নেই। সম্ভবতঃ এ স্থলে অপর শব্দের অর্থ বিশ্বমানব। Prince von Bulow এই স্পর্দ্ধা করেছেন যে, যেহেতু পৃথিবীর অপর সকলে ভূতপ্রেত, সে কারণ তাঁরা সূর্য্যলোকে কিম্বা সূর্য্যালোকে বাস কর্‌বেন। আত্মশ্লাঘা করাটা হাল জার্ম্মান-রাজনীতির একটি প্রধান অঙ্গ। লোকে বলে এক হাতে তালি বাজে না, কিন্তু এক হাতে যে চপেটাঘাত করা যায় না, এ কথা কেউ বলে না। জার্ম্মানীই যে অকারণে সমগ্র ইউরোপের গণ্ডে চপেটাঘাত করেছেন, তার প্রমাণ Bulow-র সদ্য-প্রকাশিত Imperial Germany নামক গ্রন্থ হতেই পাওয়া যায়। গ্রন্থকার বহুকাল জার্ম্মানীর সর্ব্বপ্রধান রাজমন্ত্রীপদে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন, সুতরাং তাঁর মুখেই জার্ম্মান-রাজনীতির পূর্ণ পরিচয় লাভ করা যাবে। Bulow-র মতে শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে জার্ম্মানী অসংখ্য খণ্ডরাজ্যে বিভক্ত ছিল বলে, জার্ম্মান জাতির কোন রাষ্ট্রবল ছিল না। ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগে জার্ম্মানী বুদ্ধিবলে ও বাহুবলে ইউরোপে আত্মপ্রতিষ্ঠা করেছে। ইউরোপে আজ জার্ম্মানী যে

সর্ব্বাগ্রগণ্য সর্ব্বশক্তিশালী জাতি, সে বিষয়ে আর দ্বিমত নেই। তারপর বিংশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে জার্ম্মানী সমগ্র পৃথিবীতে আত্মপ্রতিষ্ঠা করাটা তার জাতীয় কর্ত্তব্য বলে স্থির করেছে। শুধু ইউরোপে নয়, সসাগরা বসুন্ধরায় সর্ব্বেসর্ব্বা হওয়া জার্ম্মানীর কপালে লেখা আছে, এবং বিধাতার সে লিপি কেউ খণ্ডন করতে পারবেন না, কেননা এ ক্ষেত্রে অদৃষ্ট ও পুরুষকার একত্রে মিলিত হয়েছে। Prince Bulow-র মতে জার্ম্মান-জন-সাধারণের বীর্য্য আছে অতএব ধৈর্য্য আছে, শক্তি আছে অতএব সংযম আছে, সাহস আছে অতএব ভরসা আছে। অপর-পক্ষে জার্ম্মান রাজপুরুষেরা বিদ্বান ও বুদ্ধিমান, বহুদর্শী ও দূরদর্শী, একাগ্র ও একনিষ্ঠ। বাহুবল এবং বুদ্ধিবলের এহেন মিলন পৃথিবীর কুত্রাপি আর হয় নি। পূর্ব্বোক্ত কারণে জার্ম্মানী তার মহত্বের ও প্রভুত্বের ব্রত উদযাপন করতে বাধ্য। সমস্ত পৃথিবীর উপর Made in Germany এই ছাপ মেরে দেওয়াটাই হচ্ছে জার্ম্মান-রাজনীতির প্রধান লক্ষ্য।

জার্ম্মানী যে মন্ত্রের সাধন করছে, Prince Bulow-র মতে তার সিদ্ধির পথে দুটি অন্তরায় আছে—এক ফ্রান্সের শত্রুতা, আর-এক ইংলণ্ডের প্রতিদ্বন্দ্বীতা।

ফ্রান্স জার্ম্মানীর গৃহশত্রু; তার স্পষ্ট কারণ এই যে ফ্রান্স আজও আল্‌সেস্ লোরেনের কথা ভুলতে পারে নি, আর তার গূঢ় কারণ এই যে ফ্রান্স আজও তার পূর্ব্ব ইতিহাস ভুলতে পারে নি। প্রায় তিনশত বৎসর ধরে ফ্রান্স ইউরোপের হর্ত্তাকর্ত্তাবিধাতা ছিল। এই অতীত গৌরবকাহিনী ফ্রান্সের মজ্জাগত হয়ে গেছে। সুতরাং জার্ম্মানীর বর্ত্তমান প্রাধান্য ফ্রান্সের নিকট অসহ্য, এবং তার

জাত্যভিমানে নিত্য আঘাত করে। তারপর ফরাসী জাতি স্বভাবতঃই অধীর ও চঞ্চল, উদ্যমশীল ও যুদ্ধপ্রিয়। ফরাসীদের জাতীয় স্বার্থজ্ঞানের চাইতে জাতীয় আত্মজ্ঞান অনেক বেশি। Prince Bulow-র মতে, এ জাতির মনে লাভের চাইতে ভাবের প্রভাব বেশি (It is a peculiarity of the French nation that they place spiritual needs above material needs); তা ছাড়া ফরাসী জাতির অন্তরে এমন অপূর্ব্ব জীবনীশক্তি নিহিত আছে যে, ফ্রান্সকে যতই কেন আঘাত কর না, সে মর্‌তে জানে না। সুতরাং এরূপ চরিত্রের জাতির নিকট জার্ম্মানীর বিপদ আছে। যথেষ্টপরিমাণ শক্তি সঞ্চয় কর্‌তে পার্‌লে, ফ্রান্স আবার জার্ম্মানীকে সেই শক্তি পরীক্ষা কর্‌বার জন্য যুদ্ধে আহ্বান করবে। এ ক্ষেত্রে আত্মরক্ষার জন্য পূর্ব্ব হতেই জার্ম্মানী ফ্রান্সের শক্তি হ্রাস কর্‌তে বাধ্য। অতএব ফ্রান্সের শত্রুতা করা জার্ম্মানীর পক্ষে কর্ত্তব্য। এই ত গেল ফ্রান্সের কথা।

অপর-পক্ষে সমগ্র পৃথিবীতে জার্ম্মানীর আত্মপ্রতিষ্ঠার পথে ইংলণ্ড চিরবাধা। কি বাণিজ্যে, কি রাজ্যে—আজ ইংলণ্ডের সমকক্ষ কোন দেশ পৃথিবীতে নেই। জার্ম্মানীর ইচ্ছা এ ক্ষেত্রেও ইংলণ্ডের সমকক্ষ হন; সুতরাং রাজনীতির ক্ষেত্রে ইংলণ্ড জার্ম্মানীর সর্ব্বপ্রথম এবং সর্ব্বপ্রধান প্রতিদ্বন্দ্বী। পৃথিবীতে জার্ম্মানীর উন্নতি ইংলণ্ডের স্বার্থের বিরোধী। অতএব ইংলণ্ডের সঙ্গে জার্ম্মানীর সখ্য অসম্ভব। কিন্তু তাই বলে ইংলণ্ডের শত্রুতা করা যে জার্ম্মানীর পক্ষে কর্ত্তব্য, তাও নয়। তার কারণ অর্থবলে ও নৌবলে ইংলণ্ড অদ্বিতীয়। এত প্রবল ও ঐশ্বর্য্যশালী জাতির সঙ্গে বিবাদ করা জার্ম্মানীর

পক্ষে বুদ্ধিবিবেচনার কাজ নয়—অথচ ইংলণ্ডের সঙ্গে যুদ্ধ করবার জন্য জার্ম্মানীর প্রতিদিন প্রস্তুত থাকা কর্ত্তব্য। এ অবস্থায় জার্ম্মানীর রাজনীতির উদ্দেশ্য হচ্ছে ইংলণ্ডের বিরুদ্ধে জাতীয় বিদ্বেষ-বুদ্ধি সেই পরিমাণে উদ্রেক করা, যাতে ইংলণ্ডের সঙ্গে জার্ম্মানীর যুদ্ধ অনিবার্য্য হয়ে না পড়ে, কেননা আজও জার্ম্মানীর নৌবল ইংলণ্ডের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবার পক্ষে যথেষ্ট নয়। (Patriotic feeling must not be roused to such an extent as to damage irreparably our relations with England, against whom our sea-power for years would be insufficient)। অর্থাৎ ইংলণ্ডের সঙ্গে জলযুদ্ধ করবার শক্তি যতদিন না সঞ্চয় করতে পারেন, ততদিন জার্ম্মান-রাজপুরুষেরা অনাহূত ইংলণ্ডের শত্রুতা করবেন না। এ ত শুধু সময়ের কথা। ইত্যবসরে জার্ম্মানী রণতরীর পর রণতরী প্রস্তুত করে, এবং সেই সঙ্গে দেশের লোককে পেট্রিয়টিজমের সুরাপান করিয়ে আস্‌ছে।

পূর্ব্বে যা বলা গেল সে সবই Prince Bulow-র কথা, এক বর্ণও আমার নিজের নয়। এর থেকেই দেখা যায় জার্ম্মানীর রাজনীতির মুখ্য উদ্দেশ্য হচ্ছে ইংলণ্ড ও ফ্রান্সকে শক্তিহীন করা। Prince Bulow বলেন যে, জাতীয় আত্মরক্ষার জন্য তাঁরা এই নীতি অবলম্বন করতে বাধ্য। জার্ম্মানী অবশ্য আত্মরক্ষা অর্থে, যা আছে তাই রক্ষা করা বোঝেন না। যে ঐশ্বর্য্য যে প্রভুত্ব জার্ম্মানীর আজ নেই, তাই আয়ত্ত করাই হচ্ছে জার্ম্মানীর মতে আত্মরক্ষা। এখন জিজ্ঞাস্য, এই আত্মরক্ষার উপায় ও পদ্ধতি কি? Prince Bulow বলেন—

"The fleet as well as the army would, needless to say, in accordance with Prussian and German traditions, consider attack the best form of defence"—অর্থাৎ জার্ম্মান-মতে পরকে আক্রমণ করাই আত্মরক্ষার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ উপায়।

ইটালি বলেছেন যে, জার্ম্মানীর এ যুদ্ধের উদ্দেশ্য আত্মরক্ষা নয়—দস্যুতা। ইটালির কথা যে সম্পূর্ণ সত্য, তার প্রমাণ Prince Bulow-র গ্রন্থের প্রতি অক্ষরে পাওয়া যায়। সুতরাং ইউরোপে এই ভীষণ হত্যাকাণ্ড সৃষ্টি করবার জন্য প্রধানতঃ জার্ম্মানী দায়ী। ইউরোপের রাজনীতির একটি কথা আছে যে, জেরুজেলম্ পৌঁছতে হলে লোহিত-সমুদ্র পার হওয়া দরকার। যতোধর্ম্মস্ততোজয়ঃ এই শাস্ত্রবচনের যদি কোন সার্থকতা থাকে, তাহলে জার্ম্মানী তার এই স্বখাদ রক্ত-সমুদ্রে ডুবে মরবে।

(৩)

আমি পূর্ব্বে বলেছি যে এই ব্যাপারে ইউরোপীয় সভ্যতার অগ্নি-পরীক্ষা হয়ে যাবে।

আজ তিন হাজার বৎসরে ইউরোপে যে সভ্যতা গড়ে উঠেছে—সে সভ্যতার লক্ষণ ও ধর্ম্ম সুপ্রসিদ্ধ ফরাসী ঐতিহাসিক Seignobos নিম্নলিখিত রূপে বর্ণনা করেছেন।

প্রথমতঃ—বর্ত্তমান ইউরোপীয় সভ্যতা উচ্চ আদর্শের উপর প্রতিষ্ঠিত। পূর্ব্বে সমাজ সনাতন-প্রথার উপর প্রতিষ্ঠিত ছিল। নির্ব্বিচারে সে প্রথা রক্ষা করাই লোকে কর্ত্তব্য মনে করত। কিন্তু আজ

ইউরোপবাসীরা, যা চলে আস্‌ছে তাতে সন্তুষ্ট না থেকে, মানব-সমাজের উন্নতির জন্য চিন্তা করে ও চেষ্টা করে। বর্ত্তমান সভ্যতার জপ-মন্ত্র হচ্ছে progress।

দ্বিতীয়তঃ—বর্ত্তমানে সমাজ ব্যক্তিগত স্বাধীনতার উপর প্রতিষ্ঠিত। এ যুগে মানুষের উপর মানুষের কোন অধিকার নেই। প্রতি লোকেই নিজের ইচ্ছা, রুচি ও চরিত্র অনুসারে নিজের জীবন গঠন কর্‌তে পারে। প্রাচীন প্রথার বন্ধন থেকে সবাই মুক্ত। ধর্ম্ম সম্বন্ধে, চিন্তা সম্বন্ধে, মতামত প্রকাশ সম্বন্ধে সকলেরই সমান স্বাধীনতা আছে। ইউরোপে মানুষ আজ মানুষের দাস নয়।

তৃতীয়তঃ—বর্ত্তমান সমাজ সাম্যনীতির উপর প্রতিষ্ঠিত। প্রাচীন সমাজ উচ্চনীচ-হিসাবে নানা সম্প্রদায়ে বিভক্ত ছিল, এবং প্রতি সম্প্রদায়ের বিশেষ অধিকার ও বিশেষ কর্ত্তব্য ছিল। এ যুগের আইনকানুনে এই অধিকারভেদ ও কর্ত্তব্য-ভেদের স্থান নেই। অর্থের তারতম্য ব্যতীত ইউরোপে মানুষমাত্রেই অধিকারে ও কর্ত্তব্যে একজাতীয়।

চতুর্থতঃ—বর্ত্তমানে রাজ্য স্বায়ত্ত-শাসনের উপর প্রতিষ্ঠিত। পূর্ব্বে ইউরোপে জাতি বল্‌তে কোনও দেশের জনগণকে বোঝাত না। সেকালে শাসক-সম্প্রদায় বলে একটি বিশেষ সম্প্রদায় ছিল। রাজ্যশাসনের ভার তাঁদেরই হস্তে নিহিত ছিল। বাদবাকী লোকের শাসনকার্য্যের সঙ্গে কোনই সম্পর্ক ছিল না। আজ মানুষ মাত্রেই রাষ্ট্রের (Body politic) অন্তর্ভূত। ধনী, দরিদ্র, উচ্চ, নীচ, সকলেরই ভোট আছে, এবং সকলের মতই সমান মূল্যবান।

পঞ্চমতঃ—ইউরোপীয় সমাজ নিরাপদ। পূর্ব্বের ন্যায় দস্যু-ভয়ও

নেই, রাজকর্ম্মচারীদের অত্যাচারও নেই। এ যুগের রাজকর্ম্মচারীরা অধিকাংশই শিক্ষিত ও সচ্চরিত্র, তা ছাড়া তাঁদের কার্য্যের উপর গভরমেণ্টের দৃষ্টি সর্ব্বদাই থাকে।

ষষ্ঠতঃ—বর্ত্তমান ইউরোপীয় সভ্যতা শান্তির উপর প্রতিষ্ঠিত। পৃথিবীতে আজও যুদ্ধবিগ্রহ আছে; কিন্তু ইউরোপের মতে যুদ্ধব্যাপার একটি পাপ—কেবল কোন কোন অবস্থায় কোন কোন জাতিকে দায়ে পড়ে এ কার্য্য করতে হয়। ইউরোপে বর্ত্তমানে ক্ষত্রিয় বলে কোন মহামান্য এবং অসামান্য ক্ষমতাপন্ন সম্প্রদায় নেই। বর্ত্তমানে মানুষে কর্ত্তব্যের খাতিরে সৈনিক হয়,—সখের জন্যও নয়, মানের জন্যও নয়। বর্ত্তমানে যুদ্ধ-ব্যাপারটি এমন ভয়ঙ্কর হত্যাকাণ্ডে পরিণত হয়েছে যে, যুদ্ধ একালে অতি কম হয়, এবং অতি কম দিনের জন্য হয়।

ইউরোপীয় সভ্যতার উপরোক্ত বর্ণনা যে সত্য, তা যিনিই ইউরোপের ইতিহাস আলোচনা করেছেন, তিনিই স্বীকার করতে বাধ্য।

(৪)

যে সকল মনোভাবের উপর বর্ত্তমান ইউরোপীয় সভ্যতা প্রতিষ্ঠিত, ইংলণ্ডে তার উৎপত্তি, এবং ফ্রান্সে তার পরিণতি হয়েছে। নেপোলিয়ানের অধঃপতনের পর, রাসিয়া অষ্ট্রিয়া এবং প্রশিয়া এই নূতন সভ্যতার উচ্ছেদ এবং মধ্যযুগের পুনঃপ্রতিষ্ঠার জন্য একবার বদ্ধপরিকর হয়েছিলেন, কিন্তু সে সভ্যতা নষ্ট করবার ক্ষমতা সেকালে এই তিন-রাজ্যের মিলিত-শক্তিরও ছিল না। এ সভ্যতাকে ঘা-খাওয়াবার শক্তি

আজ একমাত্র জার্ম্মান-সাম্রাজ্যেরই আছে। কেননা রাসিয়া ইউরোপের ভূগোলের অন্তর্ভূত হলেও, তার ইতিহাসের বহির্ভূত। রাসিয়াকে ইউরোপ আজও একটি প্রাচ্যদেশ হিসেবেই দেখে।

অষ্ট্রিয়ার সাম্রাজ্য একটি প্রাচীন ধ্বংশাবশেষ মাত্র। নানা বিভিন্ন জাতি ও নানা বিভিন্ন দেশকে যোড়াতাড়া দিয়ে এ সাম্রাজ্যকে খাড়া করে রাখা হয়েছে।—অষ্ট্রিয়াকে জার্ম্মানীর সামন্তরাজ বল্‌লেও অত্যুক্তি হয় না—কেননা জার্ম্মানীর সাহায্য ব্যতীত অষ্ট্রিয়া একদিনও দাঁড়াতে পারে না। আমরা আজ যাকে জার্ম্মান-সাম্রাজ্য বলি, সে হচ্ছে একটি যুক্তরাজ্য, এবং প্রশিয়ার রাজা সেই যুক্তরাজ্যের মণ্ডলেশ্বর। জার্ম্মান-রাষ্ট্রনীতির অর্থ হচ্ছে প্রশিয়ার রাজনীতি। বর্ত্তমান জার্ম্মান-সভ্যতার স্বরূপ বুঝতে হলে এই কথাটি মনে রাখা দরকার। এই রাজ-শক্তি আজকের দিনে সমগ্র সভ্য-সমাজের নিকট একটি বিভীষিকা হয়ে দাঁড়িয়েছে।

জার্ম্মানী আজ ইউরোপে প্রবল পরাক্রান্ত, কিন্তু জার্ম্মানী, কি সমাজনীতিতে কি রাজনীতিতে, বর্ত্তমান ইউরোপীয় সভ্যতা সম্পূর্ণ গ্রাহ্য করে নি। জার্ম্মানীর ideal পূর্ব্ববর্ণিত ইউরোপীয় সভ্যতার ideal হতে পৃথক, এবং কোন কোন অংশে বিরোধী। সুতরাং এ যুদ্ধের মূলে কেবল স্বার্থের নয়, ideal-এর বিরোধ ও সংঘর্ষ আছে।

(৫)

প্রথমতঃ—বর্ত্তমান জার্ম্মান-সাম্রাজ্য উচ্চ আদর্শের উপর নয়, উচ্চ আশার উপর প্রতিষ্ঠিত। মানবজাতির উন্নতি নয়, জার্ম্মানীর অভ্যুদয়ই

হচ্ছে জার্ম্মান সম্রাটের এবং জার্ম্মান রাজপুরুষদের কামনার ধন। কি রাজ্যে কি বাণিজ্যে দিগ্বিজয় করাই হচ্ছে জার্ম্মনীর ideal। জার্ম্মানীর জপমন্ত্র progress নয়,—self aggrandisement.

দ্বিতীয়তঃ—জার্ম্মানীতে মানুষের ব্যক্তিগত স্বাধীনতা,—ইউরোপের অপর সকল দেশের অপেক্ষা কম। জার্ম্মান রাজনীতির বিরুদ্ধে মতামত প্রকাশ করা জার্ম্মান-আইন-অনুসারে দণ্ডনীয়। জার্ম্মানদেশে প্রতি ব্যক্তি যৌবনের প্রারম্ভে তিন বৎসরের জন্য সৈনিক হতে বাধ্য। এবং পরে রাজার আদেশে যুদ্ধ করতে বাধ্য। ইংলণ্ড ব্যক্তিগত স্বাধীনতার উপরে এরূপ হস্তক্ষেপ করা বর্ব্বরতা মনে করে। ফ্রান্স প্রভৃতি দেশ কেবলমাত্র জার্ম্মানীর সৈন্যবলের হাত থেকে আত্মরক্ষা করবার জন্য এই জার্ম্মান-প্রথা অবলম্বন করতে বাধ্য হয়েছে। জার্ম্মান-সাম্রাজ্যের অন্তর্ভূত পোল, দিনেমার, ফরাসী প্রভৃতি জার্ম্মানেতর জাতির নিজের প্রবৃত্তি ও রুচি অনুসারে জীবন গঠন করবার অধিকার নেই। জার্ম্মান-আইন-অনুসারে তারা জার্ম্মান সভ্যতায় শিক্ষিত ও দীক্ষিত হতে বাধ্য। এমন কি নিজের নিজের ভাষা ব্যবহার করবার স্বাধীনতা হতেও তারা বঞ্চিত।

তৃতীয়তঃ—জার্ম্মানীতে আজও সম্প্রদায়ে সম্প্রদায়ে প্রভেদ আছে। ক্ষত্রিয়-সম্প্রদায়ের প্রভুত্ব জার্ম্মান-সমাজ নতশিরে গ্রাহ্য করে নিয়েছে।

চতুর্থতঃ—জার্ম্মান-সাম্রাজ্য স্বায়ত্তশাসনের উপর নয়, রাজশাসনের উপর প্রতিষ্ঠিত। Prince Bulow বলেন, ইউরোপের অন্যান্য দেশের ন্যায় জার্ম্মানীতে ডিমোক্রাসী স্থাপন করা অসম্ভব। কেননা জার্ম্মান জাতি রাজনৈতিক বুদ্ধিহীন। আটশত বৎসর নানা ক্ষুদ্ররাজ্যে

বিভক্ত থাকার দরুণ জার্ম্মান জাতির মনে স্বাতন্ত্র্যের ভাব অতি প্রবল। এই কারণে জার্ম্মান-জনসাধারণের মনে সমগ্র জার্ম্মানী সম্বন্ধে আজও দেশাত্মজ্ঞান জন্মলাভ করেনি। এতদ্ব্যতীত জার্ম্মানদের মনে স্বজাতি-বাৎসল্য হয় অতি সঙ্কীর্ণ, নয় অতি উদার। হয় তা নিজের দলের মধ্যে আবদ্ধ, নয় তা বিশ্বমানবের ভিতর ব্যাপ্ত। Prince Bulow-র মতে জার্ম্মানীর ইতিহাস জার্ম্মান জাতিকে স্বায়ত্ত-শাসনের পক্ষে অনুপযুক্ত করে ফেলেছে। যদি প্রজাসাধারণের হাতে রাজ্যশাসনের ভার পড়ে, তাহলে জার্ম্মান-সাম্রাজ্য দুদিনেই আবার ছিন্নভিন্ন হয়ে পড়বে। অতএব প্রশিয়ার রাজা, রাজকর্ম্মচারী ও সৈন্যবলের সহায়তায় জার্ম্মান-সাম্রাজ্য আজও শাসন কর্‌ছেন এবং চিরদিন কর্‌বেন। রাজশক্তি অবাধ ও অক্ষুণ্ণ রাখাই জার্ম্মান-রাজনীতির মূলমন্ত্র।

পঞ্চমতঃ—জার্ম্মানীর জনসাধারণ সম্পূর্ণ নিরাপদ নহে। জার্ম্মানীতে অবশ্য দস্যুভয় নেই, কিন্তু রাজভয় আছে। প্রজাসাধারণের উপর রাজকর্ম্মচারীদের, বিশেষতঃ সেনাধ্যক্ষদের অবৈধ অত্যাচারের উপযুক্ত বৈধ শাস্তি নেই।

ষষ্ঠতঃ—জার্ম্মান-সাম্রাজ্য যুদ্ধের উপর প্রতিষ্ঠিত, শান্তির উপর নয়। জার্ম্মান-কর্ত্তৃপক্ষদের মতে যুদ্ধ পুণ্যকার্য্য, পাপ নয়। জার্ম্মানীর সৈনিক সাধারণ-মানব নয়, কিন্তু তার অপেক্ষা অনেক উচ্চশ্রেণীর জীব। জার্ম্মানীতে অস্ত্রধারণ করা কর্ত্তব্যও বটে, গৌরবের কথাও বটে। Might is right (অর্থাৎ বাহুবলই ধর্ম্মবল) এই মতের ভিত্তির উপর জার্ম্মান-সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠিত।

এই কারণেই জার্ম্মান-সাম্রাজ্যের অভ্যুদয় ইউরোপের সভ্য

সমাজে বর্ব্বরতার পুনরভ্যুদয় বলে গণ্য। ইংলণ্ড ও ফ্রান্স ইউরোপের নব-সভ্যতার স্রষ্টা। আশা করি এই বর্ব্বরতার আক্রমণ হতে ইংলণ্ড ও ফ্রান্স ইউরোপীয় সভ্যতাকে রক্ষা করতে পারবে। সে সভ্যতা যদি এই ভীষণ অগ্নিপরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয় তাহলেই প্রমাণ হবে যে পশুবলই শ্রেষ্ঠ বল নয় আর সভ্যতাও শক্তিহীন নয়।

শ্রীপ্রমথ চৌধুরী।

সবুজ পত্র

আমার জগৎ

পৃথিবীর রাত্রিটি যেন তার এলোচুল, পিঠ-ছাপিয়ে পায়ের গোড়ালি পর্য্যন্ত নেমে পড়েছে। কিন্তু সৌরজগৎলক্ষ্মীর শুভ্রললাটে একটি কৃষ্ণতিলও সে নয়। ঐ তারাগুলির মধ্যে যে-খুসি সেই আপন সাড়ির একটি খুঁট দিয়ে এই কালিমার কণাটুকু মুছে নিলেও তার আঁচলে যেটুকু দাগ লাগ্‌বে তা অতি বড় নিন্দুকের চোখেও পড়বে না।

এ যেন আলোক মায়ের কোলের কালো শিশু, সবে জন্ম নিয়েছে। লক্ষ লক্ষ তারা অনিমেষে তার এই ধরণী-দোলার শিয়রের কাছে দাঁড়িয়ে। তা'রা একটু নড়ে না পাছে এর ঘুম ভেঙে যায়।—

আমার বৈজ্ঞানিক বন্ধুর আর সইল না। তিনি বল্লেন, তুমি কোন্ সাবেককালের ওয়েটিং রুমের আরাম-কেদারায় পড়ে নিদ্রা দিচ্ছ, ওদিকে বিংশ শতাব্দীর বিজ্ঞানের রেলগাড়িটা যে বাঁশি

বাজিয়ে ছুট দিয়েছে। তারাগুলো নড়ে না এটা তোমার কেমন কথা? একেবারে নিছক কবিত্ব!

আমার বলবার ইচ্ছা ছিল, তারাগুলো যে নড়ে এটা তোমার নিছক বৈজ্ঞানিকত্ব। কিন্তু সময় এমনি খারাপ ওটা জয়ধ্বনির মতই শোনাবে।

আমার কবিত্বকলঙ্কটুকু স্বীকার করেই নেওয়া গেল। এই কবিত্বের কালিমা পৃথিবীর রাত্রিটুকুরই মত। এর শিয়রের কাছে বিজ্ঞানের জগজ্জয়ী আলো দাঁড়িয়ে আছে কিন্তু সে এর গায়ে হাত তোলে না। স্নেহ করে' বলে, আহা স্বপ্ন দেখুক্!

আমার কথাটা হচ্চে এই যে, স্পষ্টই দেখতে পাচ্চি তারাগুলো চুপচাপ দাঁড়িয়ে আছে। এর উপরে ত তর্ক চলে না।

বিজ্ঞান বলে, তুমি অত্যন্ত বেশি দূরে আছ বলেই দেখ্‌চ তারাগুলো স্থির। কিন্তু সেটা সত্য নয়।

আমি বলি, তুমি অত্যন্ত বেশি কাছে উঁকি মারচ বলেই বল্‌চ ওরা চল্‌চে। কিন্তু সেটা সত্য নয়।

বিজ্ঞান চোখ পাকিয়ে বলে, সে কেমন কথা?

আমিও চোখ পাকিয়ে জবাব দিই, কাছের পক্ষ নিয়ে তুমি যদি দূরকে গাল দিতে পার তবে দূরের পক্ষ নিয়ে আমিই বা কাছকে গাল দেব না কেন?

বিজ্ঞান বলে, যখন দুই পক্ষ একেবারে উল্টো কথা বলে তখন ওদের মধ্যে এক পক্ষকেই মানতে হয়।

আমি বলি, তুমি তা ত মান না। পৃথিবীকে গোলাকার বলবার বেলায় তুমি অনায়াসে দূরের দোহাই পাড়। তখন বল, কাছে

আছি বলেই পৃথিবীটাকে সমতল বলে ভ্রম হয়। তখন তোমার তর্ক এই যে কাছে থেকে কেবল অংশকে দেখা যায়, দূরে না দাঁড়ালে সমগ্রকে দেখা যায় না। তোমার এ কথাটায় সায় দিতে রাজি আছি। এই জন্যই ত আপনার সম্বন্ধে মানুষের মিথ্যা অহঙ্কার। কেননা আপনি অত্যন্ত কাছে। শাস্ত্রে তাই বলে, আপনাকে যে-লোক অন্যের মধ্যে দেখে সেই সত্য দেখে—অর্থাৎ আপনার থেকে দূরে না গেলে আপনার গোলাকার বিশ্বরূপ দেখা যায় না।

দূরকে যদি এতটা খাতিরই কর তবে কোন্ মুখে বল্‌বে, তারাগুলো ছুটোছুটি করে মরচে? মধ্যাহ্নসূর্য্যকে চোখে দেখ্‌তে গেলে কালো কাঁচের মধ্য দিয়ে দেখ্‌তে হয়। বিশ্বলোকের জ্যোতির্ম্ময় দুর্দ্দর্শরূপকে আমরা সমগ্রভাবে দেখ্‌ব বলেই পৃথিবী এই কালো রাত্রিটাকে আমাদের চোখের উপর ধরেছেন। তার মধ্যে দিয়ে কি দেখি? সমস্ত শান্ত, নীরব। এত শান্ত, এত নীরব যে আমাদের হাউই, তুবড়ি, তারাবাজিগুলো তাদের মুখের সামনে উপহাস করে আস্‌তে ভয় করে না।

আমরা যখন সমস্ত তারাকে পরস্পরের সঙ্গে সম্বন্ধযোগে মিলিয়ে দেখচি তখন দেখচি তাঁরা অবিচলিত স্থির। তখন তাঁরা যেন গজমুক্তার সাতনলী হার। জ্যোতির্বিদ্যা যখন এই সম্বন্ধসূত্রকে বিচ্ছিন্ন করে' কোনো তারাকে দেখে তখন দেখ্‌তে পায় সে চল্‌চে—তখন হার-ছেঁড়া মুক্তা টলটল্ করে, গড়িয়ে বেড়ায়।

এখন মুস্কিল এই, বিশ্বাস করি কাকে? বিশ্বতারা অন্ধকার সাক্ষ্যমঞ্চের উপর দাঁড়িয়ে যে সাক্ষ্য দিচ্চে তার ভাষা নিতান্ত সরল—একবার কেবল চোখ মেলে তার দিকে তাকালেই হয়, আর

কিছুই করতে হয় না। আবার যখন দুই-একটা তারা তাদের বিশ্বাসন থেকে নীচে নেমে এসে গণিতশাস্ত্রের গুহার মধ্যে ঢুকে কানে কানে কি সব বলে যায় তখন দেখি সে আবার আর এক কথা। যারা স্বদলের সম্বন্ধ ছেড়ে এসে পুলিস ম্যাজিষ্ট্রেটের প্রাইভেট কামরায় ঢুকে সমস্ত দলের একজোট সাক্ষ্যের বিরুদ্ধে গোপন সংবাদ ফাঁস করে দেবার ভান করে সেই সমস্ত এপ্রুভরদেরই যে পরম সত্যবাদী বলে গণ্য করতেই হবে এমন কথা নেই।

কিন্তু এই সমস্ত এপ্রুভররা বিস্তারিত খবর দিয়ে থাকে। ‘বিস্তারিত’ খবরের জোর বড় বেশি। সমস্ত পৃথিবী বল্‌চে আমি গোলাকার, কিন্তু আমার পায়ের তলার মাটি বল্‌চে আমি সমতল। পায়ের তলার মাটির জোর বেশি, কেননা সে যে-টুকু বলে সে একেবারে তন্ন তন্ন করে বলে। পায়ের তলার মাটির কাছ থেকে পাই তথ্য, অর্থাৎ কেবল তথাকার খবর, বিশ্বপৃথিবীর কাছ থেকে পাই সত্য, অর্থাৎ সমস্তটার খবর।

আমার কথাটা এই যে কোনোটাকে উড়িয়া দেওয়া চলে না। আমাদের যে দুইই চাই। তথ্য না হলেও আমাদের কাজকর্ম্ম বন্ধ, সত্য না হলেও আমাদের পরিত্রাণ নেই। নিকট এবং দূর, এই দুই নিয়েই আমাদের যত কিছু কারবার। এমন অবস্থায় এদের কারো প্রতি যদি মিথ্যার কলঙ্ক আরোপ করি তবে সেটা আমাদের নিজের গায়েই লাগে।

অতএব যদি বলা যায়, আমার দূরের ক্ষেত্রে তারা স্থির আছে, আর আমার নিকটের ক্ষেত্রে তারা দৌড়চ্চে তাতে দোষ কি? নিকটকে বাদ দিয়ে দূর, এবং দূরকে বাদ দিয়ে নিকট যে একটা

ভয়ঙ্কর কবন্ধ। দূর এবং নিকট এরা দুইজনে দুই বিভিন্ন তথ্যের মালিক কিন্তু এরা দুজনেই কি এক সত্যের অধীন নয়?

সেই জন্মেই উপনিষৎ বলেচেন :—

তদেজতি তন্নৈজতি তদ্দূরে তদ্বন্তিকে—

তিনি চলেন এবং তিনি চলেন না, তিনি দূরে এবং তিনি নিকটে এ দুইই এক সঙ্গে সত্য। অংশকেও মানি, সমস্তকেও মানি; কিন্তু সমগ্রবিহীন অংশ ঘোর অন্ধকার এবং অংশবিহীন সমগ্র আরো ঘোর অন্ধকার।

এখনকার কালের পণ্ডিতেরা বল্‌তে চান, চলা ছাড়া আর কিছুই নেই, ধ্রুবত্বটা আমাদের বিদ্যার সৃষ্টি মায়া। অর্থাৎ জগৎটা চল্‌চে কিন্তু আমাদের জ্ঞানেতে আমরা তাকে একটা স্থিরত্বের কাঠামোর মধ্যে দাঁড় করিয়ে দেখচি নইলে দেখা বলে জানা বলে পদার্থটা থাক্‌তই না—অতএব চলাটাই সত্য এবং স্থিরত্বটা বিদ্যার মায়া। আবার আর এককালের পণ্ডিত বলেছিলেন, ধ্রুব ছাড়া আর কিছুই নেই, চঞ্চলতাটা অবিদ্যার সৃষ্টি। পণ্ডিতেরা যতক্ষণ এক পক্ষের ওকালতি করবেন ততক্ষণ তাঁদের মধ্যে লড়াইয়ের অন্ত থাক্‌বে না। কিন্তু সরলবুদ্ধি জানে, চলাও সত্য, থামাও সত্য। অংশ, যেটা নিকটবর্ত্তী, সেটা চল্‌চে; সমগ্র, যেটা দূরবর্ত্তী, সেটা স্থির রয়েছে।

এ সম্বন্ধে একটা উপমা আমি পূর্ব্বেই ব্যবহার করেছি, এখনো ব্যবহার করব। গাইয়ে যখন গান করে তখন তার গাওয়াটা প্রতি মুহূর্ত্তে চল্‌তে থাকে। কিন্তু সমগ্র গানটা সকল মুহূর্ত্তকে ছাড়িয়ে স্থির হয়ে আছে। যেটা কোনো গাওয়ার মধ্যেই চলে না সেটা

গানই নয়, যেটা কোনো গানের মধ্যেই স্থিরপ্রতিষ্ঠ হতে না পারে তাকে গাওয়াই বলা যেতে পারে না। গানে ও গাওয়ায় মিলে যে সত্য সেই ত তদেজতি তন্নৈজতি তদ্দূরে তদ্বন্তিকে—সে চলেও বটে চলে নাও বটে, সে দূরেও বটে নিকটেও বটে।

যদি এই পাতাটিকে অনুবীক্ষণ দিয়ে দেখি তবে এ'কে ব্যাপ্ত আকাশে দেখা হয়। সেই আকাশকে যতই ব্যাপ্ত করতে থাকব ততই ঐ পাতার আকার আয়তন বাড়তে বাড়তে ক্রমেই সে সূক্ষ্ম হয়ে ঝাপ্‌সা হয়ে মিলিয়ে যাবে। ঘন আকাশে যা আমার কাছে পাতা, ব্যাপ্ত আকাশে তা আমার কাছে নেই বল্লেই হয়।

এই ত গেল দেশ। তার পরে কাল। যদি এমন হতে পারত যে আমি যে কালটাতে আছি সেটা যেমন আছে তেমনিই থাকত অথচ গাছের ঐ পাতাটার সম্বন্ধে এক মাসকে এক মিনিটে ঠেসে দিতে পারতুম তবে পাতা হওয়ার পূর্ব্ববর্ত্তী অবস্থা থেকে পাতা হওয়ার পরবর্ত্তী অবস্থা পর্য্যন্ত এমনি হুস করে দৌড় দিত যে আমি ওকে প্রায় দেখ্‌তে পেতুম না। জগতে যে সব পদার্থ আমাদের কাল থেকে অত্যন্ত ভিন্ন কালে চল্‌চে তারা আমাদের চারদিকে থাক্‌লেও তাদের দেখ্‌তেই পাচ্চিনে এমন হওয়া অসম্ভব নয়।

একটা দৃষ্টান্ত দিলে কথাটা আর একটু স্পষ্ট হবে। গণিত সম্বন্ধে এমন অসামান্য শক্তিশালী লোকের কথা শোনা গেছে যাঁরা বহুসময়সাধ্য দুরূহ অঙ্ক এক মুহূর্ত্তে গণনা করে দিতে পারেন। গণনা সম্বন্ধে তাঁদের চিত্ত যে কালকে আশ্রয় করে আছে আমাদের চেয়ে সেটা বহু দ্রুত কাল—সেই জন্যে যে পদ্ধতির ভিতর দিয়ে

তাঁরা অঙ্কফলের মধ্যে গিয়ে উত্তীর্ণ হন সেটা আমরা দেখ্‌তেই পাইনে এমন কি তাঁরা নিজেরাই দেখ্‌তে পান্‌ না।

আমার মনে আছে, একদিন দিনের বেলা আমি অল্পক্ষণের জন্য ঘুমিয়ে পড়েছিলেম। আমি সেই সময়ের মধ্যে একটা দীর্ঘকালের স্বপ্ন দেখেছিলেম। আমার ভ্রম হল আমি অনেকক্ষণ ঘুমিয়েছি। আমার পাশের লোককে জিজ্ঞাসা করে জানা গেল আমি পাঁচ মিনিটের বেশি ঘুমই নি। আমার স্বপ্নের ভিতরকার সময়ের সঙ্গে আমার স্বপ্নের বাহিরের সময়ের পার্থক্য ছিল। আমি যদি একই সময়ে এই দুই কাল সম্বন্ধে সচেতন থাক্‌তুম, তাহলে, হয় স্বপ্ন এত দ্রুতবেগে মনের মধ্যে চলে যেত যে, তাকে চেনা শক্ত হত, নয় ত সেই স্বপ্নবর্ত্তীকালের রেলগাড়িতে করে চলে যাওয়ার দরুণ স্বপ্নের বাইরের জগৎটা রেলগাড়ির বাইরের দৃশ্যের মত বেগে পিছিয়ে যেতে থাক্‌ত; তার কোনো একটা জিনিষের উপর চোখ রাখা যেত না। অর্থাৎ স্বভাবত যার গতি নেই সেও গতি প্রাপ্ত হত।

যে ঘোড়া দৌড়চ্চে তার সম্বন্ধে এক মিনিটকে যদি দশঘন্টা করতে পারি তাহলে দেখ্‌ব তার পা উঠ্‌চেই না। ঘাস প্রতিমুহূর্ত্তে বাড়চে অথচ আমরা তা দেখ্‌তেই পাচ্চিনে। ব্যাপক কালের মধ্যে ঘাসের হিসাব নিয়ে তবে আমরা জান্‌তে পারি ঘাস বাড়চে। সেই ব্যাপক কাল যদি আমাদের আয়ত্তের চেয়ে বেশি হত তাহলে ঘাস আমাদের পক্ষে পাহাড় পর্ব্বতের মতই অচল হত।

অতএব আমাদের মন যেকালের তালে চল্‌চে তারই বেগ অনুসারে আমরা দেখছি বটগাছটা দাঁড়িয়ে আছে এবং নদীটা

চল্‌চে। কালের পরিবর্ত্তন হলে হয়ত দেখ্‌তুম বটগাছটা চল্‌চে কিম্বা নদীটা নিস্তব্ধ।

তাহলেই দেখা যাচ্চে, আমরা যাকে জগৎ বল্‌চি সেটা আমাদের জ্ঞানের যোগে ছাড়া হতেই পারে না। যখন আমরা পাহাড় পর্ব্বত সূর্য্য চন্দ্র দেখি তখন আমাদের সহজেই মনে হয় বাইরে যা আছে আমরা তাই দেখচি। যেন আমার মন আয়নামাত্র। কিন্তু আমার মন আয়না নয়, তা সৃষ্টির প্রধান উপকরণ। আমি যে মুহূর্ত্তে দেখ্‌চি সেই মুহূর্ত্তে সেই দেখার যোগে সৃষ্টি হচ্চে। যতগুলি মন ততগুলি সৃষ্টি। অন্য কোনো অবস্থায় মনের প্রকৃতি যদি অন্য রকম হয় তবে সৃষ্টিও অন্য রকম হবে।

আমার মন ইন্দ্রিয়যোগে ঘন দেশের জিনিষকে এক রকম দেখে, ব্যাপক দেশের জিনিষকে অন্য রকম দেখে, দ্রুতকালের গতিতে এক রকম দেখে, মন্দকালের গতিতে অন্য রকম দেখে— এই প্রভেদ অনুসারে সৃষ্টির বিচিত্রতা। আকাশে লক্ষকোটি ক্রোশ পরিমাণ দেশকে যখন সে এক হাত আধ হাতের মধ্যে দেখে তখন দেখে তারাগুলি কাছাকাছি এবং স্থির। আমার মন কেবল যে আকাশের তারাগুলিকে দেখ্‌চে তা নয়, লোহার পরমাণুকেও নিবিড় এবং স্থির দেখ্‌চে—যদি লোহাকে সে ব্যাপ্ত আকাশে দেখ্‌ত তাহলে দেখ্‌ত তার পরমাণুগুলি স্বতন্ত্র হয়ে দৌড়াদৌড়ি করচে। এই বিচিত্র দেশকালের ভিতর দিয়ে দেখাই হচ্চে সৃষ্টির লীলা দেখা। সেই জন্যেই লোহা হচ্চে লোহা, জল হচ্চে জল, মেঘ হচ্চে মেঘ।

কিন্তু বিজ্ঞান ঘড়ির কাঁটার কাল এবং গজকাঠির মাপ দিয়ে

সমস্তকে দেখ্‌তে চায়। দেশকালের এক আদর্শ দিয়ে সমস্ত সৃষ্টিকে সে বিচার করে। কিন্তু এই এক আদর্শ সৃষ্টির আদর্শই নয়। সুতরাং বিজ্ঞান সৃষ্টিকে বিশ্লিষ্ট করে ফেলে। অবশেষে অণু পরমাণুর ভিতর দিয়ে এমন একটা জায়গায় গিয়ে পৌঁছায় যেখানে সৃষ্টিই নেই। কারণ সৃষ্টি ত অণু পরমাণু নয়—দেশ-কালের বৈচিত্র্যের মধ্য দিয়ে আমাদের মন যা দেখ্‌চে তাই সৃষ্টি। ঈথর-পদার্থের কম্পনমাত্র সৃষ্টি নয়, আলোকের অনুভূতিই সৃষ্টি। আমার বোধকে বাদ দিয়ে যুক্তি দ্বারা যা দেখচি তাই প্রলয়, আর বোধের দ্বারা যা দেখচি তাই সৃষ্টি।

বৈজ্ঞানিক বন্ধু তাড়া করে এলেন বলে। তিনি বল্‌বেন, বিজ্ঞান থেকে আমরা বহুকষ্টে বোধকে খেদিয়ে রাখি—কারণ আমার বোধ এক কথা বলে, তোমার বোধ আর-এক কথা বলে। আমার বোধ এখন এক কথা বলে, তখন আর-এক কথা বলে।

আমি বলি, ঐ ত হল সৃষ্টিতত্ত্ব। সৃষ্টি ত কলের সৃষ্টি নয়—সে যে মনের সৃষ্টি। মনকে বাদ দিয়ে সৃষ্টিতত্ত্ব আলোচনা, আর রামকে বাদ দিয়ে রামায়ণ গান একই কথা।

বৈজ্ঞানিক বল্‌বেন—এক এক মন এক এক রকমের সৃষ্টি যদি করে বসে তাহলে সেটা যে অনাসৃষ্টি হয়ে দাঁড়ায়।

আমি বলি,—তা ত হয় নি। হাজার লক্ষ মনের যোগে হাজার লক্ষ সৃষ্টি কিন্তু তবুও ত দেখি সেই বৈচিত্র্যসত্ত্বেও তাদের পরস্পরের যোগ বিচ্ছিন্ন হয় নি। তাই ত তোমার কথা আমি বুঝি, আমার কথা তুমি বোঝ।

তার কারণ হচ্চে, আমার এক-টুক্‌রো মন যদি বস্তুত কেবল

আমারই হত তাহলে মনের সঙ্গে মনের কোনো যোগই থাকত না। মন পদার্থটা জগদ্ব্যাপী। আমার মধ্যে সেটা বদ্ধ হয়েছে বলেই যে সেটা খণ্ডিত তা নয়। সেই জন্যেই সকল মনের ভিতর দিয়েই একটা ঐক্যতত্ত্ব আছে। তা না হলে মানুষের সমাজ গড়ত না। মানুষের ইতিহাসের কোনো অর্থ থাক্‌ত না।

বৈজ্ঞানিক জিজ্ঞাসা করচেন, এই মন পদার্থটা কি শুনি।

আমি উত্তর করি যে, তোমার ঈশ্বর-পদার্থের চেয়ে কম আশ্চর্য্য এবং অনির্ব্বচনীয় নয়। অসীম যেখানে সীমাকে গ্রহণ করেছেন সেইটে হল মনের দিক। সেই দিকেই দেশকাল; সেই দিকেই রূপরসগন্ধ; সেই দিকেই বহু। সেই দিকেই তাঁর প্রকাশ।

বৈজ্ঞানিক বলেন, অসীমের সীমা এসব কথা কবি যখন আলোচনা করেন তখন কি কবিরাজ ডাকা আবশ্যক হয় না?

আমার উত্তর এই যে, এ আলোচনা নতুন নয়। পুরাতন নজির আছে। ক্ষ্যাপার বংশ সনাতনকাল থেকে চলে আস্‌চে। তাই পুরাতন ঋষি বল্‌চেন—

অন্ধং তমঃপ্রবিশন্তি যে হবিদ্যামুপাসতে
ততো ভূয় ইব তে তমো য উ বিদ্যায়াংরতাঃ।

যে লোক অনন্তকে বাদ দিয়ে অন্তের উপাসনা করে সে অন্ধকারে ডোবে। আর যে অন্তকে বাদ দিয়ে অনন্তের উপাসনা করে সে আরো বেশি অন্ধকারে ডোবে।

বিদ্যাঞ্চাবিদ্যাঞ্চ যস্তদ্বেদোভয়ং সহ
অবিদ্যয়া মৃত্যুং তীর্ত্বা বিদ্যয়ামৃতমশ্নুতে।

অন্তকে অনন্তকে যে একত্র করে জানে সেই অন্তের মধ্য দিয়ে মৃত্যুকে উত্তীর্ণ হয় আর অনন্তের মধ্যে অমৃতকে পায়।

তাই বলে সীমা ও অসীমের ভেদ একেবারেই ঘুচিয়ে দেখাই যে দেখা তাও নয় সে কথাও আছে। তাঁরা বল্‌চেন অন্ত এবং অনন্তের পার্থক্যও আছে। পার্থক্য যদি না থাকে তবে সৃষ্টি হয় কি করে? আবার যদি বিরোধ থাকে তাহলেই বা সৃষ্টি হয় কি করে? সেই জন্যে অসীম যেখানে সীমায় আপনাকে সঙ্কুচিত করছেন সেইখানেই তাঁর সৃষ্টি, সেইখানেই তাঁর বহুত্ব—কিন্তু তাতে তাঁর অসীমতাকে তিনি ত্যাগ করেন নি।

নিজের অস্তিত্বটার কথা চিন্তা করলে একথা বোঝা সহজ হবে। আমি আমার চলাফেরা কথাবার্ত্তায় প্রতি মুহূর্ত্তে নিজেকে প্রকাশ করচি—সেই প্রকাশ আমার আপনাকে আপনার সৃষ্টি। কিন্তু সেই প্রকাশের মধ্যে আমি যেমন আছি তেমনি সেই প্রকাশকে বহুগুণে আমি অতিক্রম করে আছি। আমার এক কোটিতে অন্ত আর এক কোটিতে অনন্ত। আমার অব্যক্ত-আমি আমার ব্যক্ত-আমির যোগে সত্য। আমার ব্যক্ত-আমি আমার অব্যক্ত-আমির যোগে সত্য।

তার পরে কথা এই যে, তবে এই আমিটা কোথা থেকে আসে। সেটাও আমার সম্পূর্ণ নিজস্ব নয়। অসীম যেখানে আপনাকে সীমায় সংহত করেছেন সেখানেই অহঙ্কার। সোঽহমস্মি। সেখানেই তিনি হচ্চেন আমি আছি। অসীমের বাণী, অর্থাৎ সীমার মধ্যে অসীমের প্রকাশই হচ্চে, অহমস্মি। আমি আছি। যেখানেই হওয়ার পালা আরম্ভ হল সেখানেই আমির পালা। সমস্ত সীমার

মধ্যেই অসীম বল্‌চেন, অহমস্মি। আমি আছি, এইটেই হচ্চে সৃষ্টির ভাষা।

এই এক আমি-আছিই লক্ষ লক্ষ আমি-আছিতে ছড়িয়ে পড়েছেন—তবু তার সীমা নেই। যদিচ আমার আমি-আছি সেই মহা আমি-আছির প্রকাশ কিন্তু তাই বলে একথা বলাও চলে না যে এই প্রকাশেই তাঁর প্রকাশ সমাপ্ত। তিনি আমার আমি-আছির মধ্যেও যেমন আছেন তেমনি আমার আমি-আছিকে অতিক্রম করেও আছেন। সেই জন্যেই অগণ্য আমি-আছির মধ্যে য়োগের পথ রয়েছে। সেই জন্যেই উপনিষৎ বলেছেন, "সর্ব্বভূতের মধ্যে যে লোক আত্মাকে এবং আত্মার মধ্যে যে লোক সর্ব্বভূতকে জানে সে আর গোপন থাক্‌তে পারে না।" আপনাকে সেই জানে না যে লোক আপনাকে কেবল আপনি বলেই জানে, অন্যকেও যে আপন বলে জানে না।

তত্ত্বজ্ঞানে আমার কোনো অধিকার নেই—আমি সেদিক থেকে কিছু বলছিও নে। আমি সেই মূঢ় যে মানুষ বিচিত্রকে বিশ্বাস করে, বিশ্বকে সন্দেহ করে না। আমি নিজের প্রকৃতির ভিতর থেকেই জানি দূরও সত্য নিকটও সত্য, স্থিতিও সত্য গতিও সত্য। অণু পরমাণু যুক্তির দ্বারা বিশ্লিষ্ট এবং ইন্দ্রিয়-মনের আশ্রয় থেকে একেবারে ভ্রষ্ট হতে হতে ক্রমে আকার আয়তনের অতীত হয়ে প্রলয়-সাগরের তীরে এসে দাঁড়ায় সেটা আমার কাছে বিস্ময়কর বা মনোহর বোধ হয় না। রূপই আমার কাছে আশ্চর্য্য, রসই আমার কাছে মনোহর। সকলের চেয়ে আশ্চর্য্য এই যে আকারের ফোয়ারা নিরাকারের হৃদয় থেকে নিত্যকাল

উৎসারিত হয়ে কিছুতেই ফুরতে চাচ্ছে না। আমি এই দেখেছি যেদিন আমার হৃদয় প্রেমে পূর্ণ হয়ে উঠে সেদিন সূর্য্যালোকের উজ্জ্বলতা বেড়ে উঠে, সেদিন চন্দ্রালোকের মাধুর্য্য ঘনীভূত হয়—সেদিন সমস্ত জগতের সুর এবং তাল নতুন তানে নতুন লয়ে বাজতে থাকে—তার থেকেই বুঝতে পারি, জগৎ আমার মন দিয়ে আমার হৃদয় দিয়ে ওতপ্রোত। যে দুইয়ের যোগে সৃষ্টি হয় তার মধ্যে এক হচ্চে আমার হৃদয় মন। আমি যখন বর্ষার গান গেয়েছি তখন সেই মেঘমল্লারে জগতের সমস্ত বর্ষার অশ্রুপাতধ্বনি নবতর ভাষা এবং অপূর্ব্ব বেদনায় পূর্ণ হয়ে উঠেছে; চিত্রকরের, চিত্র, এবং কবির কাব্যে বিশ্বরহস্য নূতন রূপ এবং নূতন বেশ ধরে দেখা দিয়েছে,—তার থেকেই জেনেছি এই জগতের জল স্থল আকাশ আমার হৃদয়ের তন্তু দিয়ে বোনা, নইলে আমার ভাষার সঙ্গে এর ভাষার কোনো যোগই থাকত না; গান মিথ্যা হত, কবিত্ব মিথ্যা হত, বিশ্বও যেমন বোবা হয়ে থাক্‌ত আমার হৃদয়কেও তেমনি বোবা করে রাখত। কবি এবং গুণীদের কাজই এই যে, যারা ভুলে আছে তাদের মনে করিয়ে দেওয়া যে, জগৎটা আমি, জগৎটা আমার, ওটা রেডিয়ো-চাঞ্চল্যমাত্র নয়। তত্ত্বজ্ঞান যা বল্‌চে সে এক কথা, বিজ্ঞান যা বল্‌চে সে এক কথা, কিন্তু কবি বল্‌চে, আমার হৃদয়মনের তারে ওস্তাদ বীণা বাজাচ্চেন সেই ত এই বিশ্বসঙ্গীত, নইলে কিছুই বাজত না। বীণার তার একটি নয়—লক্ষ তারে লক্ষ সুর—কিন্তু সুরে সুরে বিরোধ নেই। এই হৃদয়মনের বীণা-যন্ত্রটি জড়যন্ত্র নয়—এ যে প্রাণবান—এই জন্য এ যে কেবল বাঁধা সুর বাজিয়ে যাচ্চে তা

নয়—এর সুর এগিয়ে চল্‌চে, এর সপ্তক বদল হচ্চে, এর তার বেড়ে যাচ্চে—এ'কে নিয়ে যে জগৎ সৃষ্টি হচ্চে সে কোথাও স্থির হয়ে নেই—কোথাও গিয়ে সে থাম্‌বে না,—সেই রসিক আপন রস দিয়ে চিরকাল এর কাছ থেকে নব নব রস আদায় করে নেবেন, এর সমস্ত সুখ সমস্ত দুঃখ সার্থক করে তুল্‌বেন। ধন্য আমি এই যে, আমি পান্থশালায় বাস করচিনে, রাজপ্রাসাদের এক কামরাতেও আমার বাস নির্দ্দিষ্ট হয়নি; এমন জগতে আমার স্থান, আমার আপনাকে দিয়ে যার সৃষ্টি; সেই জন্যই এ কেবল পঞ্চভূত বা চৌষট্টিভূতের আড্ডা নয়, এ আমার হৃদয়ের কুলায়, এ আমার প্রাণের লীলাভবন, এ আমার প্রেমের মিলনতীর্থ।

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

শেষের রাত্রি

মাসী !

ঘুমোও যতীন, রাত হল যে।

হোক না রাত, আমার দিন ত বেশি নেই। আমি বলছিলুম মণিকে তার বাপের বাড়ি—ভুলে যাচ্চি ওর বাপ এখন কোথায়—

সীতারামপুরে।

হাঁ সীতারামপুরে। সেইখানে মণিকে পাঠিয়ে দাও, আরও কত দিন ও রোগীর সেবা করবে ? ওর শরীর ত তেমন শক্ত নয়।

শোন একবার ! এই অবস্থায় তোমাকে ফেলে বউ বাপের বাড়ি যেতে চাইবেই বা কেন ?

ডাক্তারেরা কি বলেছে সে কথা কি সে—

তা সে নাই জান্‌ল—চোখে ত দেখ্‌তে পাচ্চে। সেদিন বাপের বাড়ি যাবার কথা যেমন একটু ইসারায় বলা অমনি বউ কেঁদে অস্থির।

মাসীর এই কথাটার মধ্যে সত্যের কিছু অপলাপ ছিল সে কথা বলা আবশ্যক। মণির সঙ্গে সেদিন তাঁর এই প্রসঙ্গে যে আলাপ হইয়াছিল সেটা নিম্নলিখিত মত।

বউ, তোমার বাপের বাড়ি থেকে কিছু খবর এসেছে বুঝি ? তোমার জাঠতত ভাই অনাথকে দেখ্‌লুম যেন।

হাঁ, মা বলে পাঠিয়েছেন আসচে শুক্রবারে আমার ছোট বোনের অন্নপ্রাশন। তাই ভাবচি—

বেশ ত বাছা, একগাছি সোনার হার পাঠিয়ে দাও, তোমার মা খুসি হবেন।

ভাবচি, আমি যাব। আমার ছোট বোনকে ত দেখিনি, দেখ্‌তে ইচ্ছে করে।

সে কি কথা, যতীনকে একলা ফেলে যাবে? ডাক্তার কি বলেছে শুনেছ ত?

ডাক্তার ত বলছিল, এখনো তেমন বিশেষ—

তা যাই বলুক, ওর এই দশা দেখে যাবে কি করে?

আমার তিন ভাইয়ের পরে এই একটি বোন্‌, বড় আদরের মেয়ে—শুনেছি ধুম করে অন্নপ্রাশন হবে—আমি না গেলে মা ভারি—

তোমার মায়ের ভাব, বাছা, আমি বুঝতে পারিনে। কিন্তু যতীনের এই সময়ে তুমি যদি যাও তোমার বাবা রাগ করবেন সে আমি বলে রাখচি।

তা জানি। তোমাকে একলাইন লিখে দিতে হবে, মাসী, যে কোনো ভাবনার কথা নেই—আমি গেলে বিশেষ কোনো—

তুমি গেলে কোনো ক্ষতিই নেই সে কি জানিনে? কিন্তু তোমার বাপকে যদি লিখ্‌তেই হয় আমার মনে যা আছে সব খুলেই লিখ্‌ব।

আচ্ছা বেশ—তুমি লিখোনা। আমি ওঁকে গিয়ে বল্লেই উনি—

দেখ বউ অনেক সয়েছি—কিন্তু এই নিয়ে যদি তুমি যতীনের

কাছে যাও কিছুতেই সইব না। তোমার বাবা তোমাকে ভালো রকমই চেনেন তাঁকে ভোলাতে পারবে না।

এই বলিয়া মাসি চলিয়া আসিলেন। মণি খানিকক্ষণের জন্য রাগ করিয়া বিছানার উপর পড়িয়া রহিল।

পাশের বাড়ি হইতে সই আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল, একি সই, গোসা কেন?

দেখ দেখি ভাই, আমার একমাত্র বোনের অন্নপ্রাশন—এরা আমাকে যেতে দিতে চায় না।

ওমা সে কি কথা, যাবে কোথায়? স্বামী যে রোগে শুষ্‌চে।

আমি ত কিছুই করিনে, করতে পারিও নে; বাড়িতে সবাই চুপচাপ, আমার প্রাণ হাঁপিয়ে উঠে। এমন করে আমি থাক্‌তে পারিনে তা বলচি।

তুমি ধন্যি মেয়েমানুষ যা হোক্‌।

তা আমি ভাই তোমাদের মত লোক-দেখানে ভান কর্‌তে পারিনে। পাছে কেউ কিছু মনে করে বলে মুখ-গুঁজ্‌ড়ে ঘরের কোণে পড়ে থাকা আমার কর্ম্ম নয়।

তা কি করবে শুনি?

আমি যাবই, আমাকে কেউ ধরে রাখ্‌তে পারবে না।

ইস্‌, তেজ দেখে আর বাঁচিনে। চল্লুম, আমার কাজ আছে।

২

বাপের বাড়ি যাইবার প্রসঙ্গে মণি কাঁদিয়াছে—এই খবরে যতীন বিচলিত হইয়া বালিশটাকে পিঠের কাছে টানিয়া তুলিল

এবং একটু উঠিয়া হেলান্ দিয়া বসিল। বলিল—মাসী, এই জানলাটা আরেকটু খুলে দাও, আর এই আলোটা এ ঘরে দরকার নেই।

জানলা খুলিতেই স্তব্ধ রাত্রি অনন্ত তীর্থপথের পথিকের মত রোগীর দরজার কাছে চুপ করিয়া দাঁড়াইল। কত যুগের কত মৃত্যুকালের সাক্ষী ঐ তারাগুলি যতীনের মুখের দিকে তাকাইয়া রহিল।

যতীন এই বৃহৎ অন্ধকারের পটের উপর তাহার মণির মুখখানি দেখিতে পাইল। সেই মুখের ডাগর দুটি চক্ষু মোটা মোটা জলের ফোঁটায় ভরা—সে জল যেন আর শেষ হইল না, চিরকালের জন্য ভরিয়া রহিল।

অনেকক্ষণ সে চুপ করিয়া আছে দেখিয়া মাসী নিশ্চিন্ত হইলেন। ভাবিলেন যতীনের ঘুম আসিয়াছে।

এমন সময় হঠাৎ সে বলিয়া উঠিল—মাসী, তোমরা কিন্তু বরাবর মনে করে এসেছ মণির মন চঞ্চল—আমাদের ঘরে ওর মন বসেনি। কিন্তু দেখ—

না বাবা, ভুল বুঝেছিলুম—সময় হলেই মানুষকে চেনা যায়।

মাসী!

যতীন, ঘুমোও বাবা।

আমাকে একটু ভাবতে দাও—একটু কথা কইতে দাও! বিরক্ত হোয়োনা মাসী!

আচ্ছা, বল বাবা।

আমি বল্‌ছিলুম, মানুষের নিজের মন নিজে বুঝতেই কত সময় লাগে! একদিন যখন মনে করতুম আমরা কেউ মণির মন পেলুম না তখন চুপ করে সহ্য করেছি। তোমরা তখন—

না বাবা, অমন কথা বোলো না—আমিও সহ্য করেছি।

মন ত মাটির ঢেলা নয়—কুড়িয়ে নিলেই ত নেওয়া যায় না। আমি জানতুম মণি নিজের মন এখনো বোঝেনি—কোনো একটা আঘাতে যেদিন বুঝবে সেদিন আর—

ঠিক কথা যতীন।

সেই জন্যই ওর ছেলে-মানুষিতে কোনোদিন কিছু মনে করিনি।

মাসী এ-কথার কোন উত্তর করিলেন না—কেবল মনে মনে দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিলেন। কতদিন তিনি লক্ষ্য করিয়াছেন যতীন বারান্দায় আসিয়া রাত কাটাইয়াছে, বৃষ্টির ছাঁট আসিয়াছে তবু ঘরে যায় নাই। কতদিন সে মাথা ধরিয়া বিছানায় পড়িয়া—একান্ত ইচ্ছা মণি আসিয়া মাথায় একটু হাত বুলাইয়া দেয়। মণি তখন সখীদের সঙ্গে দল-বাঁধিয়া থিয়েটার দেখিতে যাইবার আয়োজন করিতেছে। তিনি যতীনকে পাখা করিতে আসিয়াছেন সে বিরক্ত হইয়া তাঁহাকে ফিরাইয়া দিয়াছে। সেই বিরক্তির মধ্যে কত বেদনা তাহা তিনি জানিতেন। কতবার তিনি যতীনকে বলিতে চাহিয়াছেন, বাবা, তুমি ঐ মেয়েটার দিকে অত বেশি মন দিয়োনা—ও একটু চাহিতে শিখুক—মানুষকে একটু কাঁদানো চাই। কিন্তু এসব কথা বলিবার নহে, বলিলেও কেহ বোঝে না। যতীনের মনে নারীদেবতার একটি পীঠস্থান ছিল, সেইখানে

সে মণিকে বসাইয়াছে। সেই তীর্থক্ষেত্রে নারীর অমৃতপাত্র চিরদিন তাহার ভাগ্যে শূন্য থাকিতে পারে একথা মনে করা তাহার পক্ষে সহজ ছিল না। তাই পূজা চলিতেছিল, অর্ঘ্য ভরিয়া উঠিতেছিল, বরলাভের আশা পরাভব মানিতেছিল না। মাসী যখন আবার ভাবিতেছিলেন যতীন ঘুমাইয়াছে এমন সময়ে হঠাৎ সে বলিয়া উঠিল—

আমি জানি, তুমি মনে করেছিলে মণিকে নিয়ে আমি সুখী হতে পারিনি তাই তার উপর রাগ করতে। কিন্তু মাসী সুখ জিনিষটা ঐ তারাগুলির মত, সমস্ত অন্ধকার লেপে রাখে না, মাঝে মাঝে ফাঁক থেকে যায়। জীবনে কত ভুল করি, কত ভুল বুঝি, তবু তার ফাঁকে ফাঁকে কি স্বর্গের আলো জ্বলেনি? কোথা থেকে আমার মনের ভিতরটি আজ এমন আনন্দে ভরে উঠেছে?

মাসী আস্তে আস্তে যতীনের কপালে হাত বুলাইয়া দিতে লাগিলেন। অন্ধকারে তাঁহার দুই চক্ষু বাহিয়া যে জল পড়িতেছিল তাহা কেহ দেখিতে পাইল না।

আমি ভাবচি মাসী, ওর অল্প বয়স, ও কি নিয়ে থাকবে?

অল্প বয়স কিসের যতীন? এ ত ওর ঠিক বয়স। আমরাও ত বাছা অল্প বয়সেই দেবতাকে সংসারের দিকে ভাসিয়ে অন্তরের মধ্যে বসিয়েছি—তাতে ক্ষতি হয়েছে কি? তাও বলি, সুখেরই বা এত বেশি দরকার কিসের?

মাসী, মণির মনটি যেই জাগবার সময় হল অমনি আমি—

ভাব কেন, যতীন ? মন যদি জাগে তবে সেই কি কম ভাগ্য ?

হঠাৎ অনেক দিনের শোনা একটা বাউলের গান যতীনের মনে পড়িয়া গেল।

ওরে মন, যখন জাগলি না রে
তখন মনের মানুষ এল দ্বারে।
তার চলে যাবার শব্দ শুনে
ভাঙল রে ঘুম,
ও তোর ভাঙল রে ঘুম অন্ধকারে॥

মাসী, ঘড়িতে কটা বেজেছে ?

নটা বাজ্‌বে।

সবে নটা ? আমি ভাবছিলুম বুঝি দুটো, তিনটে, কি ক'টা হবে ? সন্ধ্যার পর থেকেই আমার দুপর রাত আরম্ভ হয়।—তবে তুমি আমার ঘুমের জন্যে অত ব্যস্ত হয়েছিলে কেন ?

কালও সন্ধ্যার পর এই রকম কথা কইতে কইতে কত রাত পর্য্যন্ত তোমার আর ঘুম এল না—তাই আজ তোমাকে সকাল-সকাল ঘুমতে বলচি।

মণি কি ঘুমিয়েছে ?

না, সে তোমার জন্যে মসুরির ডালের সূপ তৈরি করে তবে ঘুমতে যায়।

বল কি মাসী, মণি কি তবে—

সেই ত তোমার জন্যে সব পথ্যি তৈরি করে দেয়। তার কি বিশ্রাম আছে?

আমি ভাবতুম মণি বুঝি—

মেয়েমানুষের কি আর এসব শিখ্‌তে হয়? দায়ে পড়লেই আপনি করে নেয়।

আজ দুপুরবেলা মৌরলা-মাছের যে ঝোল হয়েছিল তাতে বড় সুন্দর একটি তার ছিল। আমি ভাবছিলুম তোমারি হাতের তৈরি।

কপাল আমার! মণি কি আমাকে কিছু করতে দেয়? তোমার গামছা তোয়ালে নিজের হাতে কেচে শুকিয়ে রাখে। জানে যে কোথাও কিছু নোংরা তুমি দেখ্‌তে পার না। তোমার বাইরের বৈঠকখানা যদি একবার দেখ তবে দেখ্‌তে পাবে মণি দুবেলা সমস্ত ঝেড়ে মুছে কেমন তক্‌তকে করে রেখে দিয়েছে। আমি যদি তোমার এ ঘরে ওকে সর্ব্বদা আস্‌তে দিতুম তাহলে কি আর রক্ষা থাক্‌ত! ও ত তাই চায়।

মণির শরীর বুঝি—

ডাক্তাররা বলে রোগীর ঘরে ওকে সর্ব্বদা আনাগোনা করতে দেওয়া কিছু নয়। ওর মন বড় নরম কি না, তোমার কষ্ট দেখ্‌লে দুদিনে যে শরীর ভেঙে পড়বে।

মাসী, ওকে তুমি ঠেকিয়ে রাখ কি করে?

আমাকে ও বড্ড মানে বলেই পারি। তবু বারবার গিয়ে খবর দিয়ে আস্‌তে হয়—ঐ আমার আরেক কাজ হয়েছে।

আকাশের তারাগুলি যেন করুণা-বিগলিত চোখের জলের মত জ্বল্‌জ্বল্‌ করিতে লাগিল। যে জীবন আজ বিদায় লইবার পথে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে যতীন তাহাকে মনে মনে কৃতজ্ঞতার প্রণাম করিল—এবং সম্মুখে মৃত্যু আসিয়া অন্ধকারের ভিতর হইতে যে দক্ষিণ হাত বাড়াইয়া দিয়াছে যতীন স্নিগ্ধ বিশ্বাসের সহিত তাহার উপরে আপনার রোগক্লান্ত হাতটি রাখিল।

একবার নিশ্বাস ফেলিয়া, একটুখানি উস্‌খুস্‌ করিয়া যতীন বলিল, মাসী, মণি যদি জেগেই থাকে তাহলে একবার যদি তাকে—

এখনি ডেকে দিচ্চি, বাবা।

আমি বেশিক্ষণ তাকে এ ঘরে রাখ্‌তে চাইনে—কেবল পাঁচ মিনিট—দুটো-একটা কথা যা বলবার আছে—

মাসী দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া মণিকে ডাকিতে আসিলেন। এদিকে যতীনের নাড়ী দ্রুত চলিতে লাগিল। যতীন জানে আজ পর্য্যন্ত সে মণির সঙ্গে ভালো করিয়া কথা জমাইতে পারে নাই। দুই যন্ত্র দুই সুরে বাঁধা, এক সঙ্গে আলাপ চলা বড় কঠিন। মণি তাহার সঙ্গিনীদের সঙ্গে অনর্গল বকিতেছে হাসিতেছে, দূর হইতে তাহাই শুনিয়া যতীনের মন কতবার ঈর্ষায় পীড়িত হইয়াছে। যতীন নিজেকেই দোষ দিয়াছে—সে কেন অমন সামান্য যাহা-তাহা লইয়া কথা কহিতে পারে না? পারে না যে তাহাও ত নহে—নিজের বন্ধুবান্ধবদের সঙ্গে যতীন সামান্য বিষয় লইয়াই কি আলাপ

করে না? কিন্তু পুরুষের যাহা-তাহা ত মেয়েদের যাহা-তাহার সঙ্গে ঠিক মেলে না। বড় কথা একলাই একটানা বলিয়া যাওয়া চলে, অন্য পক্ষ মন দিল কি-না খেয়াল না করিলেই হয়,—কিন্তু তুচ্ছ কথায় নিয়ত দুই পক্ষের যোগ থাকা চাই;—বাঁশি একাই বাজিতে পারে কিন্তু দুইয়ের মিল না থাকিলে করতালের খচমচ জমে না। এই জন্য কত সন্ধ্যাবেলায় যতীন মণির সঙ্গে যখন খোলা বারান্দায় মাদুর পাতিয়া বসিয়াছে, দুটো চারটে টানাবোনা কথার পরেই কথার সূত্র একেবারে ছিঁড়িয়া ফাঁক হইয়া গেছে; তাহার পরে সন্ধ্যার নীরবতা যেন লজ্জায় মরিতে চাহিয়াছে। যতীন বুঝিতে পারিয়াছে মণি পালাইতে পারিলে বাঁচে; মনে মনে কামনা করিয়াছে এখনি কোনো-একজন তৃতীয় ব্যক্তি যেন আসিয়া পড়ে। কেননা, দুইজনে কথা কহা কঠিন, তিনজনে সহজ।

মণি আসিলে আজ কেমন করিয়া কথা আরম্ভ করিবে যতীন তাহাই ভাবিতে লাগিল। ভাবিতে গেলে কথাগুলো কেমন অস্বাভাবিক রকম বড় হইয়া পড়ে—সে সব কথা চলিবে না। যতীনের আশঙ্কা হইতে লাগিল আজকের রাত্রের পাঁচ মিনিটও ব্যর্থ হইবে। অথচ তাহার জীবনে এমনতর নিরালা পাঁচ মিনিট আর ক'টাই বা বাকি আছে?

৩

একি বৌ, কোথাও যাচ্চ না কি?

সীতারামপুরে যাব।

সে কি কথা? কার সঙ্গে যাবে?

অনাথ নিয়ে যাচ্চে।

লক্ষ্মী-মা-আমার, তুমি যেয়ো, আমি তোমাকে বারণ করব না, কিন্তু আজ নয়।

টিকিট কিনে গাড়ি রিজার্ভ করা হয়ে গেছে।

তা হোক, ও লোকসান গায়ে সইবে—তুমি কাল সকালেই চলে যেয়ো—আজ যেয়োনা।

মাসী, আমি তোমাদের তিথি বার মানিনে, আজ গেলে দোষ কি ?

যতীন তোমাকে ডেকেছে, তোমার সঙ্গে তার একটু কথা আছে।

বেশত, এখনো একটু সময় আছে, আমি তাঁকে বলে আসচি।

না, তুমি বল্‌তে পারবে না যে যাচ্চ।

তা বেশ, কিছু বল্‌ব না, কিন্তু আমি দেরি করতে পারব না। কালই অন্নপ্রাশন—আজ যদি না যাই ত চল্‌বে না।

আমি জোড়হাত করচি বৌ, আমার কথা আজ একদিনের মত রাখ। আজ মন একটু শান্ত করে যতীনের কাছে এসে বস—তাড়াতাড়ি কোরো না।

তা কি করব বল, গাড়ি ত আমার জন্য বসে থাক্‌বে না। অনাথ চলে গেছে—দশ মিনিট পরেই সে এসে আমাকে নিয়ে যাবে। এই বেলা তাঁর সঙ্গে দেখা সেরে আসিগে।

না, তবে থাক্—তুমি যাও। এমন করে তার কাছে যেতে দেব না। ওরে অভাগিনী, তুই যাকে এত দুঃখ দিলি সে ত সব বিসর্জ্জন দিয়ে আজ বাদে কাল চলে যাবে—কিন্তু যত দিন বেঁচে থাক্‌বি এ দিনের কথা তোকে চিরদিন মনে রাখ্‌তে

হবে—ভগবান আছেন, ভগবান আছেন, সে কথা একদিন বুঝবি।

মাসী, তুমি অমন করে শাপ দিয়ো না বলচি!

ওরে বাপ্‌রে, আর কেন বেঁচে আছিস্‌রে বাপ? পাপের যে শেষ নেই—আমি আর ঠেকিয়ে রাখ্‌তে পারলুম না।

মাসী একটু দেরি করিয়া রোগীর ঘরে গেলেন। আশা করিলেন যতীন ঘুমাইয়া পড়িবে। কিন্তু ঘরে ঢুকিতেই দেখিলেন বিছানার উপর যতীন নড়িয়া-চড়িয়া উঠিল। মাসী বলিলেন, এই এক কাণ্ড করে বসেছে।

কি হয়েছে? মণি এল না? এত দেরি করলে কেন মাসী?

গিয়ে দেখি সে তোমার দুধ জ্বাল দিতে গিয়ে পুড়িয়ে ফেলেছে বলে কান্না। আমি বলি, হয়েছে কি, আরো ত দুধ আছে। কিন্তু অসাবধান হয়ে তোমার খাবার দুধ পুড়িয়ে ফেলেছে বৌয়ের এ লজ্জা আর কিছুতেই যায় না। আমি তাকে অনেক করে ঠাণ্ডা করে বিছানায় শুইয়ে রেখে এসেছি। আজ আর তাকে আন্‌লুম না। সে একটু ঘুমোক্।

মণি আসিল না বলিয়া যতীনের বুকের মধ্যে যেমন বাজিল, তেমনি সে আরামও পাইল। তাহার মনে আশঙ্কা ছিল যে, পাছে মণি সশরীরে আসিয়া মণির ধ্যান-মাধুরীটুকুর প্রতি জুলুম করিয়া যায়। কেননা, তাহার জীবনে এমন অনেকবার ঘটিয়াছে। দুধ পুড়াইয়া ফেলিয়া মণির কোমল হৃদয় অনুতাপে ব্যথিত

হইয়া উঠিয়াছে ইহারই রসটুকুতে তাহার হৃদয় ভরিয়া ভরিয়া উঠিতে লাগিল।

মাসী!

কি বাবা?

আমি বেশ জান্‌চি আমার দিন শেষ হয়ে এসেছে। কিন্তু আমার মনে কোনো খেদ নেই। তুমি আমার জন্যে শোক কোরো না।

না বাবা, আমি শোক করব না। জীবনেই যে মঙ্গল আর, মরণে যে নয় একথা আমি মনে করিনে।

মাসী তোমাকে সত্য বলছি মৃত্যুকে আমার মধুর মনে হচ্চে।

অন্ধকার আকাশের দিকে তাকাইয়া যতীন দেখিতেছিল, তাহার মণিই আজ মৃত্যুর বেশ ধরিয়া আসিয়া দাঁড়াইয়াছে। সে আজ অক্ষয় যৌবনে পূর্ণ—সে গৃহিণী, সে জননী; সে রূপসী, সে কল্যাণী। তাহারই এলোচুলের উপরে ঐ আকাশের তারাগুলি লক্ষ্মীর স্বহস্তের আশীর্ব্বাদের মালা। তাহাদের দুজনের মাথার উপরে এই অন্ধকারের মঙ্গলবস্ত্রখানি মেলিয়া ধরিয়া আবার যেন নূতন করিয়া শুভদৃষ্টি হইল। রাত্রির এই বিপুল অন্ধকার ভরিয়া গেল মণির অনিমেষ প্রেমের দৃষ্টিপাতে। এই ঘরের বধূ মণি, এই একটুখানি মণি, আজ বিশ্বরূপ ধরিল—জীবন-মরণের সঙ্গমতীর্থে ঐ নক্ষত্র-বেদীর উপরে সে বসিল—নিস্তব্ধ রাত্রি মঙ্গলঘটের মত পুণ্যধারায় ভরিয়া উঠিল।—যতীন জোড়হাত করিয়া মনে মনে

কহিল, এতদিনের পর ঘোমটা খুলিল, এই ঘোর অন্ধকারের মধ্যে আবরণ ঘুচিল—অনেক কাঁদাইয়াছ—সুন্দর হে সুন্দর, তুমি আর ফাঁকি দিতে পারিবে না!

৪

কষ্ট হচ্চে, মাসী, কিন্তু যত কষ্ট মনে করচ তার কিছুই নয়। আমার সঙ্গে আমার কষ্টের ক্রমশই যেন বিচ্ছেদ হয়ে আস্‌চে। বোঝাই-নৌকার মত এতদিন সে আমার জীবন-জাহাজের সঙ্গে বাঁধা ছিল—আজ যেন বাঁধন কাটা পড়েছে—সে আমার সব বোঝা নিয়ে দূরে ভেসে চল্‌ল। এখ্‌নো তাকে দেখ্‌তে পাচ্চি কিন্তু তাকে যেন আর আমার বলে মনে হচ্চে না—এ দুদিন মণিকে একবারও দেখিনি মাসী।

পিঠের কাছে আর-একটা বালিশ দেব কি যতীন?

আমার মনে হচ্চে, মাসী, মণিও যেন চলে গেছে। আমার বাঁধন-ছেঁড়া দুঃখের নৌকাটির মত।

বাবা, একটু বেদানার রস খাও, তোমার গলা শুকিয়ে আস্‌চে।

আমার উইলটা কাল লেখা হয়ে গেছে—সে কি আমি তোমাকে দেখিয়েছি—ঠিক মনে পড়চে না।

আমার দেখবার দরকার নেই যতীন।

মা যখন মারা যান আমার ত কিছুই ছিল না। তোমার খেয়ে তোমার হাতে আমি মানুষ। তাই বলছিলুম—

সে আবার কি কথা? আমার ত কেবল এই একখানা বাড়ি আর সামান্য কিছু সম্পত্তি ছিল। বাকি সবই ত তোমার নিজের রোজগার।

কিন্তু এই বাড়িটা—

কিসের বাড়ি আমার! কত দালান তুমি বাড়িয়েছ, আমার সেটুকু কোথায় আছে খুঁজেই পাওয়া যায় না।

মণি তোমাকে ভিতরে ভিতরে খুব—

সে কি জানিনে, যতীন? তুই এখন ঘুমো।

আমি মাণিকে সব লিখে দিলুম বটে কিন্তু তোমারি সব রইল মাসী। ও ত তোমাকে কখনো অমান্য কর্‌বে না।

সেজন্যে অত ভাবচ কেন, বাছা।

তোমার আশীর্ব্বাদেই আমার সব, তুমি আমার উইল দেখে এমন কথা কোনোদিন মনে কোরো না—

ওকি কথা যতীন? তোমার জিনিষ তুমি মণিকে দিয়েছ বলে আমি মনে করব? আমার এম্‌নি পোড়া মন? তোমার জিনিষ ওর নামে লিখে দিয়ে যেতে পারচ বলে তোমার যে সুখ সেই ত আমার সকল সুখের বেশি, বাপ।

কিন্তু তোমাকেও আমি—

দেখ্‌ যতীন, এইবার আমি রাগ করব। তুই চলে যাবি আর তুই আমাকে টাকা দিয়ে ভুলিয়ে রেখে যাবি?

মাসী, টাকার চেয়ে আরো বড় যদি কিছু তোমাকে—

দিয়েছিস্‌, যতীন, ঢের দিয়েছিস্‌। আমার শূন্য ঘর ভরে ছিলি এ আমার অনেক জন্মের ভাগ্য। এতদিন ত বুক ভরে পেয়েছি, আজ আমার পাওনা যদি ফুরিয়ে গিয়ে থাকে ত নালিশ করব না। দাও, সব লিখে দাও, লিখে দাও—বাড়িঘর, জিনিষপত্র, ঘোড়াগাড়ি, তালুকমুলুক,—যা আছে সব মণির নামে লিখে দাও —এ সব বোঝা আমার সইবে না।

তোমার ভোগে রুচি নেই—কিন্তু মণির বয়স অল্প তাই—

ও কথা বলিস্‌নে, ও কথা বলিস্‌নে। ধনসম্পদ দিতে চাস্ দে কিন্তু ভোগ করা—

কেন ভোগ করবে না মাসী ?

না গো না, পারবে না, পারবে না! আমি বলচি ওর মুখে রুচবে না! গলা শুকিয়ে কাঠ হয়ে যাবে, কিছুতে কোনো রস পাবে না।

যতীন চুপ করিয়া রহিল। তাহার অভাবে সংসারটা মণির কাছে একেবারে বিস্বাদ হইয়া যাইবে এ কথা সত্য কি মিথ্যা, সুখের কি দুঃখের, তাহা সে যেন ভাবিয়া ঠিক করিতে পারিল না। আকাশের তারা যেন তাহার হৃদয়ের মধ্যে আসিয়া কানে কানে বলিল, এমনিই বটে,—আমরা ত হাজার হাজার বছর হইতে দেখিয়া আসিলাম, সংসার-জোড়া এই সমস্ত আয়োজন এত-বড়ই ফাঁকি।

যতীন গভীর একটা নিঃশ্বাস ফেলিয়া বলিল, দেবার মত জিনিষ ত আমরা কিছুই দিয়ে যেতে পারিনে।

কম কি দিয়ে যাচ্চ বাছা? এই ঘরবাড়ি টাকাকড়ির ছল করে তুমি ওকে যে কি দিয়ে গেলে তার মূল্য ও কি কোনো দিন বুঝবে না? যা তুমি দিয়েছ তাই মাথা পেতে নেবার শক্তি বিধাতা ওকে দিন এই আশীর্ব্বাদ ওকে করি।

আর একটু বেদানার রস দাও, আমার গলা শুকিয়ে এসেছে। মণি কি কাল এসেছিল—আমার ঠিক মনে পড়চে না।

এসেছিল। তখন তুমি ঘুমিয়ে পড়েছিলে। শিয়রের কাছে বসে বসে অনেকক্ষণ বাতাস করে তার পরে ধোবাকে তোমার কাপড় দিতে গেল।

আশ্চর্য্য! বোধ হয় আমি ঠিক সেই সময়েই স্বপ্ন দেখছিলুম যেন মণি আমার ঘরে আস্‌তে চাচ্চে—দরজা অল্প-একটু ফাঁক হয়েছে—ঠেলাঠেলি করচে কিন্তু কিছুতেই সেইটুকুর বেশি আর খুল্‌চে না। কিন্তু মাসী তোমরা একটু বাড়াবাড়ি করচ—ওকে দেখ্‌তে দাও যে আমি মরচি—নইলে মৃত্যুকে হঠাৎ সইতে পারবে না।

বাবা, তোমার পায়ের উপরে এই পশমের শালটা টেনে দিই—পায়ের তেলো ঠাণ্ডা হয়ে গেছে।

না, মাসী, গায়ের উপর কিছু দিতে ভালো লাগচে না।

জানিস্ যতীন এই শালটা মণির তৈরি। এতদিন রাত জেগে জেগে সে তোমার জন্যে তৈরি করছিল। কাল শেষ করেছে।

যতীন শালটা লইয়া দুই হাত দিয়া একটু নাড়াচাড়া করিল। মনে হইল পশমের কোমলতা যেন মণির মনের জিনিষ—সে যে যতীনকে মনে করিয়া রাত জাগিয়া এইটি বুনিয়াছে—তাহার মনের সেই প্রেমের ভাবনাটি ইহার সঙ্গে গাঁথা পড়িয়াছে। কেবল পশম দিয়া নহে মণির কোমল আঙুলের স্পর্শ দিয়া ইহা বোনা। তাই মাসী যখন শালটা তাহার পায়ের উপর টানিয়া দিলেন তখন তাহার মনে হইল, মণিই রাত্রির পর রাত্রি জাগিয়া তাহার পদসেবা করিতেছে।

কিন্তু মাসী, আমিত জানতুম মণি শেলাই করতে পারে না—সে শেলাই করতে ভালোই বাসে না।

মন দিলে শিখ্‌তে কতক্ষণ লাগে? তাকে দেখিয়ে দিতে হয়েছে —ওর মধ্যে অনেক ভুল শেলাইও আছে।

তা ভুল থাক্‌না। ও ত প্যারিস্ এক্‌জিবিসনে পাঠানো হবে না—ভুল-শেলাই দিয়ে আমার পা ঢাকা বেশ চল্‌বে।

শেলাইয়ে যে অনেক ভুল ত্রুটি আছে সেই কথা মনে করিয়াই যতীনের আরো বেশি আনন্দ হইল। বেচারা মণি পারে না, জানে না, বার বার ভুল করিতেছে, তবু ধৈর্য্য ধরিয়া রাত্রির পর রাত্রি শেলাই করিয়া চলিয়াছে—এই কল্পনাটি তাহার কাছে বড় করুণ বড় মধুর লাগিল। এই ভুলে-ভরা শালটাকে আবার সে একটু নাড়িয়া-চাড়িয়া লইল।

মাসী ডাক্তার বুঝি নীচের ঘরে?

হাঁ, যতীন, আজ রাত্রে থাক্‌বেন।

কিন্তু আমাকে যেন মিছামিছি ঘুমের ওষুধ দেওয়া না হয়। দেখেছ ত ওতে আমার ঘুম হয় না কেবল কষ্ট বাড়ে। আমাকে ভালো করে জেগে থাক্‌তে দাও। জান মাসী, বৈশাখ-দ্বাদশীর রাত্রে আমাদের বিয়ে হয়েছিল—কাল সেই দ্বাদশী আস্‌চে—কাল সেই দিনকার রাত্রের সব তারা আকাশে জ্বালানো হবে। মণির বোধ হয় মনে নেই—আমি তাকে সেই কথাটি আজ মনে করিয়ে

দিতে চাই ;—কেবল তাকে তুমি দু মিনিটের জন্যে ডেকে দাও। চুপ করে রইলে কেন? বোধ হয় ডাক্তার তোমাদের বলেছে আমার শরীর দুর্ব্বল এখন যাতে আমার মনে কোনো—কিন্তু আমি তোমাকে নিশ্চয় বলচি মাসী, আজ রাত্রে তার সঙ্গে দুটি কথা কয়ে নিতে পারলে আমার মন খুব শান্ত হয়ে যাবে—তাহলে বোধ হয় আর ঘুমোবার ওষুধ দিতে হবে না। আমার মন তাকে কিছু বল্‌তে চাচ্চে বলেই এই দু রাত্রি আমার ঘুম হয়নি। মাসী তুমি অমন করে কেঁদোনা। আমি বেশ আছি, আমার মন আজ যেমন ভরে উঠেছে আমার জীবনে এমন আর কখনই হয়নি। সেই জন্যই আমি মণিকে ডাকচি। মনে হচ্চে আজ যেন আমার ভরা হৃদয়টি তার হাতে দিয়ে যেতে পারব। তাকে অনেক দিন অনেক কথা বল্‌তে চেয়েছিলুম, বল্‌তে পারিনি কিন্তু আর এক মুহূর্ত্ত দেরি করা নয়, তাকে এখনি ডেকে দাও—এর পরে আর সময় পাব না।—না মাসী, তোমার ঐ কান্না আমি সইতে পারিনে। এতদিন ত শান্ত ছিলে, আজ কেন তোমার এমন হল?

ওরে যতীন, ভেবেছিলুম আমার সব কান্না ফুরিয়ে গেছে—কিন্তু দেখ্‌তে পাচ্চি এখনো বাকী আছে, আজ আর পারচিনে।

মণিকে ডেকে দাও—তাকে বলে দেব কালকের রাতের জন্যে যেন—

যাচ্চি বাবা। শম্ভু দরজার কাছে রইল, যদি কিছু দরকার হয় ওকে ডেকো।

মাসী মণির শোবার ঘরে গিয়া মেজের উপর বসিয়া ডাকিতে লাগিলেন—ওরে আয়—একবার আয়—আয়রে, রাক্ষসী যে তোকে

তার সব দিয়েছে তার শেষ কথাটি রাখ্—সে মরতে বসেছে তাকে আর মারিস্‌নে।

যতীন পায়ের শব্দে চমকিয়া উঠিয়া কহিল—মণি!

না আমি শম্ভু, আমাকে ডাকছিলেন?

একবার তোর বৌ-ঠাকরুণকে ডেকে দে।

কাকে?

বৌ-ঠাকরুণকে।

তিনি ত এখনো ফেরেননি।

কোথায় গেছেন?

সীতারামপুরে।

আজ গেছেন?

না আজ তিনদিন হল গেছেন।

ক্ষণকালের জন্য যতীনের সর্ব্বাঙ্গ ঝিম্‌ঝিম্ করিয়া আসিল—সে চোখে অন্ধকার দেখিল। এতক্ষণ বালিশে ঠেসান দিয়া বসিয়াছিল, শুইয়া পড়িল। পায়ের উপর সেই পশমের শাল ঢাকা ছিল সেটা পা দিয়া ঠেলিয়া ফেলিয়া দিল।

অনেকক্ষণ পরে মাসী যখন আসিলেন যতীন মণির কথা কিছুই বলিল না। মাসী ভাবিলেন সে কথা উহার মনে নাই।

হঠাৎ যতীন এক সময়ে বলিয়া উঠিল, মাসী, তোমাকে কি আমার সেদিনকার স্বপ্নের কথা বলেছি?

কোন্ স্বপ্ন ?

মণি যেন আমার ঘরে আসবার জন্য দরজা ঠেলছিল—কোনো মতেই দরজা এতটুকুর বেশি ফাঁক হলনা সে বাইরে দাঁড়িয়ে দেখ্‌তে লাগ্‌ল কিন্তু কিছুতেই ঢুক্‌তে পারল না। মণি চিরকাল আমার ঘরের বাইরেই দাঁড়িয়ে রইল। তাকে অনেক করে ডাকলুম কিন্তু এখানে তার জায়গা হল না।

মাসী কিছু না বলিয়া চুপ করিয়া রহিলেন। ভাবিলেন যতীনের জন্য মিথ্যা দিয়া যে একটুখানি স্বর্গ রচিতেছিলাম সে আর টিঁকিল না। দুঃখ যখন আসে তাহাকে স্বীকার করাই ভালো—প্রবঞ্চনার দ্বারা বিধাতার মার ঠেকাইবার চেষ্টা করা কিছু নয়।

মাসী, তোমার কাছে যে স্নেহ পেয়েছি সে আমার জন্মজন্মান্তরের পাথেয়। আমার সমস্ত জীবন ভরে নিয়ে চল্লুম। আর-জন্মে তুমি নিশ্চয় আমার মেয়ে হয়ে জন্মাবে, আমি তোমাকে বুকে করে মানুষ করব।

বলিস্ কি যতীন, আবার মেয়ে হয়ে জন্মাব ?—না হয়, তোরি কোলে ছেলে হয়েই জন্ম হবে—সেই কামনাই কর্‌না।

না, না, ছেলে না। ছেলেবেলায় তুমি যেমন সুন্দরী ছিলে তেমনি অপরূপ সুন্দরী হয়েই তুমি আমার ঘরে আস্‌বে। আমার মনে আছে আমি তোমাকে কেমন করে সাজাব।

আর বকিস্‌নে যতীন বকিস্‌নে—একটু ঘুমো।

তোমার নাম দেব, লক্ষ্মীরাণী।

ও ত একেলে নাম হল না।

না, একেলে নাম না। মাসী তুমি আমার সাবেককেলে ;—সেই সাবেককাল নিয়েই তুমি আমার ঘরে এস।

তোর ঘরে আমি কন্যাদায়ের দুঃখ নিয়ে আস্‌ব এ কামনা আমি ত করতে পারিনে।

মাসী তুমি আমাকে দুর্ব্বল মনে কর,—আমাকে দুঃখ থেকে বাঁচাতে চাও ?

বাছা, আমার যে মেয়েমানুষের মন, আমিই দুর্ব্বল—সেই জন্যেই আমি বড় ভয়ে ভয়ে তোকে সকল দুঃখ থেকে চিরদিন বাঁচাতে চেয়েছি। কিন্তু আমার সাধ্য কি আছে ? কিছুই করতে পারিনি।

মাসী, এ জীবনের শিক্ষা আমি এ জীবনে খাটাবার সময় পেলুম না। কিন্তু এ সমস্তই জমা রইল, আস্‌চে বারে, মানুষ যে কি পারে তা আমি দেখাব। চিরটা দিন নিজের দিকে তাকিয়ে থাকা যে কি ফাঁকি তা আমি বুঝেছি।

যাই বল বাছা, তুমি নিজে কিছু নাওনি, পরকেই সব দিয়েছ।

মাসী, একটা গর্ব্ব আমি করব আমি সুখের উপরে জবরদস্তি করিনি—কোনো দিন এ কথা বলিনি যেখানে আমার দাবী আছে সেখানে আমি জোর খাটাব। যা পাইনি তা কাড়াকাড়ি করিনি। আমি সেই জিনিষ চেয়েছিলুম যার উপরে কারো স্বত্ব নেই—সমস্ত জীবন হাতজোড় করে অপেক্ষাই করলুম ; মিথ্যাকে চাইনি বলেই এতদিন এমন করে বসে থাক্‌তে হল—এইবার সত্য হয় ত দয়া করবেন। ও কেও—মাসী, ও কে ?

কই, কেউ ত না যতীন।

মাসী, তুমি একবার ওঘরটা দেখে এস গে, আমি যেন—

না বাছা, কাউকে ত দেখ্‌লুম না।

আমি কিন্তু স্পষ্ট যেন—

কিচ্ছু না যতীন—ঐ যে ডাক্তার বাবু এসেছেন।

দেখুন আপনি ওঁর কাছে থাক্‌লে উনি বড় বেশি কথা কন্। কয়রাত্রি এমনি করে ত জেগেই কাটালেন। আপনি শুতে যান, আমার সেই লোকটি এখানে থাক্‌বে।

না মাসী না, তুমি যেতে পাবে না।

আচ্ছা, বাছা, আমি না হয় ঐ কোণটাতে গিয়ে বসচি।

না, না, তুমি আমার পাশেই বসে থাক—আমি তোমার এ হাত কিছুতেই ছাড়চিনে—শেষ পর্য্যন্ত না। আমি যে তোমারই হাতের মানুষ, তোমারই হাত থেকে ভগবান আমাকে নেবেন।

আচ্ছা বেশ, কিন্তু আপনি কথা কবেন না, যতীন বাবু। সেই ওষুধটা খাওয়াবার সময় হল—

সময় হল? মিথ্যা কথা। সময় পার হয়ে গেছে—এখন ওষুধ খাওয়ানো কেবল ফাঁকি দিয়ে সান্ত্বনা করা। আমার তার কোনো দরকার নেই। আমি মরতে ভয় করিনে। মাসী, যমের চিকিৎসা চল্‌চে, তার উপরে আবার সব ডাক্তার জড় করেছ কেন—বিদায় করে দাও, সব বিদায় করে দাও। এখন আমার একমাত্র তুমি—আর আমার কাউকে দরকার নেই—কাউকে না—কোনো মিথ্যাকেই না।

আপনার এই উত্তেজনা ভালো হচ্চে না।

তাহলে তোমরা যাও—আমাকে উত্তেজিত কোরোনা। মাসী, ডাক্তার গেছে? আচ্ছা, তাহলে তুমি এই বিছানায় উঠে বোসো—আমি তোমার কোলে মাথা দিয়ে একটু শুই।

আচ্ছা, শোও বাবা, লক্ষ্মীটি, একটু ঘুমোও।

না মাসী, ঘুমতে বোলোনা—ঘুমতে ঘুমতে হয় ত আর ঘুম ভাঙবে না। এখনো আর-একটু আমার জেগে থাকবার দরকার আছে। তুমি শব্দ শুন্‌তে পাচ্চনা? ঐ যে আস্‌চে। এখনি আস্‌বে।

৫

বাবা যতীন, একটু চেয়ে দেখ—ঐ যে এসেছে। একবারটি চাও!

কে এসেছে? স্বপ্ন?

স্বপ্ন নয় বাবা, মণি এসেছে—তোমার শ্বশুর এসেছেন।

তুমি কে?

চিন্‌তে পারচ না বাবা, ঐ ত তোমার মণি।

মণি, সেই দরজাটা কি সব খুলে গিয়েছে?

সব খুলেছে, বাপ আমার, সব খুলেছে।

না মাসী, আমার পায়ের উপর ও শাল নয়, ও শাল নয়, ও শাল মিথ্যে, ও শাল ফাঁকি।

শাল নয়, যতীন। বউ তোর পায়ের উপর পড়েছে—ওর মাথায় হাত রেখে একটু আশীর্ব্বাদ কর্।—অমন করে কাঁদিস্‌নে বৌ, কাঁদবার সময় আস্‌চে—এখন একটুখানি চুপ কর্!

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

উত্তরাপথে রাষ্ট্রীয় ঐক্য

উত্তরাপথের মানচিত্রের দিকে,—হিমালয় হইতে বিন্ধ্য পর্য্যন্ত, সিন্ধুনদ হইতে ব্রহ্মপুত্র পর্য্যন্ত,—বিস্তৃত সমতল ক্ষেত্রের দিকে তাকাইলে, একটি কথা মনে আসে। সে কথাটি এই যে,—সৃষ্টিকর্ত্তা যেন এই বিস্তীর্ণ ভূভাগ একচ্ছত্র অখণ্ড রাজ্যরূপে শাসিত হইবার জন্য সৃষ্টি করিয়াছেন। সুরক্ষিত খণ্ড-রাজ্যের দুর্ভেদ্য সীমান্তের বা প্রাচীর-পরিখার উদ্দেশ্য সাধন করিতে পারে, এমন পাহাড়-পর্ব্বত বা সাগর এই ভূভাগের ভিতরে কোথাও নাই। ইহাকে খণ্ড খণ্ড করিয়া ভাগ করিতে গেলেই অন্তর্দ্রোহ এবং সর্ব্বাঙ্গীন দুর্ব্বলতা অবশ্যম্ভাবী। কিন্তু প্রকৃতির এই ইঙ্গিত বুঝিয়া চলিতে প্রাচীনদিগের অনেক দিন লাগিয়াছিল, এবং অপ্রাচীনেরা এই ইঙ্গিতের অনুসরণ করিতে পারেন নাই বলিয়াই, মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছিলেন। এখানে প্রাচীনদিগের কথাই বলিব।

মনুষ্য-সমাজে যে সকল স্মরণীয় ঘটনা ঘটে, তাহার অবিকৃত বিবরণের নাম ইতিহাস। প্রত্যক্ষকারীর কথা বা প্রমাণ ঐতিহাসিক বিবরণের উপজীব্য। আমাদের দেশের ইতিহাসের উপদানের প্রাচীনতম আকর ঋগ্বেদ। ঋগ্বেদই আমাদের ইতিহাসের প্রথম অধ্যায়ের অবলম্বন। এই প্রথম অধ্যায়ে উত্তরাপথব্যাপী কোনও অখণ্ড রাজ্যের পরিচয় পাওয়া যায় না;—উত্তরাপথের এক-কোণের গুটিকয়েক খণ্ড-রাজ্যের পরিচয় পাওয়া যায়। ঋগ্বেদের ঋষিরা

গঙ্গা চিনিতেন,—সরযু চিনিতেন,—মগধও (কীকট) জানিতেন; কিন্তু তাঁহাদের লীলাক্ষেত্র যমুনার পশ্চিমদিকেই সীমাবদ্ধ ছিল।

ঋগ্বেদের যুগের আর্য্য-ভূমি একস্থলে (৮।২৪।২৭) "সপ্ত-সিন্ধবঃ" নামে উল্লিখিত হইয়াছে। এখন সেই দেশের নাম পঞ্জাব। এই সপ্তসিন্ধুর দেশও যে কখনও একজন রাজার একচ্ছত্র-শাসনাধীনে ছিল, ঋগ্বেদে এরূপ আভাস পাওয়া যায় না। তখনও করভারবাহী বৈশ্য এবং ক্রীতদাসের ন্যায় সেবানিরত শূদ্রবর্ণের অভ্যুদয় হয় নাই। ঠিক নামতঃ না হউক, কার্য্যতঃ তখন ছিল—এক দিকে ব্রাহ্মণ এবং ক্ষত্রিয়, অপর দিকে অনার্য্য দস্যু (নিষাদ)। তখনকার ক্ষত্রিয়-সমাজ কতকগুলি "গণে" বিভক্ত ছিল। এক একটি "গণের" এক একজন রাজা ছিলেন। যদিও জনগণ বহু পূর্ব্বেই যাযাবরবৃত্তি ত্যাগ করিয়া গ্রামবাসী হইয়াছিল, তথাপি তখনকার নরপালগণকে রাষ্ট্রাধিপ না বলিয়া "গণাধিপ" বলাই সঙ্গত। ঋকসংহিতায় অনেকগুলি স্বতন্ত্র "গণের" নাম আছে। তন্মধ্যে ভরত-তৃৎসু, পূরু, যদু, তুর্ব্বস, ক্রিবি (পঞ্চাল), মৎস্য, চেদি বিশেষ প্রসিদ্ধ। এই সকল "গণপালগণের" মধ্যে ভরত-তৃৎসু-গণের পতি সুদাস পৈজবন (পিজবনের পুত্র) একসময় সর্ব্বাপেক্ষা পরাক্রান্ত হইয়া উঠিয়াছিলেন। ঋগ্বেদের একটি সূক্ত (৭।১৮) হইতে জানা যায়,—সুদাস পরুষ্ণী নদীর (বর্ত্তমান রাবি) তীরে পূরু, যদু, তুর্ব্বস প্রভৃতি গণাধিপগণকে যুদ্ধে পরাভূত করিয়াছিলেন। এই যুদ্ধ ঋগ্বেদে এবং অথর্ব্ববেদে "দাশরাজ্ঞ" বা "দশ জন রাজার সহিত যুদ্ধ" নামে উল্লিখিত হইয়াছে। এই একই সূক্তে সুদাসের যমুনানদীর তীরে যুদ্ধের জয়লাভের কথাও আছে। এই সকল যুদ্ধের ফলে সুদাস ইরাবতী (রাবি) হইতে যমুনার তীর

পর্য্যন্ত বিস্তৃত ভূভাগে প্রাধান্য লাভ করিয়াছিলেন এরূপ অনুমান করা যাইতে পারে। কিন্তু সুদাসকর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত তৃৎসু-প্রাধান্য অধিক কাল স্থায়ী হয় নাই। পূরুগণ সরস্বতী-তীরে বাস করিতেন। পূরুরাজ পুরুকুৎস এবং সুদাস এক-সময়ের লোক। "দাশরাজ্ঞ" যুদ্ধে পূরুরাজও উপস্থিত ছিলেন। এই যুদ্ধে পরাজয়ের ফলেই হয়ত পূরুগণের যে দুর্দ্দশা উপস্থিত হইয়াছিল পুরুকুৎসের পুত্র ত্রসদস্যু তাহা হইতে স্বগণকে উদ্ধার করিয়াছিলেন। অপরপক্ষে বশিষ্ঠকর্ত্তৃক সুদাসের পুত্রগণ পরাভূত হইয়াছিলেন।

ঋগ্বেদের পরবর্ত্তী বৈদিক গ্রন্থনিচয়ের রচনাকালে আর্য্য-সভ্যতার কেন্দ্র, সরস্বতী নদীর পশ্চিম দিক হইতে সরিয়া যমুনার এবং গঙ্গার সলিলধৌত "মধ্যদেশে" আসিয়া পড়িয়াছিল। কিন্তু তখনকার আর্য্যাবর্ত্তও কতকগুলি খণ্ড-রাজ্যেই বিভক্ত ছিল। এই সকল রাজ্য মধ্যে কেকয়, উশীনর, কুরু, পঞ্চাল, মৎস্য, বশ, সাত্বত, চেদি, কোশল, কাশী এবং বিদেহই প্রধান। উত্তর-পশ্চিমে গন্ধার এবং পূর্ব্ব-দক্ষিণে মগধ এবং অঙ্গ বৈদিক-আর্য্যগণের সুপরিচিত হইলেও বাহ্যদেশ বলিয়া গণ্য হইত। ঋগ্বেদোক্ত ক্রিবিগণ পঞ্চালগণে পরিণত হইয়াছিলেন, এবং তুর্ব্বসগণ তাঁহাদের সহিত মিলিত হইয়াছিলেন। পূরুগণ কুরুগণে পরিণত হইয়াছিলেন এবং ভরতগণ তাঁহাদের সহিত মিশিয়া যাইতে ছিলেন। ঋগ্বেদোক্ত যদুগণ সাত্বত নামে পরিচিত হইয়াছিলেন। মহাভারতে যাদবগণকেই সাত্বত বলা হইয়াছে। কিন্তু বৈদিকযুগের এই শেষ-ভাগেও কেহ যে কখন খণ্ড-রাজ্যনিচয়কে ভাঙ্গিয়াচুরিয়া উত্তরাপথে রাষ্ট্রীয় ঐক্যের উপর প্রতিষ্ঠিত সাম্রাজ্য গড়িয়া তুলিতে সমর্থ হইয়াছিলেন এরূপ প্রমাণ কোথায়ও পাওয়া যায় না।

ঋগ্বেদে, যজুর্ব্বেদে, এবং ব্রাহ্মণভাগে "সম্রাজ্"-শব্দ অনেকবার ব্যবহৃত হইয়াছে; কিন্তু এইসকল স্থলে সম্রাট্-শব্দ সার্ব্বভৌম বা একাধীশ্বর অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে বলিয়া মনে হয় না; অধিকতর বা অসাধারণ পরাক্রমশালী রাজা অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে। ঋগ্বেদের ষষ্ঠ-মণ্ডলে পার্থবগণের অধিপতি অভ্যাবর্ত্তী-চায়মানকে 'সম্রাট্' বলা হইয়াছে (২৭।৮)। এই অভ্যাবর্ত্তী-চায়মান বৃচীবৎগণের অধিনায়ক বরশিখকে পরাভূত করিয়াছিলেন। কিন্তু এই একই সূক্তে সৃঞ্জয়-দৈববাতকর্তৃক তুর্বশ এবং বৃচীবৎগণের পরাজয়ের কথাও আছে। সম্রাট অভ্যাবর্ত্তী-চায়মান যদি সৃঞ্জয়-দৈববাত হইতে অভিন্ন ব্যক্তিও হয়েন, তথাপি তুর্বশগণ এবং বৃচীবৎগণকে পরাজিত করিয়াই যে তিনি ঋগ্বেদোক্ত "সপ্তসিন্ধবঃ" দেশের একাধিপতি হইতে পারিয়াছিলেন, এরূপ মনে করা যায় না। শতপথব্রাহ্মণে (৫।১।১।১২—১৪) বাজপেয় যজ্ঞ প্রসঙ্গে রাজায় এবং সম্রাটে, রাজ্যে এবং সাম্রাজ্যে, তুলনা করা হইয়াছে। যথা—

"রাজার (যজ্ঞ) রাজসূয়। রাজা রাজসূয় যজ্ঞ করিয়া রাজা হয়েন। ব্রাহ্মণ রাজ্যের অধিকারী নয়। রাজসূয় যজ্ঞ নিকৃষ্ট (অবর), বাজপেয় যজ্ঞ উৎকৃষ্ট (পর)।

"রাজসূয় যজ্ঞ করিয়া রাজা হয়, বাজপেয় যজ্ঞ করিয়া সম্রাট্ হয়। রাজ্য (রাজপদ) নিকৃষ্ট, সাম্রাজ্য (সম্রাজপদ) উৎকৃষ্ট। রাজা সম্রাট্ হইতে কামনা করেন; কারণ রাজ্য নিকৃষ্ট, সাম্রাজ্য উৎকৃষ্ট।

"যে বাজপেয় যজ্ঞ করিয়া সম্রাট হয়, সে এই সমস্ত বশীভূত করে (ইদং সর্ব্বং সংবৃঙ্‌ক্তে)।"

বাজপেয় সাত প্রকার "সোমসংস্থা" যজ্ঞের অন্যতম, সপ্তম যজ্ঞ।

ব্রাহ্মণ এবং ক্ষত্রিয় এই দুই বর্ণ বাজপেয় যজ্ঞের অধিকারী। তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণে বাজপেয়কে "সম্রাট্‌সব" এবং রাজসূয়কে "বরুণসব" বলা হইয়াছে। আশ্বলায়ন বিধান করিয়াছেন, "রাজা বাজপেয় যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়া পরে রাজসূয় যজ্ঞ করিতে পারেন, এবং ব্রাহ্মণ বৃহস্পতিসব করিতে পারেন।" লাট্যায়ণের মতে "ব্রাহ্মণ এবং রাজন্যগণ যাহাকে অধিনায়ক নির্ব্বাচন করিবেন, তিনি বাজপেয় যজ্ঞ করিবেন।" বাজপেয় যজ্ঞের অনুষ্ঠানকারী একরাট্‌ সম্রাট হইবেন এরূপ অভিপ্রায় থাকিলে, যজ্ঞাঙ্গরূপে দিগ্বিজয়ের ব্যবস্থা থাকিত। কিন্তু বাজপেয়প্রকরণে দিগ্বিজয়ের কোন ব্যবস্থা নাই। চারি ঘোড়ার রথে চড়িয়া "আজিধাবন" অর্থাৎ প্রতিযোগিগণকে দৌড়ে পশ্চাতে ফেলিয়া বাজি জিতিয়া লোক-জয়ের কথা আছে। বৈদিক অশ্বমেধ যজ্ঞেও ঠিক দিগ্বিজয়ের ব্যবস্থা দৃষ্ট হয় না। যজ্ঞের ঘোড়াকে এক বৎসরকাল স্বচ্ছন্দে বিচরণ করিতে দেওয়া হইত। শতপথব্রাহ্মণে স্বচ্ছন্দে বিচরণকালে ঘোড়ার রক্ষার জন্য প্রহরীস্বরূপ ১০০ কবচধারী রাজপুত্র, ১০০ অসিধারী রাজন্য, ১০০ ধনুর্দ্ধর সূতপুত্র এবং গ্রামণীপুত্র, এবং ১০০ দণ্ডধারী সারথিপুত্র এবং ভৃত্যপুত্র নিয়োগের ব্যবস্থা আছে। এইরূপ ৪০০ শত যোদ্ধার পক্ষে তৎকালের কোন স্বাধীন রাজ্য জয় করা সম্ভব ছিল না। ঘোড়া হারাইয়া গেলে অর্থাৎ শত্রুকর্তৃক ধৃত হইলে অন্য একটি ঘোড়া যজ্ঞে অভিষিক্ত করার ব্যবস্থাও ছিল।

"সম্রাট্‌" বলিলে বৈদিক যুগে যে খণ্ডরাজ্যের অধীশ্বরকে বুঝাইত ঐতরেয় ব্রাহ্মণের "মহাভিষেক"-প্রকরণে তাহার যথেষ্ট প্রমাণ আছে (৮।৩৮—৩৯)। কিন্তু "মহাভিষেকের" মাহাত্ম্য-প্রসঙ্গেই কথিত হইয়াছে, যিনি উহার অনুষ্ঠান করিবেন, এখন

আমরা "সম্রাট্" বলিলে যাহা বুঝি, তিনি সেইরূপ একরাট্ সার্ব্বভৌম হইবেন। যথা—

"ইহা (ইন্দ্রের মহাভিষেক বৃত্তান্ত) জানিয়া কেহ (কোন আচার্য্য) যদি ক্ষত্রিয় পক্ষে ইচ্ছা করেন, যে এই ক্ষত্রিয় সকল বিজয় লাভ করিবেন, সকল লোক জানিবেন, সকল রাজার মধ্যে শ্রেষ্ঠতা অতিশয় প্রতিষ্ঠা ও পরমতা লাভ করিবেন এবং সাম্রাজ্য ভৌজ্য স্বারাজ্য বৈরাজ্য পারমেষ্ঠ্যরাজ্য মাহারাজ্য আধিপত্য পাইয়া সর্ব্বব্যাপী হইবেন ও (ভূমির) অন্তপর্য্যন্ত সার্ব্বভৌম ও পরার্দ্ধকালপর্য্যন্ত পূর্ণ আয়ুষ্মান হইবেন ও সমুদ্রপর্য্যন্ত পৃথিবীর একরাট্ (একমাত্র রাজা) হইবেন, তাহা হইলে তিনি সেই ক্ষত্রিয়কে এইরূপে শপথ করাইয়া ঐন্দ্র মহাভিষেক দ্বারা অভিষিক্ত করিবেন।" (শ্রীযুক্ত রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদীর অনুবাদ।)

ঐন্দ্রমহাভিষেক কর্ম্মটি অতি সংক্ষিপ্ত। প্রথমতঃ ক্ষত্রিয় যজমান শপথ করিবেন, তিনি আচার্য্যের বিরোধাচরণ করিবেন না। তৎপর আচার্য্য যজমানকে ন্যগ্রোধ, উদুম্বর, অশ্বত্থ ও প্লক্ষ এই চারিটি বনস্পতির ফল এবং ব্রীহি, মহাব্রীহি, প্রিয়ঙ্গু ও যব এই চারিটি ওষধি দ্রব্য অঙ্কুরার্থ সংগ্রহ করিতে বলিবেন। উদুম্বর-কাষ্ঠনির্ম্মিত আসন্দী বা আসন আনা হইবে এবং উহার উপর যজমানকে আরোহন করাইয়া দধি, মধু, ঘৃত ও আতপযুক্ত বৃষ্টির জলদ্বারা অভিষেক করা হইবে। অভিষেকের পর যজমান অভিষেক-কর্ত্তা ব্রাহ্মণকে সহস্র স্বর্ণখণ্ড, ক্ষেত্র এবং পশু অথবা অসংখ্য ও অপরিমিত দক্ষিণা দিবেন, এবং স্বয়ং সুরা পান করিয়া যজ্ঞের পরিসমাপ্তি করিবেন। রাজসূয় বা বাজপেয় যজ্ঞের তুলনায় এই "মহাভিষেক" অতি সংক্ষিপ্ত এবং সহজ কর্ম্ম,

অথচ ইহার ফল অতি বৃহৎ, সার্ব্বভৌমত্ব লাভ। যে সকল নরপাল ঐন্দ্রমহাভিষেকদ্বারা অভিষিক্ত হইয়া "সর্ব্বদিকে পৃথিবীর অন্ত পর্য্যন্ত জয় করিয়া পর্য্যটন করিয়াছিলেন ও অশ্বমেধ যাগ করিয়াছিলেন" ঐতরেয় ব্রাহ্মণকার তাঁহাদের নামোল্লেখ করিয়াছেন। যথা—জনমেজয়, পারিক্ষিত, শার্য্যাত মানব, শতানীক সাত্রাজিত, আম্বাষ্ঠ্য, যুধাংশ্রৌষ্টি, ঔগ্রসেন্য, বিশ্বকর্ম্মা ভৌবন, সুদাস পৈজবন, মরুত্ত আবিক্ষিত, অঙ্গ বৈরোচন, ভরত দৌঃষন্তি, দুর্ম্মুখ পাঞ্চাল এবং অত্যরাতি জানন্তপি। বশিষ্ঠের যজমান সুদাস পৈজবনের কীর্ত্তিকথা ঋগ্বেদের তৃতীয় এবং সপ্তম মণ্ডলে বর্ণিত হইয়াছে। কিন্তু সেখানে তাঁহার "সর্ব্বদিকে পৃথিবী জয়ের" কোন আভাস নাই, ইরাবতী (রাবি) তীরে "দাশরাজ্ঞ" যুদ্ধ জয়ের কথা আছে। সুতরাং সুদাস পৈজবনকর্ত্তৃক পৃথিবী-জয়ের কথা ব্রাহ্মণকারের কল্পনামাত্র। এই ঐন্দ্রমহাভিষেক দ্বারা অভিষিক্ত নৃপতিনিচয়ের মধ্যে শতপথব্রাহ্মণে (১৩।৫।৪) জনমেজয় পারিক্ষিত, মরুত্ত আবিক্ষিত, ভরত দৌঃষন্তি, শতানীক সাত্রাজিত অশ্বমেধযাজী বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছেন। জনমেজয় পারিক্ষিত সম্বন্ধে কথিত হইয়াছে ;—তিনি আসন্দীবৎ নামক স্থানে অশ্বমেধ যাগ করিয়া সমস্ত দুষ্কার্য্য এবং ব্রহ্মহত্যা নিবারণ করিয়াছিলেন। মরুত্ত আবিক্ষিত সম্বন্ধে বলা হইয়াছে,—তিনি অশ্বমেধ যাগ করিয়া মরুদ্গণ, বিশ্বদেবগণ এবং অগ্নিকে সহায়রূপে প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। শতানীক সাত্রাজিত সম্বন্ধে কথিত হইয়াছে,—তিনি কাশিরাজ ধৃতরাষ্ট্রের শ্বেতাঙ্গ যজ্ঞাশ্ব ধরিয়া যজ্ঞ করিয়াছিলেন। এই শতানীক সম্ভবতঃ ভরতগণের রাজা ছিলেন। একমাত্র ভরত দৌঃষন্তি সম্বন্ধে শতপথব্রাহ্মণে সমস্ত পৃথিবী জয়ের কথা আছে। ব্রাহ্মণকারধৃত

একটি গাথায় এই "সমস্ত পৃথিবী জয়ের" কথা আছে। ব্রাহ্মণকার স্বয়ং এই মাত্র বলিয়াছেন,—"তদ্দ্বারা ভরত দৌঃষন্তি এক সময় যজ্ঞ (অশ্বমেধ) করিয়াছিলেন এবং বর্ত্তমানে ভরতগণের অধিকৃত যে বিস্তীর্ণ রাষ্ট্র তাহা লাভ করিয়াছিলেন।"

ভরতগণের রাজ্য যে কতটা বিস্তৃত ছিল তাহারও কতকটা আভাস শতপথব্রাহ্মণে পাওয়া যায়। ভরত দৌঃষন্তি সাত্বতগণের যজ্ঞের ঘোড়া ধরিয়াছিলেন, যমুনাতীরে ৭৮টি এবং গঙ্গাতীরে ৫৫টি যজ্ঞের ঘোড়া বাঁধিয়াছিলেন, এবং ভরতরাজ শতানীক কাশিরাজের যজ্ঞের ঘোড়া ধরিয়াছিলেন। ঐতরেয় ব্রাহ্মণে "মহাভিষেক"-প্রকরণে স্পষ্টাক্ষরে উক্ত হইয়াছে (৮।৩৮।৩) ধ্রুব-প্রতিষ্ঠিত মধ্যমদেশের বশগণের, উশীনরগণের এবং কুরুপঞ্চালগণের যে সকল রাজা আছেন তাঁহারা রাজ্যের জন্য অভিষিক্ত হয়েন। পাণিনির সূত্রানুসারে (৪।২।১১৮) উশীনরগণ এবং বাহীকগণ অভিন্ন বা একদেশবাসী এবং মহাভারতের কর্ণপর্ব্বানুসারে বাহীকগণ পঞ্চনদ (পঞ্জাব) বাসী ছিলেন। সুতরাং বর্ত্তমান পঞ্জাবে প্রাচীন উশীনর জনপদ অবস্থিত ছিল। বৈদিক "বশ" পালিপিটকের "বংশ", এবং পরবর্ত্তী সংস্কৃত সাহিত্যের "বৎস" সম্ভবতঃ অভিন্ন। প্রয়াগের নিকটবর্ত্তী কৌশাম্বী এই রাজ্যের রাজধানী ছিল। এই মধ্যম-দেশের দক্ষিণে, কুরুজনপদের দক্ষিণে, সাত্বত রাজ্য অবস্থিত ছিল। ঐতরেয় ব্রাহ্মণের এই তালিকায় ভরতজনপদই কুরুনামে অভিহিত হইয়াছে। ঐতরেয় ব্রাহ্মণ-রচনার সময়ে এই কুরু-ভরত-রাজ্য স্বাধীন উশীনর, পঞ্চাল, কোশল, কাশি, বশ বা বৎস এবং সাত্বত জনপদের দ্বারা পরিবেষ্টিত ছিল। শতপথ-ব্রাহ্মণে এবং ছান্দোগ্য, বৃহদারণ্যক এবং কৌষীতকি উপনিষদে যে

সকল নরপতি এবং প্রধান প্রধান আচার্য্যের কথা আছে তাঁহাদের সময়েও কুরু-ভরত-রাজ্য এই সকল স্বাধীন রাজ্যের দ্বারা পরিবেষ্টিত ছিল। এই সকল গ্রন্থে দেখা যায়, কেকয়রাজ অশ্বপতি, পঞ্চালরাজ প্রবাহণ জৈবলি, কাশিরাজ অজাতশত্রু, বিদেহরাজ জনক এবং আচার্য্যগণের মধ্যে উদ্দালক আরুণি এবং যাজ্ঞবল্ক্য একসময়ের লোক ছিলেন। সুতরাং এই জনকযাজ্ঞবল্ক্যাদির সময়ে ভরতরাজ্য যতটা বিস্তৃত ছিল তাহা যদি ঐন্দ্রমহাভিষেক দ্বারা অভিষিক্ত ভরত দৌঃষন্তির দিগ্বিজয়শ্রমের ফল হয় তাহা হইলে বুঝিতে হইবে ঐতরেয় ব্রাহ্মণকারের উক্ত "পৃথিবী জয়" "একরাট" "সার্ব্বভৌম" প্রভৃতি কথা অতি সাবধানে গ্রহণ করিতে হইবে। অবশ্যই ব্রাহ্মণভাগে এতাদৃশ কথার উল্লেখ সপ্রমাণ করে যে, তৎকালের ব্রাহ্মণ এবং ক্ষত্রিয়গণ একরাট্ সাম্রাজ্যের বিষয় ভাবিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন। কিন্তু ঋগ্বেদের রচনার সময়ে, ঐতরেয় ব্রাহ্মণ রচনার সময়ে বা শতপথব্রাহ্মণ রচনার সময়ে উত্তরাপথে তেমন সাম্রাজ্য ছিল না। অবশ্যই একথা বলা যাইতে পারে যে ঐতরেয় ব্রাহ্মণে যে সকল সার্ব্বভৌমের নাম আছে তন্মধ্যে হয়ত কেহ, ঋগ্বেদের এবং ব্রাহ্মণ রচনার সময়ের মধ্যে যে একটা সুদীর্ঘ ব্যবধান আছে, সেই সময়ে প্রাদুর্ভূত হইয়া উত্তরাপথে একরাট্ সাম্রাজ্য স্থাপন করিয়াছিলেন। এইরূপ অনুমানের প্রতিকূলে বক্তব্য এই,—বৈদিক সাহিত্যে উত্তরাপথের রাষ্ট্রীয় অবস্থার যে আভাস পাওয়া যায় তাহার সহিত রামায়ণ, মহাভারত, এবং পুরাণের রাজবংশাবলী একত্র বিচার করিলে মনে হয়,—কুরু, পঞ্চাল, কাশী, কোশল, বিদেহ প্রভৃতি রাজ্যগুলি যেন বরাবরই পাশাপাশি স্বাধীনভাবে বিদ্যমান ছিল।

বৈদিকযুগে উত্তরাপথ বিদেশীর আক্রমণ হইতে মুক্ত ছিল, এবং ব্রাহ্মণ ও উপনিষদ রচনার সময়ে অভ্যন্তরেও শান্তি ছিল। সীমান্তরক্ষার দুশ্চিন্তা হইতে মুক্ত হইয়া জনক, অজাতশত্রু প্রভৃতি নরপালগণ ব্রহ্মবিদ্যার আলোচনার অবসর লাভ করিয়াছিলেন। ভরত দৌঃষন্তিকর্ত্তৃক সাত্বতগণের এবং শতানীক সাত্রাজিৎকর্ত্তৃক কাশীরাজের যজ্ঞের ঘোড়া কাড়িয়া লওয়া ভিন্ন অন্তর্দ্রোহের আর কোনও পরিচয় পাওয়া যায় না। তাই হয়ত উত্তরাপথে একরাট্ সাম্রাজ্য স্থাপনের প্রয়োজনীয়তা কেহ তখন তীব্রভাবে অনুভব করিতেন না।

বেদের ব্রাহ্মণভাগে এবং উপনিষদে যে সকল খণ্ড-রাজ্যের পরিচয় পাওয়া যায়, বৌদ্ধ পালিপিটক হইতে জানা যায় গোতম বুদ্ধের আবির্ভাবের সময়ও ঐ সকল রাজ্য বিদ্যমান ছিল। পালিপিটকে উত্তরাপথের ষোড়শ মহা-জনপদের উল্লেখ দৃষ্ট হয়; অর্থাৎ তৎকালে উত্তরাপথ ষোলটি খণ্ড-রাজ্যে বিভক্ত ছিল। যথা—অঙ্গ, মগধ, কাশী, কোশল, বজ্জি (বৃজি=বিদেহ), মল্ল, চেতি (চেদি), বংশ, কুরু, পঞ্চাল, মচ্ছ (মৎস্য), সুরসেন, অস্‌সক, অবন্তী, গন্ধার, এবং কম্বোজ। গোতম বুদ্ধের অভ্যুদয়ের সময়ে মগধের সিংহাসনে প্রথমতঃ শিশুনাগবংশীয় বিম্বিসার, তৎপর বিম্বিসারের পুত্র অজাতশত্রু উপবিষ্ট ছিলেন। পুরাণকারগণের মতে অজাতশত্রুর পরে যথাক্রমে দর্শক, উদয়ী, নন্দিবর্দ্ধন এবং মহানন্দী এই চারিজন শিশুনাগবংশীয় নৃপতি মগধে রাজত্ব করিয়াছিলেন। মৎস্য, বায়ু এবং ব্রহ্মাণ্ড পুরাণে কথিত হইয়াছে,—মগধে যখন শিশুনাগবংশীয় নৃপতিগণ এবং তৎপূর্ব্ববর্ত্তিগণ রাজত্ব

করেন, তখন তাঁহাদের সমসময়ে ২৪ জন ঐক্ষ্বাকু নৃপতি, ২৭জন পাঞ্চাল নৃপতি, ২৪জন কাশীর নৃপতি, ২৮জন হৈহয় (চেদি) নৃপতি, ৩২জন কলিঙ্গ নৃপতি, ২৫জন অশ্মক নৃপতি, ৩৬ জন কুরু নৃপতি, ২৮জন মৈথিল নৃপতি, ২৩জন শূরসেন নৃপতি এবং ২০জন বীতিহোত্র নৃপতি রাজত্ব করেন। পালিপিটকের ষোড়শ-মহাজনপদের মধ্যে এখানে আটটি উল্লিখিত হইয়াছে। তারপর পাঁচখানি পুরাণ (বিষ্ণু, ভাগবত, মৎস্য, বায়ু, ব্রহ্মাণ্ড) সমস্বরে বলিতেছে,—শিশুনাগবংশীয় মহানন্দীর শূদ্রা পত্নীর গর্ভজাত পুত্র মহাপদ্ম-নন্দ সকল ক্ষত্রিয় বিনাশ করিয়া, একরাট্ একচ্ছত্র হইবেন। গ্রীকলেখকগণের বিবরণ হইতে জানা যায়,—পঞ্জাব মহাপদ্ম-প্রতিষ্ঠিত সাম্রাজ্যের বহির্ভূত ছিল। মৌর্য্য চন্দ্রগুপ্ত তাহা মাগধ-সাম্রাজ্যের সামিল করেন। চন্দ্রগুপ্তের পৌত্র অশোক এই সাম্রাজ্যের সহিত কলিঙ্গরাজ্য যুক্ত করিয়াছিলেন। মহাপদ্ম, চন্দ্রগুপ্ত এবং আশোক এই তিনজনের যত্নে উত্তরাপথে সর্ব্বপ্রথমে রাষ্ট্রীয় ঐক্য স্থাপিত হইয়াছিল।

এ পর্য্যন্ত মহাভারতোক্ত প্রমাণের কোনও উল্লেখ করা হয় নাই। মহাভারতের প্রমাণও এই সিদ্ধান্তের প্রতিকূল নহে। মহাভারতে সম্রাট্ অর্থ সার্ব্বভৌম এবং রাজসূয় যজ্ঞই "সম্রাট্সব।" সভাপর্ব্বে (১১ অঃ) উক্ত হইয়াছে, "রাজা হরিশ্চন্দ্র সসাগরা সদ্বীপা বসুন্ধরার সম্রাট ছিলেন, পৃথিবীস্থ সমস্ত মহীপাল তাঁহার শাসনের অনুবর্ত্তী হইয়া চলিতেন। তিনি জয়শীল সুবর্ণালঙ্কৃত এক রথে আরোহণ করিয়া অস্ত্রশস্ত্র-প্রভাবে সপ্তদ্বীপ জয় করিয়া রাজসূয় যজ্ঞের আয়োজন করেন।" তারপর (সভা—প, ১৩ অ) কৃষ্ণ যুধিষ্ঠিরকে বলিতেছেন—"হে ভরত-সত্তম! তুমি সম্রাটতুল্য গুণশালী, অতএব তোমার সম্রাট হওয়া

নিতান্ত আবশ্যক ; কিন্তু আমার নিশ্চয় বোধ হইতেছে, জরাসন্ধ জীবিত থাকিতে তুমি কখনই রাজসূয়ানুষ্ঠানে কৃতকার্য্য হইতে পারিবে না। সে বাহুবলে সমস্ত ভূপতিগণকে পরাজয় করিয়া সিংহ যেমন পর্ব্বতকন্দর-মধ্যে করিগণকে বদ্ধ রাখে, সেইরূপ তাঁহাদিগকে গিরিদুর্গে বদ্ধ করিয়া রাখিয়াছে। ঐ দুরাত্মা রাজসূয়যজ্ঞার্থ প্রতিজ্ঞা করিয়া কঠোর তপোনুষ্ঠানদ্বারা দেবাদিদেব মহাদেবকে প্রসন্ন করিয়াছিল। পরে সমস্ত ভূপতিগণকে পরাজয় করিয়া আপনার প্রতিজ্ঞা পরিপূর্ণ করিল।”

এখানে দেখা যাইবে মহাভারতের রাজসূয় যজ্ঞ বেদের বিহিত রাজসূয় যজ্ঞ হইতে স্বতন্ত্র। বেদে আগে যজ্ঞানুষ্ঠান, পরে সাম্রাজ্য বা সার্ব্বভৌমত্বলাভ। আর মহাভারতে আগে দিগ্বিজয়, সাম্রাজ্য বা সার্ব্বভৌমত্ব-প্রতিষ্ঠা, পরে যজ্ঞানুষ্ঠান। বেদের রাজসূয় যজ্ঞ রাজার অভিষেক-ক্রিয়ার নামান্তর ; ছোট বড় সকল রাজারই তাহাতে সমান অধিকার। মহাভারতের রাজসূয়ানুষ্ঠানের অধিকারী কেবলমাত্র একরাট্ সম্রাট। বেদে এবং মহাভারতে এরূপ বিধি-বিরোধের কারণ-নির্দ্দেশ করিতে হইলে বলিতে হয়, মহাভারতের এই সকল অংশ মাগধ-সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠার পরে রচিত হইয়াছিল। ঐতরেয় ব্রাহ্মণে ইক্ষ্বাকুবংশধর হরিশ্চন্দ্রের রাজসূয় যজ্ঞের কথা আছে, কিন্তু পৃথিবীজয় করিয়া যজ্ঞের আয়োজনের কথা নাই (৮।৩৩)। হরিশ্চন্দ্র বরুণের উপদেশে রাজসূয় যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন এবং অভিষেক-অনুষ্ঠানের দিনে শুনঃশেফকে পুরুষ পশুরূপে নির্দ্দেশ করিয়া উদররোগ হইতে মুক্তিলাভ করিয়াছিলেন। দুই মাতার গর্ভ হইতে দুটি অর্দ্ধকলেবররূপে নির্গত, জরারাক্ষসীকর্তৃক সন্ধিত বা সংযোজিত, জরাসন্ধকে ঐতিহাসিক ব্যক্তি বলিয়া গ্রহণ করা সুকঠিন। জরাসন্ধ মহাপদ্ম বা মৌর্য্য চন্দ্রগুপ্তের ছায়া লইয়া পরিকল্পিত

বলিয়া মনে হয়। মগধের জরাসন্ধের সাম্রাজ্যে এবং কুরুবংশীয় যুধিষ্ঠিরের সাম্রাজ্যে প্রভেদও বিস্তর। জরাসন্ধ খণ্ডরাজ্যের নৃপতিগণকে বশীভূত করিয়াই ক্ষান্ত হন নাই; ষড়শীতি জন নৃপতিকে ধরিয়া আনিয়া কারাগারে আবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছিলেন, এবং আর চতুর্দ্দশ জন সংগৃহীত হইলে ১০০জন নৃপতিকে একসঙ্গে সংহার করিবার জন্য প্রস্তুত ছিলেন। রাজসূয় যজ্ঞের পূর্ব্বে যুধিষ্ঠিরের প্রতিনিধিরূপে অর্জ্জুনাদিও দিগ্বিজয় করিয়াছিলেন বটে, কিন্তু কোনও দিক্‌পালকে রাজ্যচ্যুত বা কাহারও স্বাধীনতা হরণ করেন নাই; যুধিষ্ঠিরের যজ্ঞের জন্য কর সংগ্রহ এবং যজ্ঞস্থলে উপস্থিত হইবার জন্য নিমন্ত্রণ করিয়া প্রত্যাবৃত্ত হইয়াছিলেন। যে সকল রাজারা যুধিষ্ঠিরের যজ্ঞসভায় উপস্থিত হইয়াছিলেন তাঁহারা প্রকৃতপ্রস্তাবে যুধিষ্ঠিরের অধীনতা স্বীকার করেন নাই। অধীনতা স্বীকার করিলে কদাপি তাঁহারা অর্ঘাভিহরণউপলক্ষে যুধিষ্ঠিরের বিরুদ্ধাচরণে উদ্যত হইতেন না। মহাভারতকার রাজসূয়য়াজী যুধিষ্ঠিরের সাম্রাজ্যের যে চিত্র প্রদান করিয়াছেন, তাহা প্রকৃত ঐক্যের উপর প্রতিষ্ঠিত নয়। এরূপ যথেচ্ছাচারে অধিকারী নৃপতিসঙ্ঘকে যজ্ঞসভায় উপস্থিত করাকেই যদি সাম্রাজ্য স্থাপন বলিতে হয় তবে তেমন সাম্রাজ্য কখন কখন বৈদিক যুগে দৃষ্ট হইয়াছিল এরূপ মনে করা যাইতে পারে। বৈদিক যুগেও প্রাদুর্ভূত ভরত দৌঃষন্তি বা দুর্মুখ পাঞ্চালের মত কোন কোন রাজা স্বীয় যজ্ঞসভায় পার্শ্ববর্ত্তী রাজ্যনিচয়ের নৃপতিগণকে উপস্থিত করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন এমন অনুমান করা অসঙ্গত নয়। জরাসন্ধের আখ্যায়িকা এবং মহাপদ্ম ও মৌর্য্যচন্দ্রগুপ্তের ইতিহাস সপ্রমাণ করিতেছে মগধেই উত্তরাপথে প্রকৃত রাষ্ট্রীয় ঐক্য স্থাপনের সূত্রপাত হইয়াছিল।

শ্রীরমাপ্রসাদ চন্দ।

সাহিত্যে আভিজাত্য

কিছুদিন হইতে দেশে একটি কথা উঠিয়াছে যে আধুনিক বাঙ্গলা সাহিত্য "ইংরাজী গন্ধী";—দেশের নাড়ীর সহিত ইহার সংযোগ নাই; দেশের জনসাধারণের আশা, আকাঙ্ক্ষা—এককথায় তাহাদের প্রাণের কথা ইহাতে ব্যক্ত হয় নাই। ইহা কেবলমাত্র একটি সংকীর্ণ অহিন্দু বা বিজাতীয়ভাবাপন্ন (de-nationalised) সম্প্রদায়ের অন্ধ পাশ্চাত্যানুকরণের ফল। সুতরাং ইহা "স্রোতের শৈবালের মত" অদূর ভবিষ্যতেই দেশ হইতে বহিষ্কৃত হইবে এবং তাহার স্থানে দাশুরায়ের পাঁচালি, কৃত্তিবাসের রামায়ণ, কাশীরামের মহাভারত এবং ভারতচন্দ্র ও কবিকঙ্কণ প্রভৃতির রচনা রাজত্ব করিবে। বড়জোর ঈশ্বর গুপ্ত (বর্ত্তমান যুগের লেখকগণের মধ্যে) এই সাহিত্যের রাজ্যে স্থান পাইবেন, কারণ তিনিই "শেষ খাঁটি বাঙ্গালীর কবি।"

"ইংরাজী গন্ধী" ভিন্ন বর্ত্তমান বাঙ্গলা সাহিত্যের—প্রধানতঃ কাব্যের—বিরুদ্ধে আর-একটি অভিযোগ এই যে তাহা অত্যন্ত aristocratic অর্থাৎ আভিজাত্যভাবাপন্ন এবং তাহা "বস্তুতন্ত্রতাবিহীন" ও "ব্যক্তিত্বসর্ব্বস্ব"। পারিপার্শ্বিক অবস্থার প্রতি দৃষ্টি না করিয়া, দেশের অভাব-অভিযোগের কথা না ভাবিয়া, সমাজের হিতাহিতের দিকে কিছুমাত্র লক্ষ্য না রাখিয়া, কেবলমাত্র নিজের মন হইতে "লূতাতন্তুর মত" কতকগুলি ভাব সৃষ্টি করিয়া বর্ত্তমান কালের

লেখকগণ তাহা সাহিত্যে আমদানি করিতেছেন। ইহাতে না আছে "বস্তুগত-সত্য," না আছে সমাজরক্ষার প্রতি দৃষ্টি। দেশের "জনসাধারণের নিকট" ইহার না আছে কোনো অর্থ, না আছে কোনো মূল্য।

অভিযুক্ত সাহিত্যিকগণের মধ্যে বঙ্কিমচন্দ্র হইতে আরম্ভ করিয়া প্রায় সকলেই আছেন। তবে রবীন্দ্রনাথকেই যে প্রধান আসামী করা হইয়াছে তাহার প্রমাণ বিস্তর। কেননা বিশেষ-করিয়া কাব্যের বিরুদ্ধেই এই অভিযোগ আনা হইয়াছে।

যাঁহারা আধুনিক বাঙ্গলা সাহিত্যকে "ইংরাজী গন্ধী" বলিয়া নাসিকা কুঞ্চিত করিতেছেন তাঁহাদের প্রকৃত সাহিত্যসম্বন্ধে ধারণা কিরূপ তাহা জানি না। কিরূপ সাহিত্য সৃষ্টি হইলে প্রকৃত বাঙ্গলা সাহিত্য হয় তাহার বিশেষ উল্লেখ তাঁহাদের রচনার মধ্যে কোথাও নাই। তবে তাঁহাদের রচনার ইঙ্গিত হইতে যাহা বুঝা যায় তাহার মর্ম্ম এই যে, যাহা বহুকাল হইতে দেশে আছে—দেশের সমুদায় লোকের যাহা সাধারণ ভাব ও সম্পত্তি তদতিরিক্ত যাহা-কিছু তাহা সে দেশের সম্পত্তি নহে। এই হিসাবে পাঁচালি, কবির গান, রামায়ণ, মহাভারত প্রভৃতি এবং আর যাহা ঐ সকলের অনুকরণ হইতে উদ্ভূত তাহাই বাঙ্গলার সাহিত্য।

ইঁহাদের নিকট সাহিত্যের মূল্য তাহার জাতীয়তা লইয়া এবং জাতীয়তার criterion অথবা প্রমাণ সর্ব্বসাধারণের উপলব্ধি লইয়া। যে সাহিত্যে দেশের এবং সমাজের কথা প্রচুর পরিমাণে নাই তাহা তাঁহাদের নিকট আদরণীয় নহে এবং যে সাহিত্য দেশের জনসাধারণের সম্পূর্ণ বোধগম্য এবং আয়ত্বাধীন নহে তাহা সে

দেশের জাতীয় সাহিত্য নহে। সুতরাং সেরূপ সাহিত্য হয় একেবারে সাহিত্যই নহে, না হয় বড়জোর বিদেশীভাবাপন্ন এবং আভিজাত্যাভিমানী অকিঞ্চিৎকর স্বল্প-কালস্থায়ী সাহিত্য।

আমাদের মনে হয় ইঁহাদের কোনো ধারণাই সত্য নহে। সাহিত্যকে—প্রধানতঃ কাব্য-সাহিত্যকে জাতীয়তার মাপকাটি লইয়া বিচার করিলে তাহার প্রতি অবিচার করা হয়। যিনি প্রকৃত কবি তিনি সত্যের দ্রষ্টা। তিনি আপনার রচনার মধ্য দিয়া সত্যকে ফুটাইয়া তুলেন। যাহা-কিছু ঘটিতেছে, যাহা-কিছু হইতেছে তাহাকেই সত্য বলিয়া গ্রাহ্য না করিয়া তাহার অন্তরালে যে পরম সত্য পদার্থ রহিয়াছে তাহাকেই তিনি নিয়ত ব্যক্ত করিতে চাহিতেছেন। তিনি রসের মধ্যে দিয়া আনন্দময়ের—সুন্দরের প্রকৃত রূপকে উদ্ভাসিত করিয়া তুলিতেছেন। দৈনিক জীবনের কর্ম্মের মধ্যে মানুষ অন্ধভাবে যাহার অনুসরণ করিতেছে অথচ পাইতেছে না, নানা বন্ধনের মধ্য দিয়া মানুষ যে মুক্তির জন্য লালায়িত হইয়া ছুটিয়া চলিয়াছে অথচ আপনাকে ক্রমাগতই নব নব বন্ধনে আবদ্ধ করিতেছে—কবি তাঁহার দিব্য দৃষ্টিতে সেই সত্যের ও সেই মুক্তির সাক্ষাৎকার লাভ করিয়া তাহার বার্ত্তা প্রচার করিয়া থাকেন। ক্ষুদ্রের মধ্যে যাহা মহৎ, ক্ষণিকের মধ্যে যাহা অনন্ত, পরিবর্ত্তনের মধ্যে যাহা সনাতন, বৈচিত্র্যের মধ্যে যাহা এক কবি তাহাকেই আপনার অনুভূতির মধ্য দিয়া মানুষের সম্মুখে উপস্থিত করিয়া দেন।

এই সত্য শিব সুন্দরের বার্ত্তা প্রচার করেন বলিয়া কবি সাম্প্রদায়িক নহেন। তিনি সমগ্র বিশ্বের। কারণ সত্য শিব সুন্দর ত কোনো দেশকালের গণ্ডীর দ্বারা সীমাবদ্ধ নহে।

তাহা সর্ব্বকালের সর্ব্বসমাজের সর্ব্বমানুষেরই প্রাণের সম্পত্তি ;—তাহাতেই মানুষের স্থিতি এবং পরিণতি। কবি যখন তাহা প্রচার করেন তখন বিশ্বমানবের অনন্তকালব্যাপী অনন্ত সম্পদের কথাই প্রচার করেন। Emerson এই জন্যই একস্থলে বলিয়াছেন "The poet is not a contemporary but an eternal man।" সুতরাং যিনি প্রকৃত কবি তিনি কোনো জাতিবিশেষের অথবা কোনো দেশবিশেষের লোক নহেন। তাঁহার বার্ত্তা কোনো বিশিষ্ট সম্প্রদায়ের অথবা শ্রেণীর জন্য নহে—তাহা মানুষের আত্মার মুক্তির বার্ত্তা ; তাহা সার্ব্বজনীন, তাহা সর্ব্বসাধারণের।

কবি এই সার্ব্বজনীন সত্যকে রসের মধ্য দিয়া প্রকাশ করেন ; সেই জন্যই তিনি কোনো সামাজিক অথবা ব্যবহারিক (conventional) প্রয়োজনের নিকট আপনার মস্তক অবনত করিতে বাধ্য নহেন। এইখানেই তাঁহার স্বাধীনতা। তিনি যাহাকে সত্য বলিয়া মনে করেন তাহাকে পারিপার্শ্বিক অবস্থার খাতিরে খর্ব্ব করিয়া প্রকাশ করেন না। তিনি বিশ্বের মধ্যে কেবলমাত্র এক সত্য ভিন্ন অন্য কিছুর দ্বারাই আবদ্ধ নহেন। তাঁহার বাণীর প্রভাব দেশের উপর কিরূপ হইবে, তিনি যে সত্যের আলোকপাত করিবেন তাহাতে সমাজের দৃষ্টিবিভ্রম ঘটিবে কিনা, তিনি যে মুক্তির অমৃতময়ী গাথা প্রচার করিবেন তাহা জনসংঘের মধ্যে বিশৃঙ্খলা ও স্বেচ্ছাচারিতা আনিবে কিনা—এ সকল কিছুই তাঁহার দৃষ্টির বিষয় নহে। প্রয়োজনের সহিত বাস্তবের সন্ধি করিয়া কবি সত্যের মর্য্যাদা হানি করিতে প্রস্তুত নহেন। তিনি তাঁহার কবির দিব্যদৃষ্টিতে জ্যোতির্ম্ময় অমৃতলোকে যে সত্যের অপূর্ব্ব মূর্ত্তি দর্শন করিবেন

ছন্দের বিচিত্রতার মধ্য দিয়া তাহাকেই প্রকাশ করিবেন। সেই প্রকাশের ফলাফল তাঁহার দর্শনীয় নহে। কারণ তাঁহার এই প্রকাশ ত সম্পূর্ণরূপে তাঁহার ইচ্ছাধীন নহে। এই বৈচিত্র্যময়ী, সৌন্দর্য্যময়ী এবং অনন্ত রহস্যময়ী প্রকৃতির মধ্যে দাঁড়াইয়া আত্মহারা হইয়া কবি যখন গাহিয়া উঠেন তখন সেই গীতি স্বতঃউৎসারিত। কবি টেনিসন সত্যই বলিয়াছেন—"I sing because I must"। কবি গাহেন, কেননা না-গাহিয়া তিনি থাকিতে পারেন না। সুতরাং কবি যাহা প্রকাশ করেন প্রকৃতপক্ষে তাহা সত্যেরই স্বতঃপ্রকাশ।

এই জন্য অনেক সময়ে দেখা যায় যে যিনি প্রকৃত কবি তাঁহার সহিত তাঁহার চতুষ্পার্শ্বের সমাজের বিশেষ সম্বন্ধ নাই। কারণ তাঁহার দৃষ্টি সমাজের আপাতপ্রয়োজনের সীমা অতিক্রম করিয়া অনন্তের দিকে ধাবিত হয়; সাময়িক দ্বিধাদ্বন্দ্ব, বিরোধ-বিপ্লবের বাহিরে যেখানে চির-সামঞ্জস্য বর্ত্তমান সেখান হইতে তিনি শান্তির বার্ত্তা বহন করিয়া আনেন। এইজন্য গেটে, সেক্ষপীয়র, ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থ, ব্রাউনিং, কালিদাস, ভবভূতি প্রভৃতি কবির শ্রেষ্ঠ কবিতার সহিত তাঁহাদের দেশের কোনো প্রত্যক্ষ সম্বন্ধ দেখা যায় না।

ইহা তাঁহাদের পক্ষে গৌরবেরই কথা—লজ্জার কথা নয়। বর্ত্তমানের কুহেলিকা যে তাঁহাদের দৃষ্টিকে বাধা দিতে পারে নাই—আপাতপ্রয়োজনের প্রতি নিজের শক্তিকে নিযুক্ত না করিয়া তাঁহারা যে সনাতন সত্যের দিকে স্থির দৃষ্টি রাখিতে পারিয়াছেন তাহা তাঁহাদের পক্ষে নিন্দার কথা নহে—শ্লাঘারই পরিচায়ক।

এই জন্যই সাধারণতঃ যাহাকে জাতীয় সাহিত্য, জাতীয় কবিতা বলা হয় প্রকৃতপক্ষে যিনি কবি তাঁহার রচনা সেই শ্রেণীভুক্ত নহে; কিন্তু যাহা প্রকৃত জাতীয় সাহিত্য বা জাতীয় কবিতা তাহার সহিত উহা অভিন্ন। জাতীয় সাহিত্য বলিতে যদি জাতীয় কোনো বিশেষ সমাজ রক্ষা ও সংস্কারের উপযোগী সাহিত্য বলা যায় তবে তাহা যে বিশ্ব-সাহিত্য হইবে এমন কোনো কথা নাই। কবি সৌন্দর্য্য সৃষ্টি করিবেন, সত্যকে প্রকাশ করিবেন, মঙ্গলকে জীবনে অধিষ্ঠিত করিবার চেষ্টা করিবেন; তাহাতে যদি তাঁহার সমসাময়িক সমাজের উপকার হয়, হইল; আর যদি তাহার ফলে দেশবাসী অপকার হইয়াছে মনে করে তাহাতেও তাঁহার ক্ষতিবৃদ্ধি নাই। কারণ তাঁহার সৃষ্টি ত কোনো সঙ্কীর্ণ উদ্দেশ্যমূলক নহে—তাহা অহেতুক অনাবিল আনন্দ হইতে উৎপন্ন। তবে কবির যাহা বিশিষ্ট বাণী, তাহা যদি কবির দেশের বাণী হইয়া থাকে, কবির যাহা প্রাণের কথা তাহা যদি তাঁহার দেশের প্রাণের কথা হইয়া থাকে তবে তাঁহাকে আমরা জাতীয় কবি বলিয়া অভিহিত করিতে পারি। কিন্তু একথা সর্ব্বদাই মনে রাখিতে হইবে যে যিনি প্রকৃত কবি তিনি জাতীয় কবি হইতে বাধ্য নহেন; এবং যখন তিনি জাতীয় কবি তখনও তিনি অন্যভাবে বিশ্বকবি। মহাকবি গেটে বলিয়াছিলেন—বিশ্বসাহিত্যই কবিদের লক্ষ্য। কিন্তু সেই বিশ্ব-সাহিত্য সৃষ্টি করা অথবা না করা কবিদের স্বেচ্ছাধীন নহে।

পৃথিবীতে কবিরা একটি স্বতন্ত্র সম্প্রদায়ভুক্ত;—তাঁহারা নিজেদের মধ্যে এমন একটি সম্প্রদায় গঠন করিয়াছেন যাহাদের জীবনের কাজ কেবলমাত্র সত্য ও মঙ্গলকে রসের মধ্য দিয়া প্রকাশ করা।

কালিদাস, সেক্সপীয়র, গেটে, দান্তে, ব্রাউনিং, রবীন্দ্রনাথ প্রভৃতি তাই ভাবের দিক দিয়া ভ্রাতৃত্বে আবদ্ধ।

কিন্তু তাই বলিয়া এই সম্প্রদায়কে যাঁহারা aristocratic অর্থাৎ আভিজাত্যাভিমানী সঙ্কীর্ণ সম্প্রদায় বলিয়া মনে করিবেন তাঁহারা মস্ত ভুল করিবেন। কবি একহিসাবে যে অভিজাত সম্প্রদায়-ভুক্ত তাহাতে সন্দেহ নাই। কারণ তিনি যাহা প্রকাশ করেন আপামরসাধারণে তাহা সর্ব্বদা হৃদয়ঙ্গম করিতে পারেনা। সংসারের সাধারণলোক জন্ম হইতে মৃত্যু পর্য্যন্ত কতকগুলি বিশেষ নিয়মের নিগড়ে আবদ্ধ; জীবনসংগ্রামের কঠোরতার মধ্যে তাহারা এমনি ভাবে নিত্য নিষ্পিষ্ট হইতেছে যে বাহিরের দিকে দৃষ্টিপাত করিবার অবকাশমাত্র তাহাদের নাই; ক্ষুদ্র স্বার্থের তাড়নায় এরূপ অন্ধভাবে নিশিদিন তাহারা পরিচালিত যে জীবনকে বৃহৎভাবে দেখিবার সামর্থ্য পর্য্যন্ত তাহাদের লুপ্ত হইয়াছে। তাহারা কেবল-মাত্র বর্ত্তমানকে লইয়াই জীবন কাটাইতেছে; কেবল আপাত-প্রয়োজনের দিক্‌চক্ররেখার দ্বারাই তাহাদের জীবন আবদ্ধ। সুতরাং এই সকল বদ্ধ সাংসারিকের মধ্যে দাঁড়াইয়া কবি যখন ঊর্দ্ধে নিম্নে ও চতুষ্পার্শ্বে প্রকৃতির অনন্ত সৌন্দর্য্য নিরীক্ষণ করিয়া অমৃতরাজ্যের চিরনূতন অথচ চিরপুরাতন মহাবার্ত্তা ঘোষণা করেন—যখন তিনি মানুষকে মুক্তির অভয় মন্ত্র শুনাইয়া, জীবনের অনন্ত সম্ভাবনার আশা প্রদান করিয়া মোহ ও জড়তার জাল ছিন্ন করিয়া দিতে চান তখন প্রথমে সাধারণ মানব তাঁহার সে বাণীর অর্থ ও মর্য্যাদা সম্যক্ উপলব্ধি করিতে পারে না। তাঁহার কথা ও কার্য্যের সহিত সে আপনার জীবনের কোনো সম্বন্ধ

দেখিতে পায় না। বরং সে দেখে সে যাহাকে শ্রেয় ও প্রেয় মনে করিয়া আসিয়াছে তাহাকে কবি অন্যভাবে অভিহিত করিতেছেন। তাই কবির রচনাকে সে অর্থহীন বাক্য-সমষ্টি অথবা আভিজাত্য-ভাবাপন্ন বলিয়া আত্মপ্রসাদ লাভ করে। গড্ডলিকাপ্রবাহে কবি আপনাকে ছাড়িয়া দিয়া গতানুগতিক হন নাই বলিয়া কবিকে aristocratic বল ক্ষতি নাই—কিন্তু তাঁহার aristocracy নিন্দনীয় নহে।

প্রকৃত সাহিত্যে যে আভিজাত্যের লক্ষণ দেখা যায় তাহার আর একটি কারণ আছে। শ্রেষ্ঠ কবিতার মধ্যে ভাবের দিক ছাড়া শিল্পের একটি দিক্ আছে। কবিতা একহিসাবে কবির আনন্দ হইতে স্বভাবতঃ জন্মগ্রহণ করিলেও উহার পশ্চাতে কবির বহুদিনের সাধনা প্রচ্ছন্ন থাকে। সুন্দরকে যে আকার প্রদান করিয়া তিনি মানুষের সম্মুখে বাহির করেন তাহার মধ্যে কবির শিল্পচাতুর্য্যের যথেষ্ট পরিচয় থাকে। তাই বলিয়া যাঁহারা কবিতার এই form বা আকারকে নিরবচ্ছিন্ন কৃত্রিম বলিয়া মনে করেন তাঁহারা ভ্রান্ত। তবে ইহার মধ্যেও কবির স্বাতন্ত্র্যের যথেষ্ট অবকাশ ও স্থান আছে। তিনি যে ভাবে ইচ্ছা করেন আপনার বাণীকে প্রকাশ করিতে পারেন ;— কবির এই যে স্বাধীনতা ইহাকে খর্ব্ব করিলে কবির আনন্দকে ক্ষুণ্ণ করা হইবে, তাহার হৃদয়ের আবেগ বাধা পাইবে।

সুতরাং কবিকে পাঠকের মনের মত করিয়া রচনা করিতে বলা সম্পূর্ণ অন্যায়। যদি তাঁহার বাণী বুঝিতে চাও তোমাকে তাঁহার মত হইতে হইবে। মিল্টনের কবিতার কথা আলোচনা করিতে গিয়া একজন বিখ্যাত সমালোচক ঠিক এই কথাই বলিয়াছেন। সুবিখ্যাত সমালোচক Walter Raleigh সেক্ষপীয়রের কবিতা

সমালোচনা করিতে করিতে একস্থানে বলিয়াছেন—"কবিকে বুঝিতে হইলে কবির স্থানে দাঁড়াইয়া তিনি যাহা দেখিতেছেন তাহা দেখিতে হইবে।" অতএব যদি কোনো কবির রচনা সাধারণপাঠকের পক্ষে দুরধিগম্য হয় তাহা হইলে সে পাঠকেরই দুরদৃষ্ট। ইহাতে যাঁহারা অসন্তুষ্ট হইয়া কবিকে তাচ্ছিল্য করিতে চান করিতে পারেন ; তাহাতে কবির কোনও ক্ষতি নাই। কারণ তিনি জানেন যে যদি তাঁহার রচনার মধ্যে সত্য সুন্দর মঙ্গলের কোনো বার্ত্তা থাকে তবে তাহা একদিন-না-একদিন কালের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইবেই।

অধিকারীভেদ সর্ব্বত্রই আছে ; জ্ঞানের ও বুদ্ধির তারতম্যানুসারে সৌন্দর্য্য-উপভোগের যে প্রভেদ হইবে ইহাতে বিস্ময়ের কিছুই নাই। শ্রেষ্ঠ কবিতা, শ্রেষ্ঠ সাহিত্য যে বিনা আয়াসে, বিনা সাধনায় সকলেই বুঝিতে পারিবে এরূপ আশা করা অন্যায়। Mark Patison একস্থানে Paradise Lost-এর সমালোচনা করিতে গিয়া বলিয়াছেন—"The true apprecia tion of Paradise Lost is the last result of consummate scholarship." অতএব মুদির দোকানে যে খাতা লেখে, কিম্বা ডাকঘরে বসিয়া যে মণিঅর্ডারের ফরম্ পূরণ করে সে যদি হঠাৎ একদিন ক্রুদ্ধ হইয়া বলে বঙ্কিমচন্দ্র ও রবীন্দ্রনাথ অকবি তাহাতে হাস্য ভিন্ন অপর কোনো রসেরই উদ্রেক হয় না। কারণ জগতের মধ্যে কি সাহিত্যে, কি শিল্পে কি ভাস্কর্য্যে যাহা শ্রেষ্ঠ—তাহার মূল্য সাধারণের আদর অথবা অনাদর দ্বারা যদি বিচার করা যায় তবে মূঢ়তাকেই প্রশ্রয় দেওয়া হয়।

এস্থলে অনেকে রামায়ণ, মহাভারত, ইলিয়ড প্রভৃতির কথা

উল্লেখ করিয়া যে বকাবকি আরম্ভ করিবেন তাহা জানি। কিন্তু লোকসাহিত্য এবং আসল সাহিত্যের মধ্যে যে প্রভেদ আছে তাহা ভুলিয়া গেলে চলিবে না। আমরা যে স্থায়ী সাহিত্যের কথা বলিতেছি তাহার মধ্যে জনসাধারণের সাহিত্য থাকিতে পারে—কিন্তু জনসাধারণের সাহিত্য ভিন্ন যে অন্য-কোনোরূপ সাহিত্য স্থায়ী হইতে পারে না এরূপ মনে করা ভ্রান্তিমাত্র।

কিন্তু এই সাহিত্য—যাহাকে আভিজাত্যাভিমানী বলিয়া অনেকে উপহাস করেন—তাহাকে 'আত্মসর্ব্বস্ব' বলিতে পারি না। সাহিত্যে তাহাই 'আত্মসর্ব্বস্ব' যাহা আদ্যোপান্ত কবির fancy অথবা উচ্ছৃঙ্খল কল্পনা হইতে উদ্ভূত; তাহাই "বস্তুতন্ত্রতাবিহীন" যাহার মূলে কোনো সত্যের অনুভূতি নাই। দেশের বর্ত্তমান কোনো ঘটনার সহিত, সমাজের কার্য্যকলাপ ও গতির সহিত তাহার কোনো প্রত্যক্ষ সংযোগ নাই বলিয়া কবির রচনাকে বস্তুবিহীন "আত্মসর্ব্বস্ব" বলা অন্যায় হইবে। যিনি সমাজের কর্ম্মের সহিত যোগদান করেন, যিনি দেশের সেবক-দিগকে উৎসাহিত করিবার জন্য গান রচনা করেন, যিনি সমাজের প্রয়োজনানুসারে আপনার বীণার ঠাট বদলাইয়া লন্ তিনি কবি হইতে পারেন; তিনি বরেণ্য সন্দেহ নাই, তিনি দেশের ও জাতির অশেষ উপকার করিতেছেন তাহাও মানিতে পারি, কিন্তু যিনি বর্ত্তমানের দ্বন্দ্বকোলাহলের মধ্যেও স্থির আত্মসমাহিত থাকিয়া আপনার দিব্য দৃষ্টিতে ঋষির মত সত্য শিব ও সুন্দরকে দর্শন করিতেছেন এবং সেই দিব্যলোকের দিব্য রাগিণীতে আপনার বীণা বাঁধিয়া গান করিতেছেন তাহাকে অবজ্ঞা করিলে চলিবে না; তিনি সাময়িক কবি নহেন, তিনি চিরদিনকার বিশ্বের কবি; মানুষ তাঁহার মধ্যে আপনার বর্ত্তমানের

প্রয়োজনসাধনোপযোগী বস্তু না পাইলেও মানুষের যাহা অন্তরের ধন, যাহা তাহার প্রিয় হইতে প্রিয়তম বস্তু তাহার সন্ধান পাইয়া থাকে।

অতএব বর্ত্তমান বাঙ্গলা সাহিত্যের মধ্যে দেশের বর্ত্তমান অবস্থার কথা নাই বলিয়া আক্ষেপের কারণ নাই; যদি এখনকার কাহারও রচনার মধ্যে সত্য প্রকাশ হইয়া থাকে, যদি তাঁহারা আনন্দের দিব্যধাম হইতে কিছু আনিতে পারিয়া থাকেন তবেই তাঁহাদের রচনা সার্থক। তাঁহাদিগকে গালি দিলে শুধু আমাদেরই কাব্য-উপভোগের অক্ষমতা প্রকাশ করা হইবে।

যাঁহারা সাহিত্যকে ইংরাজী গন্ধী বলিয়া অবজ্ঞা করেন তাঁহারা ভুলিয়া যান যে বিভিন্ন জাতির মধ্যে নিত্যই ভাবের আদানপ্রদান চলিতেছে। তাঁহারা মনে করেন প্রত্যেক জাতিরই যে বিশেষত্ব আছে তাহা অপরিবর্ত্তনীয় অর্থাৎ প্রাণহীন। বাহ্যজগতের সহিত সংঘর্ষে, বিভিন্ন শিক্ষা ও সভ্যতার ঘাতপ্রতিঘাতে জাতীয় জীবন যে জাগিয়া উঠে তাহা তাঁহারা ভুলিয়া যান। সজীব ও নির্জ্জীবের মধ্যে প্রভেদ এই যে, নির্জ্জীবের পরিবর্ত্তন নাই, হ্রাসবৃদ্ধি নাই, কিন্তু সজীব নিয়ত বাহিরের জগৎ হইতে বস্তু আহরণ করিয়া আপনার প্রাণশক্তির রসে তাহাকে নিষিক্ত করিয়া আপনাকে পুষ্ট করে।

অতএব পশ্চিমের সহিত সংঘাতে আমাদের জাতীয় চেতনা যদি নূতন ভাবে জাগিয়া উঠিয়া থাকে এবং পশ্চিমের শিক্ষা ও সভ্যতার সহিত পরিচিত হইয়া দেশের শিক্ষিতসম্প্রদায় যদি মান্ধাতার আমল হইতে যাহা চলিয়া আসিতেছিল তাহা হইতে জীবনকে একটু অন্যভাবে পরিচালিত করিয়া থাকে তবে তাহাতে ক্রোধের অথবা বিস্ময়ের কোনো কারণ নাই। হয়তো পশ্চিমের অপরিচিত সভ্যতার প্রথম আলোকপাতে

চোখে ধাঁধাঁ লাগিবে—হয়তো দেশের প্রাচীন গণ্ডিবদ্ধ জীবন হইতে বাহিরে আসিয়া প্রথমে পথভ্রষ্ট হইতে হইবে; কিন্তু তবুও তাহাতে সমাজের ক্ষতির অপেক্ষা বৃদ্ধিরই সম্ভাবনা।

জাতীয় জীবন গতিহীন জড়পদার্থ নহে। শিক্ষার সাহচর্য্যে সময়ের সহিত তাহার পরিবর্ত্তন অবশ্যম্ভাবী—তবে সজীবতার যাহা লক্ষণ, বাহিরের জিনিষকে নিজের মত করিয়া লওয়া, পরিবর্ত্তনের মধ্য দিয়া আপনার সত্বাকে বিকাশ করা—তাহা অবশ্য তাহার মধ্যে থাকিবে।

জাতীয় জীবনের এই অবশ্যম্ভাবী পরিবর্ত্তন অথবা পরিপুষ্টি প্রথমে জনসাধারণের মধ্যে প্রকাশ পায় না। নবজীবনের অরুণ কিরণ সংস্পর্শে সমাজের যাঁহারা বিশাল মহীরুহস্বরূপ তাঁহারাই প্রথমে জাগিয়া উঠেন এবং নবজীবনের বার্ত্তা চারিদিকে প্রচার করেন। তাঁহাদের বার্ত্তার সহিত, তাঁহাদের রচনার সহিত, তাঁহাদের জীবনের সহিত দেশের প্রাচীনতম কালের সম্পূর্ণ ঐক্য নাই বলিয়া তাঁহাদিগকে অবজ্ঞা করা মূঢ়তা মাত্র। কারণ তাঁহারা সমাজের অগ্রগামী দূত—সমাজকে যাহা হইতে হইবে সেই কথাই তাঁহারা প্রকাশ করিতেছেন।

একথা মনে করা অন্যায় হইবে যে পাঁচালি, কবির গান, অথবা রামায়ণ-মহাভারতই চিরকাল ধরিয়া ভারতবর্ষের ও বাঙ্গলার সাহিত্য এবং জাতীয়তার একমাত্র নিদর্শন হইয়া থাকিবে। বঙ্কিমচন্দ্র রবীন্দ্রনাথ প্রভৃতির মধ্যে যে শিক্ষা ও সাধনা, যে জীবনের অভিজ্ঞতা ও উদারতা রহিয়াছে মুদী অথবা পূজারী ব্রাহ্মণের মধ্যে তাহা নাই বলিয়াই তাহারা ইঁহাদিগকে আদর করিতে পারে না। ইহাতে বঙ্কিম অথবা রবীন্দ্রনাথকে নিন্দা না করিয়া বরং আমাদিগের লজ্জায় মস্তক অবনত করা উচিত।

যাঁহারা ইঁহাদিগকে বিজাতীয়ভাবাপন্ন বলেন তাঁহাদিগকে আর একটি কথা স্মরণ করিতে অনুরোধ করি। তাঁহারা ভাবেন দেশের প্রকৃত যে spirit ও temper তাহা দেশের জনসাধারণের মধ্যেই নিহিত; অতএব জনসাধারণ যাহা প্রত্যাখ্যান করে তাহা যে বিদেশীয়ভাবাপন্ন তাহাতে আর সন্দেহ নাই। কিন্তু একথা যে সত্য নহে তাহার বিস্তর প্রমাণ ইতিহাসে আছে। যাহার সহিত দেশের সাময়িক অবস্থার কোনো সম্পর্ক নাই তাহা একহিসাবে অবশ্য দেশের কথা নহে; কিন্তু একটু তলাইয়া দেখিলে বোঝা যায় কবির কথা দেশের সেই প্রাণের কথা যে প্রাণ দেশের অতীত হইতে জন্মলাভ করিয়াছে। বর্ত্তমান ও চিরন্তন, বাস্তব ও আদর্শ এই দুয়ের মধ্যে যে প্রভেদ তাহা ভুলিলে চলিবে না। দেশের সাধারণলোক বর্ত্তমানের মধ্যে এমন আত্মহারা হইয়া নিমজ্জিত থাকে যে তাহারা অনেক সময় সনাতনের কথা ভুলিয়া যায়। দেশের কবি, দার্শনিক প্রভৃতি মহাপুরুষেরাই তখন তাহাদিগকে দেশের প্রকৃত যে লক্ষ্য, দেশের প্রকৃত যে আদর্শ তাহা বলিয়া দেন। দেশের সাধারণলোক তাঁহাদের কথা দেশের নহে বলিতে পারে; কিন্তু তাঁহারা জানেন যে দেশকে তাঁহাদের কথাই একদিন-না-একদিন গ্রহণ করিতেই হইবে। দার্শনিক Emerson কবি সম্বন্ধে একস্থানে বলিয়াছেন—

"He is isolated among his contemporaries, by truth and by his art, but with this consolation in his pursuits that they will draw all men sooner or late."

শ্রীমহীতোষকুমার রায়চৌধুরী।

BOUND BY BOSE & C
88, Girish Mukerji Road
BHOWANIPUR
3.11.66.